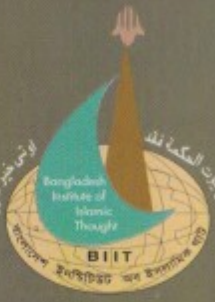

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট
অব ইসলামিক থ্যট

মুসলিম মানসে সংকট

আবদুলহামিদ আহমদ আবুসুলাইমান

মুসলিম মানসে সংকট

আবদুলহামিদ আহমদ আবুসুলাইমান

অনুবাদ

মোঃ মাহবুবুল হক

সম্পাদনা

এম আবদুল আজিজ

এম রুহুল আমিন

ওমর বিশ্বাস

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

www.pathagar.com

মুসলিম মানসে সংকট

আবদুলহামিদ আহমদ আবুসুলাইমান

অনুবাদ
মোঃ মাহবুবুল হক

সম্পাদনা
এম আবদুল আজিজ
এম রুহুল আমিন
ওমর বিশ্বাস

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট
বাড়ী ২, সড়ক ৪, সেক্টর ৯, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০
ফোন : ৮৯৫০২২৭, ৮৯২৪২৫৬, ০৬৬৬২৬৮৪৭৫৫, ০১৫৫৪৩৫৭০৬৬
E-mail : biit_org@yahoo.com

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী ২০০৬

দ্বিতীয় সংস্করণ
বৈশাখ ১৫১৬
মে ২০০৯.

ISBN
984-8203-40-7

মুদ্রণে
এম.এ. গ্রাফিক্স ক্যাম্পাস

মূল্য
১৫০.০০ টাকা US $ ১০.০০

Muslim Manashey Shankat (Crisis in the Muslim Mind) written by Abdulhamid A. AbuSulayman, translated into bengali by Md. Mahbubul Hoque & Published by the Bangladesh Institute of Islamic Thought, House # 2, Road # 4, Uttara Model Town, Dhaka-1230, Bangladesh. Phone : 8950227, 8924256, 06662684755, 01554357066, E-mail : biit_org@yahoo.com
Price : Tk. 150.00 only. US $ 10.00

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

বিশ্বনন্দিত গবেষক, শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদ ড. আব্দুলহামিদ আহমদ আবুসুলাইমান রচিত মূল আরবী গ্রন্থ *আযমত আল আকল্ আল্ মুসলিম* -এর ইংরেজি সংস্করণ Crisis in the Muslim Mind -এর বঙ্গানুবাদ 'মুসলিম মানসে সংকট' নামে পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দবোধ করছি।

মানব জাতির জন্য একমাত্র নির্দেশিকা হলো ইসলাম। কিন্তু গবেষণা ও চিন্তার ক্ষেত্রে সুদীর্ঘকালের স্থবিরতা ও পদ্ধতিগত দুর্বলতার উত্তরণ না ঘটায় ইসলাম চলমান বিশ্বে একটি গতিশীল আদর্শ হিসেবে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারছে না। বর্তমান প্রেক্ষাপটে একদিকে যেমন প্রয়োজন ইসলামের উপস্থাপিত সার্বজনীন সত্য ও সৌন্দর্যের ঝরনা ধারায় আমাদের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিকে পুনর্গঠিত করা; অপরদিকে তেমনি প্রয়োজন মুসলিম উম্মাহর জ্ঞান ও চিন্তার ক্ষেত্রে সুদূর অতীত থেকে সৃষ্ট স্থবিরতা ও পদ্ধতিগত সমস্যাগুলোকে গবেষণার মাধ্যমে চিহ্নিত করে জীবনাদর্শকে আরও গতিশীল করা। সে ক্ষেত্রে ড. আবদুলহামিদ আহমদ আবু সুলায়মানের লেখা উক্ত বইটি পাঠকদের মন ও চিন্তার জগতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

প্রসঙ্গত, লেখকের রচিত মূল আরবী গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন 'ইউসুফ তালাল ডি-লরেন্সো Crisis in the Muslim Mind' শিরোনামে। এরপর এর ইংরেজি সংস্করণ হতে বাংলায় অনুবাদ করেছেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট লেখক, সংগঠক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব জনাব মোঃ মাহবুবুল হক। তাকে তার কঠোর পরিশ্রমের জন্য জানাই বিশেষ কৃতজ্ঞতা। এছাড়া বিআইআইটি'র যে তিনজন ফেলো বইটির সম্পাদনা করেছেন, তাদেরকেও জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। বইটির বাংলাদেশী স্কলার, বইটির উপর ভিত্তি করে পরিচালিত অসংখ্য স্টাডি সার্কেলের শিক্ষক ও মডারেটর জনাব শাহ আবদুল হান্নান এর অনুবাদ ও সম্পাদনার সার্বিক তত্ত্বাবধান করেছেন- যা আমাদের জন্যে বিরাট প্রাপ্তি। আমরা এজন্য তার কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

ব্যাপক পাঠক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ হলো- যেখানে আমরা চেষ্টা করেছি পূর্বের কিছু ভুলত্রুটি শুধরে নেয়ার, এরপরও বইটিতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। আপনাদের অব্যাহত সহযোগিতা আমাদেরকে আরও সমৃদ্ধ করবে ইনশাআল্লাহ।

এম আবদুল আজিজ
উপ-নির্বাহী পরিচালক

www.pathagar.com

উপক্রমণিকা

এটি স্বীকৃত যে, মুসলিম উম্মাহ এখন সংকটাবর্তের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। চারদিকে বিচ্ছিন্নতা ও উপদলীয় কোন্দল, নিজস্ব সত্তার বিনাশ, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতা এবং বর্তমান বিচ্ছিন্ন অবস্থা থেকে নিজেকে নির্লিপ্ত রাখার প্রবণতা লক্ষ্যণীয়।

সবাই একমত যে– বর্তমান প্রেক্ষাপটে পরিবর্তন প্রয়োজন। বিশেষ করে মিশর এবং তুরস্কের সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাথমিক সংকট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে মুসলিম উম্মাহ একনায়কতন্ত্র, বৈদেশিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা, সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা, বিজ্ঞান এবং মানবিক বিদ্যার পথ অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছে। যার কোনটিই উম্মাহর জন্য আশানুরূপ ফল বয়ে আনেনি। বরং উম্মাহ একটি দুষ্টচক্রে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

এর অর্থ প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে পরিবর্তন প্রয়োজন উম্মাহর নেতৃবৃন্দ তা নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। বিষয়টির পুরোপুরি বিশ্লেষণ, এর বিভিন্ন দিকের আলোকপাত এবং নিরপেক্ষভাবে উম্মাহর অতীত পদক্ষেপগুলো বিবেচনার পর আমরা নিশ্চিত যে, পরিবর্তনের পদ্ধতি সম্পর্কে উম্মাহর চিন্তাধারায় সংযোগ দরকার। কারণ চিন্তাধারা ঠিক না ভুল– তা কর্ম প্রণালীতে প্রতিফলিত হয়। কেবল মননশীল চিন্তাধারাই সুস্থ পুনর্গঠনে সাহায্য করে এবং সামগ্রিকভাবে গঠনমূলক পরিকল্পনাই উম্মাহকে নিশ্চিত সংকট থেকে মুক্ত হওয়ার পথ নির্দেশ করতে পারে। এটি স্বতঃসিদ্ধ যে, ইসলামই উম্মাহর চিন্তাধারার মূল উৎস এবং ইসলামই সত্য সত্তাকে প্রকাশ করে। সে কারণে

www.pathagar.com

ইসলামী চিন্তাধারাই উম্মাহর জন্য একমাত্র উপজীব্য– এটি আমরা গভীর বিশ্বাস ও আস্থার সাথে অনুধাবন করতে পারি। উম্মাহর কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন একমাত্র ইসলামী চিন্তাধারার মধ্যে আবর্তিত। উম্মাহ এ শিক্ষা দ্বারা পরিচালিত। এটি নির্দিষ্ট ও বিশিষ্ট পদ্ধতি– যা ইসলামী মূল্যবোধ ও নীতিমালার মূল উৎস থেকে প্রাপ্ত।

'ইসলামী চিন্তা' একটি সাধারণ শব্দ হওয়ায় এর ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে। তাই এই শব্দটির একটি সংজ্ঞা আবশ্যক। এই গ্রন্থে এর একটি সংজ্ঞা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এবং এর পদ্ধতি নির্ণয় করার চেষ্টাও করা হয়েছে। এ গ্রন্থে প্রথমে ইসলামী চিন্তার সনাতন পদ্ধতির বিশ্লেষণ এবং পরবর্তীতে ইসলামের মৌলিক বিষয়াদির উৎস আলোচনা করা হয়েছে। এরপর ঐ পদ্ধতির কার্যকারিতা, বিষয়বস্তু এবং পরিধি নিয়ে আলোচনা, পরিশেষে ইসলামিক ও বিদ্যমান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা হয়েছে। এছাড়া লেখক এ বইতে ইসলামের আলোকে সামাজিক বিজ্ঞান ও মানববিদ্যার পরিধি সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন।

গ্রন্থের শেষ দিকে লেখক দুটি বিষয়ে আলোচনা করেন তা হলো– ইসলাম ও ইসলামের ভবিষ্যৎ এবং মানবজাতির ভবিষ্যৎ। চূড়ান্ত পর্যায়ে লেখক এই মত প্রকাশ করেছেন যে, উম্মাহর সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে ইসলামিকরণ– যা উম্মাহর ভবিষ্যত, এর পরিচিতি, এর উদ্দেশ্য, সংকট উত্তরণ এবং সভ্যতা গঠন ও নবজাগরণের উপায়।

ইসলামী চিন্তার পুনর্গঠন, বিষয়ের মূল অনুধাবন, কোন কিছুকে নির্দিষ্ট না করে সার্বজনীনভাবে দেখা, সমস্যার কারণ উদঘাটন এবং সকল ক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষার অনুসরণ, চিন্তার ক্ষেত্রে পরিবর্তনের যথার্থতা ও সফলতার নিশ্চয়তা বিধান করে যা উম্মাহকে সন্দেহাতীতভাবে সঠিক পথ চলতে সাহায্য করবে। এটিই মূলত এই গ্রন্থ প্রণেতা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন।

কেউ কেউ ভাবতে পারেন লেখক যোগ্যতার চেয়ে চিন্তার বিষয়টির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন তবে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, চিন্তার বিষয়টি মৌলিক এবং মুসলিম মনীষীদের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। তাছাড়া এই বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেয়ার অর্থ এই নয় যে, অন্যান্য বিষয়ের প্রতি কম গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বরং অন্যান্য বিষয়ের সমাধান তখনই আসবে যখন সকল বিষয়ই ইসলামী চিন্তার ভিত্তিতে মননশীলভাবে বিশ্লেষিত হবে।

চিন্তার সংকট, আরব মানস কাঠামো ও মুসলিম মানসের পুনর্গঠন এবং ইসলামী চিন্তা ও পদ্ধতির উপর ইতোপূর্বে প্রচুর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তবে এই লেখায় একটি ব্যতিক্রমধর্মী বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। লেখক তার বিশ্লেষণে উম্মাহর সংকট এবং এর বুদ্ধিবৃত্তিক, পদ্ধতিগত ও ঐতিহাসিক দিকগুলোর উপর সরাসরি আলোকপাত করেছেন।

www.pathagar.com

অহেতুক বিভিন্ন উপলক্ষ নিয়ে আলোচনা না করে তিনি মূল বিষয় ও সমস্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

এ কারণে অনেক পাঠকের কাছে লেখকের লেখার ধরন কঠিন মনে হতে পারে। কিন্তু পাঠ শেষে লেখার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও মূল ধারণা অনুধাবন করতে কোনো সমস্যাই হবে না। যখন কোনো পাঠক গভীর অভিনিবেশের সাথে বইটি পাঠ করবে তখন হৃদয়ঙ্গম করবে যে, তারা কোনো সরস পৌরাণিক গল্প বা উপন্যাস পড়ছে। মনে হবে না যে, এটি কোনো কঠিন সাহিত্য। সংক্ষেপে বলা যায়, লেখক তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে একজন একনিষ্ঠ মুসলিম হিসেবে ইসলামের দাওয়াহ ও সংগ্রামের বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন।

লেখক একজন প্রখ্যাত চিন্তাবিদ। তিনি উম্মাহর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, অস্তিত্ব ও ভবিষ্যত নিয়ে সবসময় চিন্তাভাবনা করেন। তিনি এই গ্রন্থে অসংখ্য শব্দ ব্যবহার করেছেন যেগুলোর অগ্রদূত তিনিই। তবে শব্দগুলো সরাসরি মূল বিষয়কে অনুধাবন করার জন্য সহায়ক। এই গ্রন্থটির মূল প্রকাশনা আরবিতে করা হয়। সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর কিছু বিষয় ইংরেজি অনুবাদে সংযোজন করা হয়েছে। আমরা আশা করি গ্রন্থটি পাঠকদের কাছে সমাদৃত হবে– যা উম্মাহর বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক নেতৃত্ব এবং যুব পণ্ডিতদের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে। প্রার্থনা করি আল্লাহ যেন গ্রন্থটি মানবজাতির কল্যাণে নিবেদিত করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল সাফল্যের মূল চালিকা শক্তি। সকল প্রশংসা আলাহরই জন্য।

ড. তাহা জাবির আল আলওয়ানী
সভাপতি
আইআইআইটি

হার্ডন, ভার্জিনিয়া, ইউএসএ
জিলহজ্ব ১৩১৪/জুন ১৯৯৩

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

(আরবি সংস্করণ হতে)

সকল প্রশংসা নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ তাআলার জন্য। হযরত মোহাম্মদ (সা), তার অনুসরণকারী ও বাণীবাহকদের উপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।

এই মুহূর্তে আপনার হাতে যে গ্রন্থটি রয়েছে তা প্রচলিত সাধারণ গ্রন্থ নয়। এটি কোনো সংক্ষিপ্ত সার বা সংকলন জাতীয় কোনো গ্রন্থও নয়, এটি একটি গবেষণা, অনুধ্যান এবং বিশ্লেষণধর্মী গ্রন্থ যা আমাকে সারা জীবন আলোড়িত ও আন্দোলিত করেছে।

বিভিন্ন লেখক ও কবির ভাষায় উম্মাহর বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে যা প্রকাশিত হয়েছে একটি শিশু হিসেবে তা আমি সর্বান্তকরণে অনুধাবন করেছি। যখন আমি মক্কায় বড় হচ্ছিলাম তখন আমার ক্লাসে ও বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকে মুসলিম ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায় আমার কল্পনায় উন্মুক্ত হয়। আমি উম্মাহর সবচেয়ে ভালো ও সবচেয়ে খারাপ মুহূর্তগুলো এবং মুসলিম বীরপুরুষদের সম্পর্কে জানতে পারি। সব সময় তিক্ততা এবং হতাশা আমার হৃদয়কে আঘাত করতো। এক পর্যায়ে আমার মনে দৃঢ় সংকল্পের জাগরণ হয় যে, সংকট নিরসনের জন্য পরিবর্তন অবশ্যই প্রয়োজন।

আমার জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অন্বেষণের পর আমি নিজে কখনো স্তিমিত হইনি। সবসময় নিজেকে জিজ্ঞেস করেছি, উম্মাহর পতন ও ব্যর্থতার কারণ কি? আমি সন্তোষজনক উত্তর ছাড়া কোনো কিছু মানতে রাজি ছিলাম না। তাছাড়া নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও ইসলামের আদি ও আধুনিক ব্যাখ্যাতে আমার পড়াশোনার দ্বারা আমি সর্বদাই উম্মাহর সংকটের কথা চিন্তা করতাম। এর কারণ খুঁজেছি এবং উত্তর খুঁজে পাবার চেষ্টা করেছি।

www.pathagar.com

আমি কখনও আবেগের, ক্রোধের বা হিংসার দ্বারা বশীভূত হয়নি। উম্মাহর সমস্যাগুলো আমাকে সব সময় পীড়া দিত। সে জন্য আমি আমার সকল বাস্তব অভিজ্ঞতা, আমার সকল শিক্ষা ও কর্ম প্রচেষ্টার আলোকে দিনরাত উম্মাহর ফেলে আসা সোনালী ইতিহাসের কথা চিন্তা করেছি। ঘটনার পর ঘটনাকে একেবারে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছি। যা আমি এই গ্রন্থে লিখেছি তা আমার সরাসরি মনের কথা কোনো সমালোচনা, দোষ খোঁজার বা বিরোধিতা করার জন্য নয়। যা সত্য মনে করেছি তাই লিখেছি।

যখন আমি আপনাদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলি তখন উম্মাহর মধ্যে লুক্কায়িত সকল ভালো কিছু, এর জোরালো দিকগুলো উপলব্ধি করি। উম্মাহর মধ্যে গভীর বিশ্বাস, ত্যাগ প্রবণতা এবং যথেষ্ট দায়িত্বশীলতাবোধ রয়েছে। সে ব্যাপারে আমি কোনো অজুহাত খুঁজিনি বরং আমি উম্মাহর পশ্চাৎপদতার দিকগুলো চিহ্নিত করেছি যাতে এগুলো সমাধান করে সংকট নিরসনের পথ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

আমি উম্মাহর অবদানকে উপেক্ষা করি না। প্রখ্যাত ব্যক্তি, জ্ঞানী, নেতা, যুবক ও মুজাহেদিনের অবদান অস্বীকার করি না, তবে পতনের জন্য উম্মাহর খারাপ দিকগুলো তুলে ধরেছি যাতে সত্য উদ্‌ঘাটিত হয় এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

আমি কোনো কিছুর সাথে কোনো কিছুকে মিশিয়ে ফেলার উপর জোর দিচ্ছি না। আমি এই বইয়ে যা লিখেছি বা যে মতামত দিয়েছি তা আমার চিন্তার ফসল। এর মধ্যে যদি কোনো কিছু ভুল প্রমাণিত হয় তার জন্য আমি ভীত নই। আমার একমাত্র আবেদন যে, পাঠক সমাজ আমার প্রত্যাশার সঙ্গে একমত হয়ে উম্মাহর পতনের মূল উৎস চিন্তা করবেন।

আমি তখনই সবচেয়ে বেশি খুশি হব যখন এই গ্রন্থের বক্তব্যগুলো ব্যাপক আলোচনার বিষয়বস্তু হবে। এটি আমার বিনয়ী ধারণা যে বইটির অধ্যায়ন খুব সহজ হবে না কারণ এর বিষয়বস্তু খুব জটিল এবং যারা এটি নিয়ে চিন্তাভাবনা করে, উম্মাহর ইতিহাস, সুন্নাহ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা আছে তারাই আমার বক্তব্য ও যুক্তিগুলো বুঝতে পারবে।

আমি আশা করি পাঠকসমাজ ধৈর্য সহকারে আলোচিত বিষয়গুলো পড়বেন। সত্যকে বোঝার জন্য এটি প্রয়োজন। খুব দ্রুত পাতা উল্টালে কেবল বাহ্যিক দিকটাই বোঝা যাবে। যান্ত্রিকভাবে এর শব্দমালা বোঝা যাবে, গভীর ভাবার্থে বোঝা যাবে না। যেহেতু বিষয়বস্তু অতি ব্যাপক ও জটিল সেহেতু প্রত্যেকটি বিষয় গভীরভাবে আলোচনা করা বা ঐতিহাসিক প্রমাণ এবং বিভিন্ন মতামত অন্তর্ভূক্ত করা সম্ভব নয়। সে জন্য প্রধান বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে যাতে মূল বিষয়টি উপেক্ষিত না হয়।

আশা করা যায় উম্মাহর শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জগতে এমনকি সামাজিক নেতৃত্বের কাছে

www.pathagar.com

বইটি সমাদৃত হবে ও উপকারে আসবে। আমি আশাবাদী যে, বইটি খোলামেলা আলোচনাকে উৎসাহিত করবে এবং গভীর চিন্তা ও অধ্যয়নকে অনুপ্রাণিত করবে।

এই গ্রন্থের মধ্যে এমন কিছু নেই যা কোনো যোগ্য ব্যক্তির পাণ্ডিত্যের প্রচেষ্টাকে নষ্ট বা ক্ষুণ্ন করবে। উম্মাহর বিশ্বাস, একনিষ্ঠতা ও সংগ্রাম সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ অবহিত। এটি সর্বজনবিদিত যে, উম্মাহর ইতিহাস ও ঘটনাবলী পথহারাকে পথ দেখিয়েছে। আর এ বই সেই বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ আলোচনায় পৌঁছানোর প্রচেষ্টা মাত্র।

আশা করি উম্মার চিন্তাশীল নেতৃবৃন্দ, পণ্ডিতবৃন্দ ও যুবকবৃন্দ এই দাবির মোকাবিলা এবং এ বিষয়ে খোলাখুলি ও সত্যনিষ্ঠভাবে আলোচনা করার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। তাছাড়া আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, তারা এ ব্যাপারটিকে মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে। এটি অবশ্যই সম্পদের প্রাচুর্য, সম্মান, মূল্যবোধ বা আবেগ থেকে আসবে না। প্রকৃতপক্ষে, সব কিছুর আগে আমরা যদি আমাদের চিন্তার পথকে সংশোধন না করি তবে কোনো কিছুই পরিবর্তিত হবে না। এটিই আমাদের শিক্ষা পদ্ধতিতে সংশোধন আনয়নে সাহায্য করবে এবং তারপর তা আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানকে সংশোধন করতে সহায়তা করবে। আর এভাবেই উম্মাহ একদিন নিজেকে পুনর্জাগরিত করতে সক্ষম হবে।

হে প্রভু, আমাদেরকে সৎপথ দেখাও কারণ সত্য উদঘাটিত হলে তা আমরা অনুসরণ করব এবং আমাদেরকে মিথ্যা পথ সম্পর্কেও সাবধান রাখ যাতে আমরা সে পথ পরিহার করে চলতে পারি। আমি আল্লাহর কাছে আবেদন করব তিনি যেন উম্মাহকে সঠিক নির্দেশনা, পথ, সাহায্য ও তওফীক দান করেন। নিশ্চিতভাবে আল্লাহ শ্রবণ করেন এবং যারা বিনীতভাবে তাঁর প্রার্থনা করে তাদেরকে তিনি জবাব দেন।

আবদুলহামিদ আহমদ আবুসুলাইমান
১৪১৩ হিঃ/১৯৯২ খ্রিঃ
হার্ডন, ভার্জিনিয়া, ইউ এস এ

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

(ইংরেজি সংস্করণ হতে)

আলোচ্য Crisis in the Muslim Mind গ্রন্থটি আরবি ভাষায় লিখিত মূল গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। এর বিষয়বস্তু সব সময় সহজে অনুসরণযোগ্য নয়, তবুও বর্তমানে মুসলিম সমাজের সংকটগুলোর মূল সম্পর্কে মুসলিম বুদ্ধিজীবীগণ যে গভীর আলোচনা করেছেন সে সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করাই এ গ্রন্থের লক্ষ্য। এ ধরনের একটি গ্রন্থের হুবহু অনুবাদ করা লেখক ছাড়া অন্য কারো পক্ষে নিঃসন্দেহে কষ্টসাধ্য। ব্যক্তিগতভাবে এ কাজটি করার মতো আমার না ছিল সময় না ছিল সুযোগ। তদুপরি ইউসুফ তালাল ডি-লরেঞ্জো এবং যারা এ বইটি সম্পাদনা এবং নিরীক্ষা করেছেন তাদের সবার সক্ষমতার উপর আমার দৃঢ় আস্থা ছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাদের সম্মিলিত কাজের মাধ্যমে এ গ্রন্থটির মূল বাণী উপস্থাপিত হয়েছে।

এ অনুবাদটি ঠিক তখনই প্রকাশিত হয় যখন মুসলিম উম্মাহ তাদের সামনে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে দেখছে যে, দুই মেরুর পৃথিবী ও প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন ধ্বসে পড়ছে। যখন ইসলাম বিরোধী শক্তি পৃথিবীর মুসলমানদের বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালাচ্ছে, যেমন– বসনিয়া, কাশ্মির, কুর্দিস্থান, দক্ষিণ সুদান, সোমালিয়া, ফিলিপাইনস, বার্মা, ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, আলজেরিয়াসহ অন্যান্য অনেক স্থানে। এ ধরনের ভয়ঙ্কর অবস্থা মুসলিম উম্মাহর সংকটকেই শুধু বিবর্ধিত করে। এ সব অবস্থার মধ্যে মুসলমানরা যখন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবে তখন কখনো কোনোভাবে আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত হবে না যে, এসব অস্থিরতার মূল কারণ আমাদের নিজেদের অযোগ্যতা ও দুর্বলতা। সম্ভবত প্রাথমিক যুগের মুসলিমদের সাথে তৎপরবর্তী যুগের মুসলিমদের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হলো এ যে, প্রাথমিক যুগের মুসলিমরা ছিলেন শারীরিক ও মানসিকভাবে খুবই শক্তিশালী। মক্কা

www.pathagar.com

বিজয়ের পূর্বে তাওয়াফকালীন সময়ে নবী মুহাম্মদ (সা.) এর গতিস্মান নির্দেশমালা প্রাথমিক যুগের মুসলমানরা তখনো ভোলেননি।

এ গ্রন্থটি মূলতঃ সংক্ষিপ্তাকারে পদ্ধতিগত বিষয়ে কুরআন এবং সুন্নাহর মধ্যে সম্পর্ক, স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সুন্নাহর প্রয়োগ এবং উম্মাহর রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বের মধ্যকার বিরোধ ও বৈষম্যগুলো তুলে ধরেছে। এ গ্রন্থে যে বিষয়টি বিধৃত হয়েছে তা হলো রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যখন জনগণকে শাসনের জন্য ক্ষমতা ও শক্তির ব্যবহার করেছে তখন বুদ্ধিজীবী নেতৃবৃন্দ আবেগ ও মানসিক উপায়-উপকরণ দিয়ে তার গতি আনয়নের চেষ্টা করেছেন। এ সমস্ত চাপ মুসলিম মননে স্থবির অবস্থার সৃষ্টি করেছে যা উম্মাহর মানসিকতা ও চরিত্রকে এমনভাবে প্রভাবিত করেছে যে, উম্মাহ কোনো উদ্ভাবন ও সৃজনের নিজস্ব চিন্তা, উদ্যোগ ও ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে।

বর্তমান মুহূর্তে উম্মাহকে এ সব সমস্যার স্পষ্টই সমাধান বের করতে হবে এবং তা করতে হবে অত্যন্ত খোলামেলাভাবে ও সততার সাথে। এ ক্ষেত্রে পূর্বশর্ত হলো কুরআন ও সুন্নাহকে বোঝা এবং এর ব্যাখ্যার ব্যাপারে সার্বিকভাবে বদ্ধমূল কোনো পূর্ব ধারণা ও কুসংস্কারকে অতিক্রম করা। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে আমাদের এখন প্রধান কাজ হলো– মুসলিম নব প্রজন্মকে সঠিক শিক্ষা ও চেতনার দ্বারা পরিগঠিত করা।

প্রার্থিব পরিবর্তনের শুভারম্ভের দায়িত্ব সর্বোতভাবে মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের। এ সব বুদ্ধিজীবীরাই কয়েক শতাব্দীর মনস্তাত্ত্বিক বন্ধ্যাত্ব, চিন্তাধারার আগল থেকে উম্মাহকে বের করে আনবে। তারা উম্মাহর রোগ সঠিকভাবে নির্ণয় করবে এবং রোগ সম্পূর্ণ উপশমের জন্য যথাযথ ব্যবস্থাপত্র প্রদান করবে। আর তখনই কেবল মুসলিমরা তওহীদ, খেলাফত এবং ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পন্ন ইসলামী জীবন ধ্যবস্থার সঠিক চিত্র অনুধাবন করতে সক্ষম হবে। পরিশেষে বলা যায় যে, একবার মুসলিমরা প্রগতি, সাহস, নৈতিকতা অর্জন করতে পারলে তারা শুধু নিজেদের ভাগ্যকেই সমৃদ্ধ করবে না, বরং প্রত্যক্ষভাবে বিশ্ব সভ্যতায় ইতিবাচক অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

আবদুলহামিদ আহমদ আবুসুলাইমান
১৪১৪ হিঃ/১৯৯৩ খ্রিঃ
হার্ডন, ভার্জিনিয়া, ইউ এস এ.

www.pathagar.com

সূচি

অধ্যায় এক

সমসাময়িক ইসলামী আসালা: একমাত্র সমাধান	১৫
দিক নির্দেশিকা	১৫
অনুসরণযোগ্য ঐতিহাসিক সমাধান	১৮
অনুসরণযোগ্য বিদেশী সমাধান	২০
সাম্প্রতিক ইতিহাসের কিছু দৃষ্টান্ত	২৩
উম্মাহ ও আমদানিকৃত সমাধান	২৪
উম্মাহ এবং ইতিহাস নির্ভর সমাধান	২৫
সমসাময়িক ইসলামী আসালার দৃষ্টিভঙ্গি	২৮
সংকটের ঐতিহাসিক উৎসমূল	৩২
রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃত্বে ভাঙন	৩৪
সমস্যার মূল এবং উম্মাহর ভবিষ্যৎ	৩৭
চিন্তাধারা ও উপায় সংক্রান্ত প্রশ্ন বনাম মূল্যবোধ ও উদ্দেশ্য সংক্রান্ত প্রশ্ন	৩৮
বুদ্ধিবৃত্তিক বিচ্ছিন্নতা	৪০

অধ্যায় দুই

ইসলামী চিন্তাধারার পুরনো পদ্ধতি : বিচার-বিবেচনা ও সমালোচনা	৪৩
আল-উসূল : সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা	৪৩
শরিয়াহ এবং শরিয়াহ বহির্ভূত বিজ্ঞান	৪৫
সমাজ বিজ্ঞানের অবহেলা	৫০
ওহী ও যুক্তির দ্বন্দ্ব	৫২
আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক উত্তরাধিকার : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ	৬৪

অধ্যায় তিন

ইসলামী চিন্তাধারায় পদ্ধতিবিজ্ঞানের নীতিমালা	৬৬
ইসলামী চিন্তাধারায় পদ্ধতিগত কাঠামো	৬৬
ইসলামী পদ্ধতিবিজ্ঞানের উৎসসমূহ	৬৯
প্রত্যাদেশ, যুক্তি ও মহাবিশ্ব	৬৯
যুক্তি	৭০

www.pathagar.com

ইসলামী পদ্ধতিবিজ্ঞান ও চিন্তাধারার মূলনীতিসমূহ ৭২
ইসলামী পদ্ধতিবিজ্ঞানের মৌলিক ধারণাসমূহ ৭৭
সৃষ্টি ও অস্তিত্বের উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রকৃতি ৭৮
সত্যের বাস্তবতা এবং পরিবেশ-পরিস্থিতির আপেক্ষিকতা ৭৯
সাফল্যের ধারণা ৭৯
স্বাধীনতা ৮০
বিশ্বাসের স্বাধীনতা ৮১
সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা, স্বাধীন ইচ্ছা ও দায়িত্ব ৮২
চিন্তার স্বাধীনতা ৮৬
তাওয়াক্কুল নীতি ৮৮
মানব প্রকৃতির কার্যকারণ সম্বন্ধ ৯০
ইসলামী পদ্ধতিবিজ্ঞান : উপায় ও প্রয়োগ ৯৩
শেষ কথা ৯৬

অধ্যায় চার

ইসলামী সভ্যতাবিষয়ক বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ ৯৮
ইসলামী মূল পাঠগুলোর শ্রেণী বিভাজন ৯৯
একটি ব্যাপক সভ্যতামুখী দৃষ্টিভঙ্গি ১০০
সমাজবিজ্ঞানের সূত্রসমূহ ১০২
অস্তিত্বের উদ্দেশ্য এবং বিশ্বে নিয়ম শৃঙ্খলার কারণ ১১০

অধ্যায় পাঁচ

সমাজ বিজ্ঞানের সূত্রসমূহ ১১৩
ইসলামিকরণ ও শিক্ষাবিজ্ঞান ১১৪
ইসলামিকরণ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান ১২১
ইসলামিকরণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ১২৯

অধ্যায় ছয়

ইসলাম ও ভবিষ্যৎ ১৩১
উম্মাহর চরিত্রের ভবিষ্যৎ ১৩১
ইসলামিকরণ ও একাডেমিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ১৩৪
মানবজাতির ভবিষ্যৎ পথ ১৩৭
ইসলামী ঐক্যের সমাজ ১৩৮
ইসলামে জ্ঞান চর্চা ১৩৯
ইসলামিকরণ : উম্মাহর বিচার্য বিষয় ১৪১
পরিশেষ ১৪৩

www.pathagar.com

অধ্যায় এক
সমসাময়িক ইসলামী আসালা : একমাত্র সমাধান

দিক নির্দেশিকা

মুসলিম জাতির মূল্যবোধ ও রীতিনীতি এবং এর মানবীয় ও বৈষয়িক সম্পদ সম্পর্কে ধারণা থাকা সত্ত্বেও কেউ যদি উম্মাহ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান না রাখেন, তাহলে তার পক্ষে উম্মাহর বর্তমান সাংস্কৃতিক অধোগতি, রাজনৈতিক বিচ্যুতি এবং উম্মাহর মানবিক দুর্ভোগ ও দুর্দশা সম্পর্কে সঠিকভাবে উপলব্ধি করা কঠিন হবে। আর এটিই হলো উম্মাহর মূল সংকট। এটি অবশ্যম্ভাবী যে, এ ধরনের পশ্চাৎপদ এবং দিক নির্দেশনাহীন অবস্থা মুসলিম উম্মাহর চেতনার জগতে প্রধান বিষয় হিসেবে গণ্য ছিল, যা মুসলিম উম্মাহর অগ্রবর্তী ও চিন্তাশীল মনীষীগণ বরাবর চর্চা করে এসেছেন। সুতরাং এটিই স্বাভাবিক যে, উম্মাহকেই পরিবর্তন, সংস্কার ও পুনর্জাগরণ সম্ভব করতে হবে।

উম্মাহর কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জানতে হলে এবং সীমাবদ্ধতাগুলো সফলতার সাথে দূর করার জন্য যে সব শর্ত পূরণ করা প্রয়োজন হবে, আমাদেরকে সেসব মূল কারণ অবশ্যই নির্ণয় করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে উম্মাহর বর্তমান দুর্বলতা ও পশ্চাৎপদতা এমন প্রকটভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে যে, উম্মাহর অস্তিত্ব, এর জীবন বিধান, চিন্তা, প্রতিষ্ঠানসমূহ পশ্চিমা সভ্যতার দ্বারা ধ্বংসের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে উম্মাহর প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে জানার জন্য একটি ব্যাপক এবং গভীর বিচার-বিশ্লেষণমূলক নিরীক্ষা ও অনুসন্ধিৎসা থাকা দরকার। এ ধরনের চুলচেরা বিশ্লেষণ আমাদেরকে এমন এক পথের সন্ধান দেবে, যে পথে অগ্রসর হলে উম্মাহর অধঃপতনের মৌলিক কারণগুলো আমরা আবিষ্কার করতে সক্ষম হতে পারবো।

কয়েক শতাব্দী যাবত উম্মাহ অধঃপতিত অবস্থায় রয়েছে। প্রত্যন্ত কিছু অঞ্চল ছাড়া উম্মাহর সকল এলাকা ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দখলে ছিল। সম্ভবত এর চেয়েও বেদনাদায়ক সত্য যে, এখন পর্যন্ত উম্মাহর উপর সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রভাব সতত ক্রিয়াশীল। গোটা বিশ্ব উম্মাহর কূটনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ এলাকাসমূহ, বিদেশী শিল্পের জন্য উপযুক্ত ও গুরুত্বপূর্ণ বাজার, এর কাঁচামাল এবং সস্তা অদক্ষ শ্রমিক দখলের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। ঐ সব ঘটনা এমন সময় ঘটছে যখন উম্মাহ নিজের প্রয়োজনই মেটাতে পারছে না এবং শিল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত কাঠামোসহ অভিজ্ঞতা, প্রযুক্তির

www.pathagar.com

উন্নততর প্রতিষ্ঠান এবং স্বাধীন সার্বভৌম ক্ষমতার উৎসসমূহের অভাবের তাড়নায় দারুণভাবে জর্জরিত।

উম্মাহর অধঃপতনের কারণ ইতিহাসের গভীরে প্রোথিত রয়েছে। যেমন, অনেক জাতির ক্ষেত্রে দেখা যায় তাদের অধ:পতনের শুরুতে তারা সম্পদ ভোগ করেছে এবং স্বচ্ছন্দে জীবন নির্বাহ করেছে, যা ছিল তাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মের উন্নতি ও প্রগতির ফসল। উম্মাহর ক্ষেত্রে উপরিউক্ত উদাহরণকে সুস্পষ্ট ও প্রণিধানযোগ্য বলা যায়, এর প্রাথমিক যুগে সম্পদ, জ্ঞানার্জনের কেন্দ্রসমূহ, ব্যক্তির অঢেল ধনসম্পদ এবং সরকারি কর্মচাঞ্চল্যের কোনো কমতি ছিল না। তথাপি পতনের সুস্পষ্ট চিহ্নসমূহ সীমান্ত বৃদ্ধির তৎপরতা, দুর্নীতির সামাজিকীকরণ ও আক্রমণাত্মক মনোভঙ্গির বদলে আত্মরক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গির লালন এবং বাগদাদ, জেরুজালেম, কর্ডোভাসহ বিভিন্ন স্থানের অপরিমেয় ক্ষতির মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আমরা আমাদের অধ:পতনের কারণসমূহ জানতে চাইলে আমাদেরকে অসুস্থতার কারণ ও এর লক্ষণ এবং জটাজালের মধ্যে সুস্পষ্ট রেখা টেনে তার পরেই তুলণামূলক আলোচনায় প্রবেশ করতে হবে। প্রাচীন সম্প্রদায়সমূহের ঐতিহাসিক বিকাশ এবং বিভিন্ন ধরনের মতবাদ উম্মাহর ক্ষেত্রে নতুন কোনো বিষয় নয়। এসব দার্শনিক মত হলো সাবাইয়া, ইসমাইলিয়া, নুসাইবিয়া, দ্রুজ ও অন্যান্য। অতীতের ধারাবাহিকতার সূত্রে বর্তমানে টিকে আছে বাহাই, আহমাদিয়া, কাদিয়ানী এবং জাতীয়তাবাদ।

উপরিউক্ত আন্দোলনগুলো কোনো সমস্যার চিহ্ন বহন করে না, উম্মাহর প্রাথমিক বছরগুলোতেই এগুলো শিকড় গাড়ার সুযোগ পেয়েছিল। রোমান ও পারসিয়ার রাজন্যবর্গ মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিল, এই অস্ত্র ধারণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কারণেই মরু আরবজাতির মধ্যে সামাজিক ও সামরিক শক্তি প্রসারের (যারা সে সময় ইসলাম গ্রহণ করেছিল) লক্ষ্যে যে কার্যক্রম গৃহীত হয়েছিল তার ফলেই ঐ ধরনের বিভিন্নমুখী মতবাদের সৃষ্টি হয়। ইসলামী শিক্ষার পরও আরববাসীর উপজাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি কখনো পুরোপুরি পরিবর্তিত হয়নি। তারা শীঘ্রই বিদ্রোহ করে বসে এবং কালক্রমে নবীর প্রতিষ্ঠিত রাজধানী মদীনা আক্রমণ করে উসমান ইবনে আফ্ফান তথা তৃতীয় খলিফার সরকারের পতন ঘটায়। এই দুর্ঘটনা রাষ্ট্র সৃষ্টিতে উপজাতীয় এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গির এমন পর্যায় অতিক্রম করে যা ইসলামী এবং ইসলাম পূর্ব শিক্ষা ও ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে।

গভীর অভিনিবেশের সাথে উম্মাহর বিষয়গুলো মুল্যায়ন করলে আমরা উম্মাহর সংকট ও সমস্যাগুলো গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারি আর উম্মাহকে আরো অধঃপতন ও কষ্ট থেকে উদ্ধারের লক্ষ্যে তাৎক্ষণিক কর্মসূচি প্রণয়ন করতে পারি। এসব ক্ষতিকর

www.pathagar.com

ঘটনাগুলো স্পষ্ট এবং বাস্তব, মূলত যার উপর সকল যুক্তিবাদী মানুষ একমত হতে পারে, তবুও এসব বিষয়ের সমাধানের ব্যাপারে কোনো ঐকমত্য নেই বা সিদ্ধান্তের জন্য সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্ট কোন দৃষ্টিভঙ্গিও নেই। সবচেয়ে বড় জটিলতা হলো জাতিকেন্দ্রীকতা ও জাতীয় নাস্তিকতা, বল প্রয়োগ এবং যৌন স্বাধীনতার এন্তার বিস্তার। নিজেদেরকে যারা সংস্কারক বলে দাবি করেন তাদের মধ্যে অনেকে রয়েছেন যারা প্রকৃতপক্ষে উম্মাহর শত্রু, কেননা তারা এসব বিদেশী মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের সকল পথ ও পন্থা ব্যবহার করেন। তাদের প্রকাশ্য দাবি হলো এসব মতবাদ সুস্থ সমাজের লক্ষণ বা এগুলোর সংস্কার প্রগতির পথে যাত্রা শুরুরই ইঙ্গিত।

প্রথমত আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে সংকট সমাধানের শুরুটা আমরা কোথা থেকে শুরু করবো। আমাদের উচিত হবে উম্মাহর আওতাধীন যাত্রা শুরুর নির্দিষ্ট ক্ষেত্র নির্ণয়ের বিকল্পসমূহ স্থির করা। সে প্রেক্ষিতে এগুলোকে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ

১. বিদেশী সমাধানের অনুকরণ : এটিকে প্রায়শ বিদেশী সমাধান বলা হয়, যা মূলত ধার করা সমাধান এবং যার মূল ভিত্তি বা উৎস হলো সমসাময়িক পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা (ধর্মনিরপেক্ষ ও বস্তুবাদ), এটি ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ, সমষ্টিবাদ বা রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, নিরীশ্বরবাদ, পুঁজিবাদ অথবা মার্কসবাদ হিসেবে পরিচিত।

২. ঐতিহাসিক সমাধানের অনুকরণ : এই সমাধান ইসলামের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে সঞ্চিত সমাধানের উপর নির্ভর করে, যা কোনো স্থান-কাল-পাত্রের সংশ্লিষ্টতাকে গুরুত্ব দেয় না।

৩. ইসলামের মৌলিক সমাধান : এটি হচ্ছে ইসলামের সূত্রগুলো থেকে সাহায্য নিয়ে উম্মাহর বিভিন্ন সমস্যার প্রাসঙ্গিক সমাধানের জন্য প্রয়োগিক দৃষ্টিভঙ্গি। মৌলিক প্রাণশক্তি পুনরুদ্ধারের জন্য উম্মাহর আকাঙ্ক্ষার চারটি পূর্বশর্ত রয়েছে।

ক. একটি সুষ্ঠু দৃষ্টিভঙ্গি নির্দিষ্টকরণ; খ. এই দৃষ্টিভঙ্গির উপর অবিচল আস্থা; গ. লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করার দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হওয়া এবং ঘ. এর সাফল্য নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় বাস্তব উপকরণসমূহের ব্যবস্থা করা।

আমরা যে বিষয়গুলোকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ দিক বলে মনে করেছি তা যদি সরাসরি জনগণের কাছে নিয়ে গিয়ে এবং উম্মাহর লেখক, চিন্তাবিদ ও নেতৃবৃন্দের কাছে ব্যাখ্যা করে আমরা সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করতে পারি এবং তা হলেই আমাদের মাঝে যে দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে তার সাথে তাদেরকে শরীক করা সম্ভব হবে।

সম্ভবতঃ সমাধান খুঁজে পাওয়ার সবচেয়ে কার্যকর পন্থা হচ্ছে আমাদের ত্রুটিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির দুর্বলতাগুলোও খোলাখুলি প্রকাশ করা। কেন এ দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক নয় তা ব্যাখ্যা করার পর সঠিক সমাধান উপস্থাপন করে কেন এ সমাধান গ্রহণ করা হলো তাও ব্যাখ্যা

www.pathagar.com

করতে হবে। এই পুস্তকে এই পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়েছে। উম্মাহ যেখানে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে আক্রান্ত এবং সাংস্কৃতিক আগ্রাসীরা উম্মাহকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করতে চায়, সে ক্ষেত্রে উম্মাহকে অবশ্যই সে কারণগুলো উপলব্ধি করতে হবে যে, কেন অন্যদের প্রস্তাবিত সমাধান উম্মাহর কোনো কাজে আসছেনা। এভাবে উম্মাহ নিজের জন্য এর চেয়ে উপযোগী সমাধান নির্ণয় করতে আরো বেশী সক্ষম হবে এবং এই সমাধানকে বাস্তবে রূপদান করা যাবে।

অনুসরণযোগ্য ঐতিহাসিক সমাধান

ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিই ঐতিহ্যগতভাবে উম্মাহর পছন্দনীয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি স্বভাবতই পার্থিব, স্থানীয় এবং জাতিগত বিবেচনাকে দূরে সরিয়ে রাখে। সাম্প্রতিক সময়ে এই দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক জীবনধারা এবং উম্মাহর অস্তিত্ব ও চিন্তাধারার প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন শক্তিগুলোর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বারবার ব্যর্থ হয়েছে। ঐতিহাসিক সমাধানগুলো কার্যকর থাকলে বর্তমানের কোনো সংকট দেখা দিত না। কোনো অধঃপতন আসত না এবং কোনো ভাবে দুর্যোগের ভয় থাকত না। অধিকন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব হ্রাসকারী কোনো উপাদান যদি থেকেই থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে, ঐতিহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি সেগুলোকে বিবেচনায় আনতে ব্যর্থ হয়েছে। যাই হোক, এই দৃষ্টিভঙ্গি সমস্যাটিকে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে মোকাবিলা করতে পারেনি।

ঐতিহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান ত্রুটি হচ্ছে, যেহেতু এটি তার নিজস্ব শুদ্ধতা সম্পর্কে পূর্ব শুভ ধারণা নিয়ে কাজ শুরু করে সে কারণে এই দৃষ্টিভঙ্গি তার সাথে দ্বিমত পোষণকারী সংশ্লিষ্ট মহল, দৃষ্টিভঙ্গি এবং পরিবেশকে কোনোভাবেই বরদাস্ত করতে পারে না। যে দৃষ্টিভঙ্গি বিরোধীদের সহযোগিতা কামনা করে তা সত্যিই অবাস্তব। বরং এটি উম্মাহর সমস্যারই কারণ। যে দৃষ্টিভঙ্গি দীর্ঘকাল ধরে উম্মাহর চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করে রেখেছে তা হচ্ছে ইসলামের স্বর্ণযুগের বাহ্যিক ঠাটবাট বজায় রাখার একগুঁয়েমি মনোভাব, এর চেয়ে বেশি বললেও অত্যুক্তি হবে না। ঐতিহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি ইতিহাস ও বস্তুগত উন্নতির বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে। সুতরাং ইসলামের উপর উম্মাহর ঈমান থাকলেও ঐতিহ্যগত দৃষ্টিভঙ্গি পূর্বাপর ব্যর্থ হয়ে আসছে। ফকিহগণ যে আধুনিক জগতের 'মোয়ামেলাত' বা বৈষয়িক বিষয়াবলীর চর্চা থেকে নিজেদেরকে দূরে রেখে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও ব্যক্তিগত বিষয়াবলীর মধ্যেই কেন্দ্রীভূত করে রেখেছেন তাও ঐতিহ্যগত দৃষ্টিভঙ্গিরই বহিঃপ্রকাশ। ঐতিহ্যগত দৃষ্টিভঙ্গি এখন যুক্তিহীন প্রান্তিক চরমপন্থার দিকে কীভাবে নিয়ে যেতে পারে তার প্রকৃত উদাহরণ এই শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংস্কারকের একটি উক্তি। এই সংস্কারক খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়কালের সামাজিক এবং রাজনৈতিক পদ্ধতির মধ্যকার সম্পর্কের ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ঐতিহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে তিনি যে মতামত ব্যক্ত করেছিলেন তা ছিল তার ভাষায় একটি ন্যায়পরায়ণ একনায়কত্ব, যাদের

www.pathagar.com

মাধ্যমে উম্মাহর সংস্কার করা যেতে পারে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যে কোনো ছাত্রই জানেন সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে এই ধরনের উক্তি একটি স্ববিরোধিতার নামান্তর মাত্র। একনায়কত্ববাদ ও ইনসাফ যে সংঘর্ষশীল এবং কোনোভাবেই সংগতিপূর্ণ নয়, তা আল্লাহর কিতাবে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে : মানুষ নিজেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ হিসেবে ধারণা করে সব ধরনের সীমারেখা লঙ্ঘন করে (৯৬ : ৬-৭)।

... এবং তাদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ করুন (৩ : ১৫৯)।

... যারা নিজের কাজকর্ম পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে করে (৪২ : ৩৮)।

ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে প্রথম খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়। উদাহরণ হিসেবে সে আমলে খলিফাদের সাথে বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠী ও উপজাতি গ্রুপের মোকাবিলার বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। এসব বিদ্রোহই শেষ পর্যন্ত আল হুসাইন ইবনে আলী, আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের, মুহাম্মদ দুআল-নাফস আল জাকিয়া, যায়েদ ইবনে আলী এবং অন্যান্যদের মতো পুরানো নেতৃত্ব যারা মদীনার প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের অনুকরণে একটি ইসলামী প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রবক্তা ছিল, তাদের সাথে উদীয়মান রাজনৈতিক নেতৃত্ব যারা জাতিগোষ্ঠীভিত্তিক অহমিকাবোধ এবং উপজাতীয় আনুগত্যের ভিত্তিতে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল তাদের সাথে চূড়ান্ত পর্যায়ে সংঘর্ষের রূপ লাভ করে। যখন প্রথম গ্রুপটি দ্বিতীয় গ্রুপের কাছে রাজনৈতিকভাবে পরাজিত হলো তখন প্রথম গ্রুপের লোকজন এবং তাদের সাথী মনীষী-রা সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। যত সময় অতিক্রান্ত হতে লাগল ততই সমাজ জীবন থেকে মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রকট হতে লাগল। এর ফলে নতুন চিন্তাস্রোতের একটি দল সৃষ্টি হলো, যারা ছিলেন বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সংরক্ষণবাদী (কারণ তাদের ভয় ছিল স্বেচ্ছাচারী শাসক ও তাদের তাবেদারদের হাতে শরিয়াহ বিকৃত হতে পারে) যারা এ ধরনের মতের অনুসারী ছিল, তারা তাদের লেখার পুরো অংশেই ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনাবলীর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ইসলামী সমাজ ও সংস্কৃতির অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করে দেয় (মুহাম্মদ (সা)-এর জীবনকাল এবং তাঁর ওফাতের পর ত্রিশ বছর)। এভাবেই তারা বুদ্ধিবৃত্তিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকে অযোগ্যদের হাতে উম্মাহর রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্ব ছেড়ে দিল। এভাবে ময়দান ছেড়ে দেয়ার কারণে উম্মাহ স্বৈরতন্ত্র, দারিদ্র্য এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক অবক্ষয়ের শিকার হলো। বাস্তবিকই মোঙ্গলীয় আগ্রাসন এবং ক্রুসেডের সময় থেকে এটাই ছিল উম্মাহর ভাগ্যলিপি। অতিসাম্প্রতিককালে মুসলিম জাতি বিদেশী ঔপনিবেশিক শক্তির পদানত হয়েছে এবং তাদের অবস্থা হয়েছে এমন যে, স্বেচ্ছায় হোক বা চাপের মুখে হোক, তারা একটি বিদেশী সভ্যতার অন্ধ অনুকরণজনিত বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। আর প্রত্যেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে এই অন্ধ অনুকরণের ফলে তারা বৃহত্তর এবং ব্যাপকভাবে নাজুক পরিস্থিতি ও পতনের দ্বারপান্তে উপনীত হয়েছে। এভাবে উত্তর ও

www.pathagar.com

দক্ষিণের উন্নত শিল্পসমৃদ্ধ দেশ এবং তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশ যাদের অধিকাংশই মুসলিম, এদের মধ্যে সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত ব্যবধান বর্তমান রয়েছে। এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যায় যে, ঐতিহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি কোনো কাজে আসেনি এবং স্থান, কাল ও চিন্তার জগতে জীবনের নিরন্তর পদচারণা অন্তঃসারশূন্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে এই দৃষ্টিভঙ্গির সুস্পষ্ট পরিণতি হলো পশ্চাৎমুখীতা, দুর্বলতা ও পতন।

অনুসরণযোগ্য বিদেশী সমাধান

এই দৃষ্টিভঙ্গি মুসলিম বিশ্বে বিদ্যমান। দু'শ বছর আগে যখন উসমানিয়া সাম্রাজ্য ইউরোপের সামরিক শক্তির মুখোমুখি হলো তখনই প্রথম এ বিদেশী সমাধান গ্রহণ করা হয়। খলিফা তৃতীয় সেলিমের আমলে উসমানীয় সাম্রাজ্য তাদের পতনমুখী শক্তি পুনরুদ্ধারের উপায় হিসেবে ইউরোপকে অনুকরণের নীতি গ্রহণ করে।

যখন বিদেশী কারিগর, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আমদানীর চেষ্টা করা হলো তখনই অন্তঃসারশূন্যতার পরিক্রমা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে অনুকরণই তাদের অভিষ্ট লক্ষ্য হিসেবে পরিণত হলো। প্রথম আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তুরস্ক এই ব্যাপারে তার অভিযাত্রা শুরু করে। এরপর পাশ্চাত্য কায়দায় সেনা অফিসারদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি সামরিক একাডেমী স্থাপন করে। উসমানীয় খলিফারা তাদের পরিকল্পনা কার্যকর করা এবং তাদের ক্ষমতা ও মর্যাদা পনুরুদ্ধারের জন্য এতো সংকল্পবদ্ধ ছিলেন যে, তাদের নিজস্ব পুরোনো সেনাবাহিনী জেনিসারিকে যখন আধুনিকায়ন পরিকল্পনা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে, তখন তারা ব্যারাকে তাদের বাহিনীকে নির্মমভাবে হত্যা করে। সে যাহোক উসমানিয়া সাম্রাজ্যের ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে পাশ্চাত্যের অনুকরণ, পাশ্চাত্যের পদ্ধতি অনুসরণ কোনোটাই সফল হতে পারেনি। এমনকি তাদের সালতানাতের সামনে যে চ্যালেঞ্জ ছিল তাও তারা মোকাবিলা করতে পারেনি অথবা পাশ্চাত্য থেকে আহরিত জ্ঞানও তারা উম্মাহর মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারেনি। বরং পশ্চিমা সামরিক শক্তির অগ্রাভিযানের দাপটে উসমানীয় সালতানাত অব্যাহতভাবে পিছু হটতে থাকে। ঘটনার অপ্রত্যাশিত মোড় পরিবর্তনের কারণে তারা ইউরোপে ঝাঁকে ঝাঁকে শিক্ষার্থী পাঠিয়ে পাশ্চাত্যের অনুকরণপ্রিয়তাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। এই নীতির ফলে পাশ্চাত্যকরণ প্রক্রিয়া আরো বৃদ্ধি পায়। ফলে অনুসরণের ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ হয়। রাজনৈতিক বা সামাজিক সংস্কার পাশ্চাত্যের ধাঁচে এগিয়ে নিতে হবে, এ সম্পর্কিত তুর্কিদের ধারণা ছিল এক ধরনের অনুকরণপ্রিয়তা। এই অনুকরণপ্রিয়তা এক নতুন মাত্রা যোগ করে। তা না হলে তাদের সাম্রাজ্যের পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক, প্রশাসনিক এবং সামরিক সংস্কারের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হতো না। এই ধারণা ও চিন্তাধারা অনেক উদার রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের জন্ম দেয়।

www.pathagar.com

এসব সংস্কার পরবর্তী উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ধাপে মিধাত পাশার সংবিধানে সন্নিহিত হয়ে গৌরব দীপ্ত হয়। এটি একটি ঐতিহাসিক সত্য যে, তাদের সংস্কারের এই প্রচেষ্টা পূর্ববর্তীদের তুলনায় তেমন সফল হয়নি। এভাবে তারা সুলতান আবদুল হামিদ দ্বিতীয়কে সরাসরি শাসন পরিচালনায় উৎসাহিত করে। কারণ এটিই ছিল ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার ঐতিহাসিক মডেল পুনরুদ্ধারের সর্বশেষ হতাশাব্যঞ্জক প্রচেষ্টা। এই সংস্কার আন্দোলন বিদেশী অনুকরণ নীতির উপর ভিত্তি করে অগ্রসর হয়। জাতিগঠনের উপাদান হিসেবে জাতীয়তাবাদের গুরুত্ব সম্পর্কিত এক নতুন ও সুস্পষ্ট ইউরোপীয় ধ্যানধারণা এই সংস্কার আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। তুর্কিদের মধ্যে বিদেশী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী সংস্কার আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ জাতীয়তাবাদী ধারণাকে বলিষ্ঠভাবে উচ্চকিত করে। এটি অবশ্যম্ভাবীরূপে একটি প্যান- তুর্কি জাতীয়তাবাদ। পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার সকল তুর্কি ভাষাভাষী এর আওতাভুক্ত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে আধুনিকপন্থী সংস্কার আন্দোলনে তুরস্ক ক্ষমতাসীন হতে শুরু করে। এ সময় তারা ইউনিয়ন এবং প্রগ্রেস পার্টি নামে উসমানীয় সালতানাতকে চ্যালেঞ্জ করে সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদকে ক্ষমতা থেকে হটিয়ে দিয়ে নিজেরা ক্ষমতা দখল করে বসে। তুর্কিদের এই সংস্কার প্রচেষ্টা চূড়ান্ত যুদ্ধের পরাজয়ের মাধ্যমে ব্যর্থ হয়। এই বিপর্যয় ছিল উসমানীয় আমলের যে কোনো বিপর্যয়ের চেয়ে অধিক ভয়াবহ। চূড়ান্ত যুদ্ধে গ্রীকরা আনাতোলিয়ার প্রাণকেন্দ্র তুর্কিদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়। অথচ এই গ্রীকরা ছিল তুর্কিদের তুচ্ছ প্রজা।

এই সব দুর্বিপাক সত্ত্বেও বিদেশী সংস্কার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। আধুনিক তুর্কি প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল মোস্তফা কামাল এবং তার সামরিক চক্রের হাতে উসমানীয় সালতানাতের পতন পর্যন্ত উপরিউক্ত সংস্কার আন্দোলন চলতে থাকে। এই মহল পাশ্চাত্যের অনুকরণ ও অনুসরণকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যায়। কারণ এর নেতৃবৃন্দ ইউরোপীয় ধাঁচের সাথে সংগতি রেখে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসে। সমাজে প্রতিষ্ঠিত ইসলাম ও ইসলামী সংস্কৃতির অবয়ব ধূলিসাৎ করে ইউরোপীয় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী মতবাদ গ্রহণ করে এবং সুস্পষ্টভাবে ইসলামকে রাষ্ট্র ও সমাজের সকল ক্ষেত্র থেকে পৃথক করে ফেলে। উপরন্তু তারা ইসলামী আইন ও উসমানীয় রীতি পদ্ধতিকে রহিত করে তদস্থলে ইউরোপের সবচেয়ে অগ্রসর দেশ সুইজারল্যান্ডের আইনকানুন প্রতিষ্ঠা করে। ভবিষ্যত প্রজন্মের ধ্যানধারণায় ইসলামী সংস্কৃতির প্রভাব চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে আরবি বর্ণমালা রহিত করে সেখানে লাতিন বর্ণমালা চালু করে। জনসাধারণকে ইউরোপীয় পোশাক পরিধান করতে, মহিলাদেরকে হিজাব পরিত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। এমনকি আজানের মতো একটি ইসলামী অনুষ্ঠানকে তুর্কি ভাষায় করার নির্দেশ দেয়া হয়।

www.pathagar.com

আতাতুর্কের শাসন পরিসমাপ্তির আগে নব্য সরকার দেশের প্রধান আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশাসন ও সেগুলোর নীতি নির্ধারণে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ সম্পর্কিত বিধি আরোপ করে। বিশেষ করে ব্যাংক ও বীমা কোম্পানির মতো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্র গ্রহণ করে। যাহোক, এসব কারণে তুরস্কের কোনো উন্নতি হয়নি। বরং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আমদানি, একটি আধুনিক সেনাবাহিনীর সংগঠন, বেসামরিক প্রশাসনের আধুনিকায়ন, উদারনৈতিক মতবাদের পৃষ্ঠপোষকতা, পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রসার, রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক সংস্কারের আইন প্রণয়ন, জাতীয়তাবাদ, উপজাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ গ্রহণ, ইউরোপীয় আইন ও পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা এবং সকল গুরুত্বপূর্ণ আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণসহ সব ধরনের বৈদেশিক অনুকরণ ও অনুসরণের সকল পর্যায় অতিক্রম করা সত্ত্বেও তুরস্কের পতন-ধারা অব্যাহত থাকে। এসব অনুকরণের ফলে তুরস্ক আরো দুর্বল রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এর ফলে তুরস্কের উপর পাশ্চাত্য শক্তির আধিপত্য বিস্তার লাভ করে। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ নীতির ব্যর্থতা এবং পাশ্চাত্য শক্তির চাপের মুখে আতাতুর্কের উত্তরাধিকারী এবং দীর্ঘকালের রাজনৈতিক সহচর জেনারেল ইসমত ইননু দেশে একদলীয় শাসন (রিপাবলিকান পার্টি) অবসান করে এক নতুন ধরনের উদার রাজনৈতিক সংস্কার মেনে নিতে বাধ্য হলেন। এর ফলে নতুন করে নির্বাচন হয় এবং আদনান মেন্দারেসের নেতৃত্বে বিরোধী ডেমোক্রেটিক পার্টি ক্ষমতাসীন হয়।

এ সকল পরিবর্তন যত গুরুত্বের সাথেই সম্পন্ন করা হোক না কেন, এর কোনোটাই তুরস্ককে উদ্ধার করতে পারেনি অথবা তাকে খেলাফতকালের গৌরবময় ক্ষমতা এবং মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে পারেনি। বরং অধঃপতন এমন ষোলকলায় পূর্ণ হলো যে, ১৯৬০ সালের এক সামরিক অভ্যুত্থানের পর আদনান মেন্দারেসকে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়। পরপর কয়েকটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে যার ফলে একনায়কত্ববাদ ও জুলুম জাতির উপর জেঁকে বসে। সুতরাং তুরস্ক আগেরমতোই 'সিকম্যান অব ইউরোপ'ই রয়ে যায়। সত্য বটে তুরস্কের অবস্থা ছিল সিকম্যানের চেয়েও নাজুক। তুরস্ক হচ্ছে পাশ্চাত্যের সবসময়ের অনুবর্তী। তার ভাগ্য উন্নয়নের কোনো আশাই আর অবশিষ্ট রইল না।

যদি আমরা মোহাম্মদ আলীর সময় ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এ ক্ষেত্রে মিশর যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে সেদিকে দৃষ্টিপাত করি এবং আমরা যদি আরব, এশিয়া এবং আফ্রিকার মুসলিম দেশগুলোর বিভিন্ন অভিজ্ঞতার দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে আমরা তুরস্কের অভিজ্ঞতা ও তার বেদনাদায়ক ফলাফলের বাইরে নতুন কিছুই সংযোজন করতে পারব না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলিম বিশ্বে যা কিছু বিদেশী তা অনুকরণ করার নীতি অন্ধভাবে মেনে চলার কারণে মুসলিম জাহান একটি দুর্বল ও ভঙ্গুর অস্তিত্বে পরিণত হয়েছে। পাশ্চাত্যের দেশগুলোর সাথে এর সভ্যতার যে ভিন্নতা রয়েছে তা ক্রমান্বয়ে বিস্তৃততর হয়েছে।

www.pathagar.com

এই দৃষ্টিভঙ্গির ব্যর্থতার কারণগুলো সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। জাতিকে জীবন্ত মানুষের সমষ্টি হিসেবে তার পরিগঠনে বাধাবিপত্তি কাটিয়ে উঠার ক্ষেত্রে যে পরিমাণ শক্তি ব্যয় করতে হয় তা ব্যক্তির পরিগঠনের তুলনায় অবশ্যই অনেক জটিল। তারপর প্রতিটি জাতির নিজস্ব প্রেরণা, মনস্তত্ব ও ইতিহাস রয়েছে আরো রয়েছে মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও মতবাদের ক্ষেত্রে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি। এসব সঠিকভাবে বুঝাতে না পারলে একটি জাতির অগ্রগতির জন্য তার সুপ্ত সম্ভাবনাগুলো উপলব্ধি করে তাকে অনুপ্রাণিত করা কঠিনতর হবে।

একজন মানুষকে যা অনুপ্রাণিত করতে পারে তা অন্যকে নাও করতে পারে। বিভিন্ন জাতি সম্পর্কেও এটা সত্য। কারণ, প্রতিটি জাতি সক্রিয় ও সজীব থাকে তার নিজস্ব প্রণোদনা ও অগ্রাধিকার নীতির মধ্যে। অন্য জাতির সাথে আলোচিত জাতির মৌলিক পার্থক্য না বুঝে কোনো জাতির প্রণোদনা ও অগ্রাধিকার নীতির উপেক্ষা করা এবং উৎপাদন ও সংস্কারের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অন্ধ অনুকরণ করার জন্য প্রাণপাত করা বড় ধরনের ভুল বৈ কিছু নয়। একটি জাতিকে সঠিকভাবে উপলব্ধি না করলে বিগত শতাব্দীর মতো উম্মাহর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর হবে না।

সাম্প্রতিক ইতিহাসের কিছু দৃষ্টান্ত

পূর্বে যা উল্লেখ করা হয়েছে তার সহজবোধ্য ও সরল উদাহরণ হলো, পাশ্চাত্যের অন্যান্য ব্যাংকিং ব্যবস্থা, যা মুসলমানদের উপর প্রভাব বিস্তার করে আছে। পশ্চিমা দেশগুলোতে এ ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু হয়। ব্যাংকিং-এর কাজ ছিল পাশ্চাত্য সমাজের আর্থিক ও বাণিজ্যিক প্রয়োজনগুলো মেটানো। আমদানিকৃত এই প্রতিষ্ঠানটি মুসলিম উম্মাহর বুনিয়াদী বিশ্বাসের উপর সুস্পষ্টভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। উম্মাহর উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে সহায়তাদানের পরিবর্তে এ ব্যাংকিং ব্যবস্থা অধিকতর পাশ্চাত্য প্রভাবের পথকে সুগম করে। বিশ্বাস এবং মূল্যবোধের পার্থক্যকেই এ নেতিবাচক ফলাফলের কারণ বলে ধরে নেয়া যায়। বাস্তবিকই পাশ্চাত্য ধাঁচের ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রগতি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করার পরিবর্তে বিভেদ সৃষ্টি, অধিকতর সাংঘার্ষিক পরিবেশ সৃষ্টি, উম্মাহর শক্তিকে নিঃশেষ করে দেয়া, উম্মাহর প্রেরণাদায়ক শক্তিকে ক্ষয়িষ্ণু করা, প্রণোদনাকে নির্বাপিত করা এবং সম্পদের উপর বিদেশী আধিপত্য প্রতিষ্ঠাকে সহজতর করার মাধ্যমে সাফল্য লাভ করে।

পাশ্চাত্য ধাঁচের ব্যাংকিং ব্যবস্থা পাশ্চাত্যে সফল হয়েছে বলে ধরে নিলে মুসলিম সমাজে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হওয়ার কারণ এই যে, এই ব্যবস্থার মধ্যে এমন সব রীতি-পদ্ধতি সংযুক্ত করা হয়েছে যা মূল বিজাতীয় এবং ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও মূল্যবোধের বিরোধী। ব্যক্তি মুসলিম এবং মুসলিম উম্মাহকে এই ব্যাংকিং ব্যবস্থা কঠিনতম পরীক্ষার সম্মুখীন করে। পরীক্ষার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো একজন ব্যক্তি বা মুসলিম জাতিকে

www.pathagar.com

সুদ ভিত্তিক লেনদেনের মাধ্যমে সম্পদ ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করে পরকালীন জীবনে লাঞ্ছিত হওয়া অথবা ইসলামের শিক্ষা ও মূল্যবোধের অনুসরণ করে এ পৃথিবীতে পরিশ্রম, পশ্চাৎপদতা এবং দারিদ্র্যকে বরণ করে নেয়া। মুসলিম বিবেকের দাবি হচ্ছে সে এ দুনিয়াতে এমন একটি সুন্দর জীবনযাপন করবে যার ফলে সে আখেরাতের অনন্ত জীবনে আল্লাহর করুণা, প্রতিদান এবং চিরকালীন সুখ অর্জন করতে পারবে। এ দুনিয়াতে কোনটি ভালো ও সঠিক এবং আখেরাতে কোন্‌টি ভালো, মুসলিম বিবেকের মধ্যে এ নিয়ে দ্বৈত বোধ-বিশ্বাস অথবা স্ববিরোধিতার কোনো সুযোগ নেই। মুসলিম বিশ্বে আজকের দিনের ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইসলামী সমাধান অথবা বিকল্প ব্যবস্থার একটি আংশিক উদ্যোগ মাত্র। যা সমসাময়িক কালের ইসলামী চাহিদা পূরণের আশাবাদ ব্যক্ত করে এবং এটি মুসলমানদের ব্যক্তিত্ব, চিন্তাধারা ও হৃদয়াবেগের সাথে ঐক্য সৃষ্টি করবে।

উম্মাহ্ ও আমদানিকৃত সমাধান

আমদানিকৃত বিদেশী সমাধান– রূপক অর্থে বলতে গেলে একটি নাট্যমঞ্চীয় সমাধান বৈ কিছু নয়। এই নাটকে মুসলিম উম্মাহ একটি নিষ্ক্রিয় দর্শক মাত্র। এ নাটকটি অভিনয়ে ভরপুর, যা বাস্তবের ছায়া মাত্র। দর্শকরা নাটকের বিষয় যারা মঞ্চাভিনয়ের সময় বড়জোর খুশিতে হাততালি দিয়ে বাহবা জানাতে বা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতে পারে। এর অর্থ এই নয় যে, মঞ্চে রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্বের প্রতিনিধিত্বকারী অভিনেতাদের মাঝে উম্মাহ কোনো তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করতে পারে। মনে হয় প্রতিবারই যখন এসব নাটকের কোনোটির যবনিকাপাত হয় অথবা তার কোনটির ভূমিকার সমাপ্তি ঘটে তখন যেন উম্মাহ সব কিছু ঝেড়ে মুছে ফেলে দিয়ে কিছু ঘটেনি এমন ভাব নিয়ে কাজকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তার ব্যাখ্যা আমরা এভাবেই করতে পারি, খুব শিগগিরই তারা আরেকটি নাটকের দর্শক হবে, তাদের চিত্ত আবারো বিক্ষিপ্ত হবে, ফের নতুন কোনো নেতৃত্ব সৃষ্টি হবে এবং তাদের সামনে আবারো আসবে অনুসরণযোগ্য ঐতিহাসিক ও বিদেশী বিভিন্ন সমাধান।

অগ্রসর জাতিগুলোর চিন্তাধারা, তাদের নেতৃত্ব এবং নিজ দেশে তাদের প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে পশ্চাৎপদ জাতিগুলোর চিন্তাধারা, তাদের নেতৃত্ব ও প্রতিষ্ঠানগুলোর পার্থক্য একেবারেই সুস্পষ্ট। উন্নত জাতিগুলোর জন্য এগুলো বাস্তব। কারণ এগুলো সেসব জাতির অস্তিত্ব, মূল্যবোধ, বিভিন্ন জনের চাহিদা থেকেই উৎসারিত হয়। জাতি তার নেতৃত্বের সাথে একাত্ম হয়ে একটি টিম হিসেবে দেশ বা জাতির অগ্রগতি, উন্নতি ও অভিষ্ট লক্ষ্যাভিসারী উন্নয়নের জন্য কাজ করতে চাইলে এসবই তার চিন্তাধারা, নীতি ও আদর্শের উপাদান হিসেবে কাজ করে।

www.pathagar.com

এ মৌলিক অন্তর্দৃষ্টি আমাদেরকে মুসলিম বিশ্বের এবং বৃহত্তর পরিমন্ডলে তৃতীয় বিশ্বে আমাদের ভাষার রাজনীতি ও রাজনীতিবিদদের কমেডির সুষ্ঠু ব্যাখ্যা দিতে পারে। এরই সাহায্যে উন্নত বিশ্বের রাজনীতি, সরকার এবং প্রশাসনের প্রকৃতির মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান, তা ব্যাখ্যা করা যায়। বাস্তবতা থেকে উৎসারিত একটি সমাজ ও সামাজিক প্রক্রিয়া একটি আন্দোলনের প্রতিনিধিত্বশীল পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং এই তৎপরতার মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে তার সম্যক ব্যাখ্যা করা যায়।

আমাদের প্রয়োজন আমদানি করা বিজাতীয় সমাধানের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক মাত্রার সম্যক ধারণা অনুধাবন করা। আমরা উপলব্ধি করতে পারলে অনুসরণ ও নকল নবিশকতায় সময় নষ্ট হবে না। এ পদ্ধতিতে আমরা আমাদের নিজেদের ও উম্মাহর অবশিষ্ট লোকদের আরো দুঃখ এবং যাতনা থেকে উদ্ধার করতে পারব। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ব্যর্থ জাতীয়তাবাদী, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, মার্কসবাদী অথবা যে কোনো ধরনের রাজনৈতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বের ধারায় উম্মাহ পরিচালিত হতেই থাকবে এটা কোনো ক্রমেই ন্যায়সংগত নয়। একই ব্যর্থ-ব্যবস্থাকে পরিচালিত করার জন্য কেনই বা উম্মাহকে সুযোগ দেয়া হবে।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ও পরিপক্ক মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও নেতাদেরকে সত্যিকারভাবে তাদের জন্য উন্মুক্ত একমাত্র পথে চলার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে, সে পথ যতই দুর্গম হোক। তাদেরকে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে যে, তারা যে নির্দিষ্ট সমাধান খুঁজে বেড়াচ্ছেন তা তাদের ধর্ম, স্বদেশ ও ইতিহাস থেকে গ্রহণ করতে হবে এবং তারা এ সমাধানকে আঁকড়ে ধরে বর্তমান সময়ের চ্যালেঞ্জকে দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলা করবে। এটি না করা হলে গত কয়েক শতাব্দী ধরে মুসলিম বিশ্ব যে দুঃসহ ব্যর্থতার গ্লানি বহন করছে তার তুলনায় আগামীতে সকল নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হলে তা হবে আরো দুঃসহ। অবশ্য মুসলিম নেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবী এবং গোটা মুসলিম উম্মাহ তাদের নিজ নিজ ঝোঁকপ্রবণতা ও পছন্দ থাকা সত্ত্বেও আগের মতোই যুক্তি, উন্নতি ও সম্মান অথবা ক্ষমতার স্বপ্ন দেখতে পারে। যদি তারা বর্তমান পথ ও পন্থা এবং চিন্তার পদ্ধতিতে পরিবর্তন না আনেন তাহলে পরিণামে তাদের ভাগ্য পূর্বের তুলনায় আরো বেশি খারাপ হবে। উম্মাহর বুদ্ধিজীবী ও সমাজ নেতাদের অবশ্যই একটি প্রামাণ্য বিকল্প ইসলামী সমাধান বের করতে হবে এবং এব্যাপারে জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। উম্মাহর চিন্তাবিদদের সংস্কৃতি, রীতিপদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের ভেতর থেকে সমাধানের উপাদানগুলো বের করে আনতে হবে।

উম্মাহ এবং ইতিহাস নির্ভর সমাধান

উম্মাহ অনুকরণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগের প্রচেষ্টা চালিয়েছে। তবে এ সমাধান উম্মাহর কাঠামো এবং তার ঐতিহাসিক অভিযাত্রায় সময় ও স্থানের উপাদানকে অবজ্ঞা করেছে।

www.pathagar.com

গত কয়েক শতাব্দীতে সমসাময়িক জীবনযাপন এবং মুসলিম মনন ও চিন্তাধারার প্রতি বৈরী শক্তিগুলো যে চ্যালেঞ্জ করেছে, তার প্রেক্ষিতে উম্মাহর অবিরত পশ্চাদপসারণই এ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করছে। এটি স্পষ্ট যে, এ দৃষ্টিভঙ্গি উম্মাহকে কাঙ্ক্ষিত মানে পৌঁছাতে পারেনি। কারণ উম্মাহর অবস্থা দ্রুত অধোগতির দিকে ধাবিত হয়েছে। তার শত্রুরা এ সংকট থেকে বেশ ফায়দা লুটছে এবং উম্মাহ অসংখ্য সমস্যার আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। এ দৃষ্টিভঙ্গি সফল হলে কিছু অদৃশ্য প্রতিবন্ধকতা কাঙ্ক্ষিত ফললাভকে প্রতিহত করছে বলে যে অজুহাত রয়েছে তা গ্রহণযোগ্য হতো না। ফলাফল দ্বারাই বোঝা যায় সমাধানটি কতটুকু সঠিক ছিল। সমাধানটি অপ্রত্যাশিত (unexpected) হলে তা ভালো সমাধান হবে না। কারণ অপ্রত্যাশিত বিষয়গুলো সমস্যার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

অনুকরণধর্মী ইতিহাস নির্ভর সমাধান তার নিজস্ব নীতিমালার সুষ্ঠুতাকে প্রতিষ্ঠা এবং অন্যসব পদ্ধতির অপর্যাপ্ততা প্রমাণের প্রচেষ্টা চালাতে গিয়ে বিষয়সমূহকে অতি সরলীকরণ করে ফেলেছে। বাস্তবে সাফল্যের শর্ত হিসেবে এ সমাধানের জন্য প্রয়োজন বিরোধীদের সহযোগিতা। তারা এ পথে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে, তা কোনো কিছুই সমাধান করতে পারবে না। এটি নিজেই সমস্যার একটি অংশের প্রতিনিধিত্ব করে। এ সমস্যার সমাধান করতে হবে।

অনুকরণমূলক ইতিহাস নির্ভর সমাধান, দীর্ঘসময় ধরে যা অধিকাংশ মুসলমানের মন-মগজ দখল করে আছে, ইসলামের স্বর্ণ যুগে ফিরে যাওয়ার জন্য তা এক কঠিন জেদের চাইতে বেশি কিছু নয়। এ দৃষ্টিভঙ্গি কোনো পরিবর্তনকেই বিবেচনায় নেয় না, তা বস্তুগত বা বর্ণনা প্রাসঙ্গিক (contextual) যাই হোক না কেন। উম্মাহকে তার দুঃখ-যাতনা থেকে মুক্তি দিতে এ 'ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি' কেন বারবার ব্যর্থ হয়েছে, এর পেছনের কারণ এটিই। অথচ উম্মাহ তার বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের দিক থেকে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারী এবং ইতিহাসের সকল পর্যায়ে তাই রয়ে গেছে। ঐতিহ্যবাহী মাজহাব ভিত্তিক ফিকাহর শুধু আনুষ্ঠানিক ইবাদত ও ব্যক্তিজীবন সংক্রান্ত আইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার পেছনে এটিই ছিল কারণ।

এ সমাধানের অন্তর্নিহিত ভ্রান্তির সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছেন সৈয়দ জামাল উদ্দীন আফগানী। যদিও তিনি সাম্প্রতিককালে সকল মুসলিম সংস্কারকদের মধ্যে মহান ও বিচক্ষণ ছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনি প্রাথমিক যুগের খলিফাদের সময়কালের সামাজিক, রাজনৈতিক পদ্ধতির বিষয়ে ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং তিনি তার সেই অখ্যাত সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে উম্মাহর এখন শুধু প্রয়োজন একটি একনায়ক নেতৃত্ব। একনায়কত্ব এবং ইনসাফ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পর্যায়ে দু'বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে। প্রাথমিক অবস্থায় অবতীর্ণ আয়াতগুলিতে এ বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।

... সত্যি সত্যি মানুষ সীমা লঙ্ঘন করে এ কারণে যে সে নিজেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ মনে করে (৯৬ : ৬-৭)।

www.pathagar.com

অনুকরণমূলক ইতিহাস নির্ভর দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির প্রচেষ্টায় আমাদেরকে প্রথম অনুধাবন করতে হবে যে, এ দৃষ্টিভঙ্গি উম্মাহর ইতিহাসে কীভাবে আসলো। খোলাফায়ে রাশেদার শেষ দিনগুলোতে উম্মাহর মননশীল ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিভক্তির মধ্য দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি শুরু হলো। এর বৈশিষ্ট্য ছিল রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব এবং নৃতাত্ত্বিক ও গোষ্ঠীবদ্ধ গোত্রীয় বেদুঈনদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই। বেদুঈনরা ধর্মদ্রোহী আন্দোলন এবং বারংবার রাজনৈতিক বিরোধিতাকে সমর্থন জানিয়েছিল। পরিশেষে এ সংঘর্ষ মদীনার রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ ও ক্ষমতাসীন রাজবংশীয় রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে মোকাবিলার একটি প্রকাশ্য রূপ পরিগ্রহ করলো। এ সময় মদীনার রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন হোসেন বিন আলী, আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের, মুহাম্মদ আল নাফসে জাকিয়া, যায়েদ বিন আলীর মতো নেতৃবৃন্দ। এ বুদ্ধিবৃত্তিক এবং ধর্মীয় নেতৃত্বের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে সংঘর্ষের অবসান ঘটে। এ পরাজয় তাদেরকে রাজনৈতিক ময়দান থেকে সরে যাওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং তারা নতুন এক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। সে ভূমিকা একটি বুদ্ধিবৃত্তিক ও ধর্মীয় বিরোধিতা। শতাব্দীর পর শতাব্দী তাদের বিচ্ছিন্নতা বাড়তেই থাকে এবং ইসলামী চিন্তাধারার প্রকৃতি ও নেতৃবৃন্দের মনোযোগ আকর্ষণীয় বিষয়সমূহের ওপর অনপনেয় কালিমার ছায়া পড়ে। ইসলামী চিন্তাবিদরা যখন বিভিন্ন সমস্যাকে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার এবং ওহীর বিষয়বস্তুকে আভিধানিক অর্থে ব্যাখ্যা করার ফাঁদে পড়ে যায়, তখনই তকলিদের চিন্তাধারার উৎপত্তি ঘটে। অযোগ্য ও বিবেকহীনদের হাতে শরিয়তের বিকৃতি এবং শরিয়াহকে সংরক্ষণে ইসলামী চিন্তাবিদদের আকাঙ্ক্ষা শেষ পর্যন্ত রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব ঘটায়। কালক্রমে ইসলামী চিন্তাধারা সুস্পষ্টভাবে অতীতমুখী হয়ে যায়। অতীতের দুর্বল স্মৃতিচারণ এবং পবিত্র স্থানগুলোর গুণকীর্তনে পর্যবসিত হয়। এ ঘটনা প্রবাহের ফলে উম্মাহর সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি নিস্তেজ হয়ে যায়। যখন নেতৃত্ব চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে সম্পূর্ণভাবে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি হারিয়ে ফেলে তখন উম্মাহ অন্ধ অনুকরণ ও বুদ্ধিবৃত্তিক স্থবিরতায় নিজেদের সমর্পণ করে। ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের বেলায় দেখা গেছে যে, তাদের বাস্তব আর কোনো সামাজিক বা রাজনৈতিক ভূমিকা নেই। রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্ব বুদ্ধিবৃত্তিক বুনিয়াদ হারিয়ে ফেলার কারণে জুলুম, নির্যাতন, স্বৈরাচার ও অধীনতা উম্মাহকে গ্রাস করে ফেলে। অথচ এ বুদ্ধিবৃত্তিক বুনিয়াদ থেকে উম্মাহর উন্নয়ন, তার বিকল্প পথ– ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য সমাধান বের করার কথা ছিল।

একদিকে উম্মাহ অনুকরণমূলক ও স্থবির চিন্তাধারায় আবদ্ধ ছিল, অপরদিকে স্বেচ্ছাচার এবং রাজনৈতিক স্বৈরাচার দ্বারা ছিল আক্রান্ত। এটিই হচ্ছে উম্মাহর ইতিহাসের প্রায় নিভুল চিত্র। মোঙ্গল আগ্রাসন ও ক্রুসেডের পরে উম্মাহ যে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের শিকারে পরিণত হলো এবং আজ পর্যন্ত বিজাতীয় অধীনতার পাশে আবদ্ধ রয়েছে এটিই তার কারণ। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে উম্মাহর পতন, তার প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যর্থতা এবং ইতিহাস নির্ভর অনুকরণের সীমার বাইরে চিন্তা করার অক্ষমতা আরো বড় ধরনের

www.pathagar.com

বিপদের মুখে পরিচালিত করেছে। সে বিপদ হলো, অনুকরণমূলক বিজাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি বা উদ্যমের মধ্যেই উম্মাহর সমস্যাগুলোর সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে এই উপলব্ধি। এই অনুকরণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি বা উদ্যমের ফলে উম্মাহর পতন ত্বরান্বিত হলো এবং উম্মাহ আগের চাইতেও দুর্বল হয়ে পড়লো। এই পথ অনুসরণ করে উম্মাহ অচিরেই পণ্ডিতদের ভাষায় সভ্যতার ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান ব্যবধানের (অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত) আবর্তে পড়ে গেল। এ ব্যবধান দেখা দিল উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে অথবা অগ্রসর ও শিল্পোন্নত দেশসমূহ ও অধিকাংশ মুসলিম অধ্যুষিত তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোর মধ্যে। এ দৃষ্টিভঙ্গির ব্যর্থতা থেকে আমরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে শিক্ষা পাই তা হলো, অতীতের স্বপ্ন অস্বাভাবিক এবং জীবন, স্থান, কাল, চিন্তাধারা ও ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণকারী গতি আইনের পরিপন্থী। তাছাড়া সংস্কারের ক্ষেত্রে এ ধরনের পশ্চাৎমুখীতা, পতন ও বিজাতীয় চিন্ত াধারা সমৃদ্ধ আগ্রাসনের মুখে পরাজয়বরণ করে থাকে। উম্মাহকে অবশ্যই চলার জন্য একটি নতুন পথ খুঁজে নিতে হবে এবং বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে সংস্কারের পথ ও পন্থা খুঁজে বের করার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এ নতুন পথটি কি? এ নতুন দৃষ্টিভঙ্গিটি কি? এর অন্তর্নিহিত মর্মার্থ কি? এর বৈশিষ্ট্যগুলো কি? অন্যেরা যেখানে ব্যর্থ হয়েছে সেখানে তারা সফল হবে এবং এ দৃষ্টিভঙ্গি যে পূর্বের তুলনায় উত্তম হবে তা আমরা কি করে বুঝবো?

এসব প্রশ্নের জবাব দিতে হলে প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে– এটি কীভাবে শুরু হয়? কখন, কী রূপে এবং কেন এ পতনের সূচনা হয়? পরিস্থিতির অবনতি কীভাবে ঘটে? ব্যাধি কি আমরা যদি তা বুঝতে পারি, এর শুরু কখন হলো তা আমাদের জানা থাকে এবং তার লক্ষণ কি তা আমরা নির্ণয় করতে পারি এবং ইসলামের দেহ ও ইতিহাসে এ রোগের সংক্রমণ আমরা বুঝতে পারি তাহলে এটি তার রোগমুক্তির অত্যাবশ্যকীয় পূর্বশর্ত হিসেবে কাজ করবে। এ ধরনের উপলব্ধির ভিত্তিতে সংস্কারের জন্য যে ধরনের প্রচেষ্টা প্রয়োজন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা নির্ধারণ করতে হবে।

সমসাময়িক ইসলামী আসালা দৃষ্টিভঙ্গি

নাম থেকে বোঝা যায় যে, এটি ইসলামের লক্ষ্য, বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং চিন্তাধারার ভিত্তিতে গঠিত একটি দৃষ্টিভঙ্গি। উম্মাহর যে উন্নতি, ইতিবাচক কর্মকান্ড এবং সংস্কার আমরা চাচ্ছি, সে উম্মাহর বিশ্বাস, মূল্যবোধ, মননশীলতা এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রকৃতির দিক থেকে ইসলামী উম্মাহর মননশীলতা, লুক্কায়িত শক্তি এবং অভিসন্ধির মূল সত্যটাকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করলে উম্মাহকে উদ্বুদ্ধ করার আর কোনো উপায় থাকে না।

স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমস্যা সমাধানের মূল সৌরভ দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রকাশ করাটাই এখানে যথেষ্ট নয়। কারণ, ইসলাম অনুরকণীয় ইতিহাস নির্ভর দৃষ্টিভঙ্গী এবং সমসাময়িক ইসলামী আসালা দৃষ্টিভঙ্গীরই একটি অংশ। সুতরাং

www.pathagar.com

শেষোক্তটির বৈশিষ্ট্য সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা অত্যাবশ্যক। সমসাময়িক বিষয়সমূহ এবং প্রস্তাবিত ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীর ঐকতানের মধ্যে এ বৈশিষ্ট্যগুলো তালাশ করা যেতে পারে। এর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, উম্মাহর সমসাময়িক অবস্থা এবং তার বিষয়গুলোর উপর প্রভাব বিস্তারকারী ইসলামী বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং ঝোঁক প্রবণতা থেকে সমাধান বের হয়ে আসবে। উপলব্ধি করতে হবে যে, পূর্বদিনের ইসলামী ঐতিহ্য ও তার প্রাথমিক যুগের অভিজ্ঞতার আলোকে স্থান ও কালের চাহিদা কি এবং অপরদিকে মানবজীবনে এর গুণগত ও পরিমাণগত পরিবর্তনের তাৎপর্য কি? এ দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অনুকরণমূলক সমাধানের পার্থক্য রয়েছে, কারণ সমসাময়িক ইসলামী আসালা ভিত্তিক সমাধানটি উম্মাহর প্রয়োজন বা চাহিদার একটি ঘোষণা। ইসলামের সামনে যে চ্যালেঞ্জ রয়েছে ইসলামী মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও লক্ষ্যের ভিত্তিতে এটি তার জবাব। এ পথেই উম্মাহ ও তার সম্ভাবনাময় শক্তিগুলো নেতৃত্বের অবস্থানে থাকতে পারে এবং তার মূল্যবোধ ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের মাধ্যমে মানবজাতির ভবিষ্যতকে সর্বোত্তমভাবে পরিচালনা করতে পারে।

সমসাময়িক আসালা সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি এবং উম্মাহর ইসলামী চরিত্রের গোড়া থেকে সমসাময়িক পরিস্থিতি অনুধাবনের অর্থ হচ্ছে এর ব্যাপকতা দিয়ে শুরু করা। ভিন্নভাবে বলতে গেলে এটি হচ্ছে স্থান ও কালের মাত্রা ও পরিধিসহ ইসলামের প্রাথমিক যুগের বিভিন্ন তত্ত্ব ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে উপলব্ধি। এ জন্যে ইসলামের লক্ষ্য ও তার মহান উদ্দেশ্য এবং এর মধ্যকার সঠিক সম্পর্ককেও পুরোপুরি বুঝতে হবে। অন্যান্য সভ্যতার মোকাবিলায় উম্মাহ যাতে একটি নেতৃত্বের অবস্থানে পৌঁছতে পারে সেই লক্ষ্যে এটি সমসাময়িক জীবন ও সমাজে উম্মাহর সকল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

সমসাময়িক আসালা বলতে যোগ্যতা, কারিগরী দক্ষতা এবং সুষ্ঠু প্রণালীকে বোঝায়। এটি প্রাকৃতিক আইন ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি প্রাতিষ্ঠানিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিকে বোঝায়। এখানে যে অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে এ ইসলামী চিন্তাধারা, নীতিমালা, উদ্দেশ্য, মূলবোধ এবং শিক্ষার প্রেক্ষাপটে বাস্তব বিষয়াদি, সমস্যা এবং সম্ভাবনা থেকে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করা হয়েছে তাই। প্রাতিষ্ঠানিক ও বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদেরকে পশুচারী (Pastoral), কৃষি এবং সাধারণ ব্যবসা নির্ভর সমাজ (Trading Society) থেকে আমাদেরকে কাঙ্ক্ষিত বুদ্ধিবৃত্তিক ও সভ্যতাধর্মী উত্তরণ ঘটানো সম্ভব হবে। কাঙ্ক্ষিত এ বিশ্বের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার সম্ভাবনা, দক্ষতা, সম্পদ ও উৎপাদন এবং ব্যক্তি, গ্রুপ, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পদ্ধতির চাহিদা এবং দায়িত্বের মধ্যে পরিবর্তন সাধন। এভাবে বিশ্ব যেসব চ্যালেঞ্জ, সংকট ও সুযোগ-সুবিধা থেকে উপকৃত হচ্ছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তার মোকাবিলা করা সম্ভব হবে।

সুতরাং ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গির চিন্তা অথবা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর আন্দোলন ও সামাজিক কর্মকান্ড অনুকরণের বিষয়কে এড়িয়ে যাবার কোনো উপায় নেই। সর্বোপরি এর অর্থ

www.pathagar.com

হচ্ছে শরিয়ার উচ্চতর ও সাধারণ নীতি, মূল্যবোধ এবং মৌলিক শিক্ষা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ বোধ বা উপলব্ধি। এগুলোই হবে সমসাময়িক ইসলামী সামাজিক চিন্তাধারা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের ব্যবস্থাপনা এবং ইসলামী আন্দোলনের দিক-নির্দেশক বিধিবিধানের গোড়ার কথা। এসব লক্ষ্য অর্জিত হলে ইনসাফ, সংহতি, ভ্রাতৃত্ব এবং ইসলামের কাঙ্ক্ষিত সব মূল্যবোধই ইসলামী সমাজের উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়াবে।

সমসাময়িক ইসলামী আসালার লক্ষ্য অর্জনের জন্য ইসলামী বিষয়ে গবেষণার পদ্ধতিকে অবশ্যই পুনর্গঠন করতে হবে, যাতে ইসলাম এবং তার উচ্চতর লক্ষ্যসমূহ, মূল্যবোধ, সমাজ ও সভ্যতা বিষয়ক ধারণা বা মতবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত বাস্তব অবস্থা থেকে আহরিত অভিজ্ঞতা নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। এর অন্য অপরিহার্য হলো সকল পর্যায়ে মূল্যবোধের ভিত্তিতে গড়ে ওঠার গুরুত্ব আরোপকারী ইসলামী শিক্ষা এবং বাস্তব ক্ষেত্রে গুরুত্ব দানকারী কারিগরি শিক্ষা, শিক্ষাব্যবস্থার এ দুটি শাখার পুনঃমেরুকরণ। শিক্ষার সকল শাখায় বিশেষ করে মানবিক ও সমাজ বিজ্ঞানে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী ও দর্শনের উপর অবশ্যই মনোযোগ দিতে হবে।

চূড়ান্ত বিশ্লেষণে সমসাময়িক ইসলামী আসালার বিভিন্ন অগ্রাধিকারসমূহের পুনর্বিন্যাস এবং পদ্ধতি ও চিন্তাধারাকে ঢেলে সাজাতে হবে যাতে সুষ্ঠু ইসলামী শিক্ষার পদ্ধতি খুঁজে পাওয়া যায়। অধিকন্তু বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, সমাজ ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকেও পুনর্গঠিত করতে হবে যাতে পরিপূরক উদ্যোগ ও সুষ্ঠু অগ্রগতি সম্পন্ন সমাজকে ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে বিনির্মাণের পথে পরিচালনা করা যায়। সমসাময়িক ইসলামী আসালার দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সভ্যতার নেতৃত্বদানে এবং সংস্কারে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে চাইলে তাতে অবশ্যই দু'টি বিষয় থাকতে হবে। সভ্যতার পরিবর্তনের ইতিহাসনির্ভর এ দু'টি বিষয়ের একটি হচ্ছে ইতিবাচক ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রেরণা এবং অপরটি হচ্ছে ফলপ্রসূ চিন্তাধারার ঐতিহ্যমন্ডিত বৈশিষ্ট্যের অবস্থান।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে নিখাদ ইসলামী আকিদা এবং ইসলামী চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠত্বের মাধ্যমে এমনটি ঘটেছিল। এ দু'য়ের মিলনে মুসলমানদের প্রথম প্রজন্মের অনেক কিছু অর্জনের সৌভাগ্য হলো। পৌত্তলিক আরবদের বাণিজ্য পথ বন্ধ করে দেয়া, খন্দকের যুদ্ধে ও হোদায়বিয়ায় সামরিক ও কূটনৈতিক প্রতিভার প্রমাণ, মক্কা বিজয়, ইয়ারমুকে বাইজেন্টাইনদের সাথে ভয়াবহ যুদ্ধের আগে সিরীয় মরুভূমি পাড়ি দেয়ার অত্যাশ্চর্য ঘটনা, বিভিন্ন দিওয়ান রক্ষণাবেক্ষণে প্রদর্শিত প্রতিভা, প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন, বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠা, স্কুল ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে মসজিদ নির্মাণ এবং জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক মতবাদের প্রচার ও প্রসার। এসব কিছুই উম্মাহর ইতিহাসের সেই প্রাথমিক যুগে তার সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যখন এ সভ্যতা দুর্নীতিগ্রস্ত, পতনোন্মুখ সভ্যতাসমূহ ও বর্বর বেদুইন জাতি দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল।

www.pathagar.com

ইউরোপীয় রেনেসাঁর ক্ষেত্রেও এটিই সত্যি ছিল। কারণ এ রেনেসাঁর চালিকা শক্তি ছিল প্রটেস্ট্যান্ট সংস্কার আন্দোলনের নতুন ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি। এ দৃষ্টিভঙ্গির উদ্দেশ্য ছিল মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও অজ্ঞতা নির্মূলের লক্ষ্যে একটি কার্যকর খ্রিস্টিয় বিশ্ব দর্শনের উন্মেষ ঘটানো। এ দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ইউরোপীয় চিন্তাধারা সংস্কারের সম্মিলনে ইউরোপীয় রেনেসাঁ প্রচন্ড শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। অথচ এর আগ পর্যন্ত ইউরোপীয় চিন্তাধারা বাইবেলীয় সূত্র থেকে গৃহীত বিভিন্ন কাল্পনিক উপমার আক্ষরিক ব্যাখ্যায় সীমাবদ্ধ ছিল। ইসলামের প্রাথমিক যুগে একটি গঠনমূলক ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে কার্যকর ও উন্নত চিন্তাধারার সংমিশ্রণের ফলে যা ঘটেছিল ইউরোপেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটে এবং অনুরূপভাবে একটি নতুন সভ্যতা অর্থাৎ রেনেসাঁ যুক্ত ইউরোপের অভ্যুদয় ঘটে। সমসাময়িক আসালা দৃষ্টিভঙ্গিও এ দু'টি উপাদানে সমৃদ্ধ।

এভাবে দেখা যায় সুষ্ঠু পদ্ধতি ছাড়া ধর্মীয় সংস্কারের উপর গুরুত্ব দেয়া হলে তাতে সমসাময়িক ইসলামী আন্দোলনের জন্যে কোনো সুফল বয়ে আনবে না। এ ছাড়া পাশ্চাত্যমুখী ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা সুষ্ঠু চিন্তাধারা ও তার চমৎকার সাফল্যের বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও তারাও সফল হবে না। বরং খিলাফতের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমন্ডল সৃষ্টি এবং একটি নতুন সভ্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য এ দু'টি শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী এ দু'টি শিবিরকে ঐক্যবদ্ধ করার অর্থ হচ্ছে, যুক্তি ও ওহীর মধ্যকার যোগসূত্র পুনরুদ্ধার অথবা ওহীর উপলব্ধি ও এর মর্মার্থ অনুধাবন এবং ওহীর লক্ষ্যাবলীর ব্যাপক ও বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি এবং তার জীবন ও সভ্যতার মূল্যবোধ দিয়ে মনকে পরিচালনার যোগসূত্র পুনরুদ্ধার করা। এভাবে সংস্কারের অন্বেষায় এ দু'টি মহলকে এক সাথে করে দেয়া, পদ্ধতি ও রীতির বিবেচনায় এটি একটি মননশীল প্রক্রিয়ায়। অন্যকথায় বর্তমান সময়ে উম্মাহর সামনে রয়েছে চিন্তাধারার সংকট। এটি স্বাভাবিক যে, সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির দিকে আহ্বান, সে দৃষ্টিভঙ্গি কি এবং তাতে অগ্রাধিকার লাভের মতো বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা কি হওয়া উচিত এবং এগুলো বাস্তবায়নের দায়িত্ব উম্মাহর বুদ্ধিজীবী, লেখক এবং সংশ্লিষ্ট সামাজিক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের। সংস্কারের চিত্রটি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা, উম্মাহকে সমস্যা সম্পর্কে অবহিত রাখা এবং সংস্কারের বীজ বপনের কাজ করার জন্য এদের অবশ্যই প্রচেষ্টা চালাতে হবে যাতে সংস্কারের চারাগুলো বেড়ে ওঠে এবং তাতে ফল ধরে। কখনো কখনো এ কাজটি বড়ই আঁকাবাঁকা ও সর্পিল মনে হতে পারে। মানুষ কখনো শুধু আয়াসের মধ্যেই পথ চলার পন্থা খুঁজে নেয়নি। অপর পক্ষে দেখা যায় মানুষ প্রথমে যেসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ঘর থেকে বেরিয়েছিল তা অর্জন করার উপযোগী পথই তাকে বেছে নিতে হয়েছে।

www.pathagar.com

সংকটের ঐতিহাসিক উৎসমূল

রাজনৈতিক ভিত্তির পরিবর্তন :

বেদুঈন, অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ এবং খিলাফতের পতন :

উপরের বিশ্লেষণ থেকে এ কথা সুস্পষ্ট যে, উম্মাহকে দুর্বলতা, দলাদলি পশ্চাৎমুখী দৃষ্টিভঙ্গি এবং সভ্যতাহীনতার সংকট কাটিয়ে উঠতে হলে তাকে অবশ্যই ইসলামী সমাধান প্রয়োগ করতে হবে। নিজেদেরকে সংকট থেকে মুক্ত করা এবং নিজেদেরকে যখন পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মুখোমুখি দেখতে পেল এবং তার হাতে পরাজয়ের তিক্ততার স্বাদ গ্রহণ করতে বাধ্য হলো তখন উম্মাহর সংস্কার প্রচেষ্টা শুরু হলো। এ সম্পর্কে বইয়ের প্রথমে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রথমবারের মতো উম্মাহ চিহ্নিত ধ্বংসাত্মক শত্রুর সম্মুখীন হলো এবং পাশ্চাত্য প্রভাবের চ্যালেঞ্জ থেকে মুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তার প্রচেষ্টা কীভাবে বারবার ব্যর্থ হয়েছে, তার পর্যালোচনা করা হয়েছে।

আমাদের আগের বিশ্লেষণ এবং এখন চারদিকে আমরা যা দেখছি তা থেকে আমরা সমসাময়িক ইসলামী আলোকে উম্মাহকে তার বর্তমান দুঃখ বেদনা থেকে নিষ্কৃতিদান এবং যে দুষ্টগ্রহের আবর্তে সে ঘুরপাক খাচ্ছে তা থেকে মুক্ত করতে হবে। সুতরাং সংকটের প্রকৃতি এবং এর উৎসকে বুঝার বিষয়টি আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু এটি করতে পারলেই সংকটের মূল বিন্দুকে চিহ্নিত করা যাবে। এখন পর্যন্ত সংকটের মেজাজ সম্পর্কে আমাদের এ অজ্ঞতাই উম্মাহর সামগ্রিক কর্মকান্ডকে সভ্যতা হিসেবে মূল্যায়নে বাধা দিয়েছে এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এ বাধা প্রগতির পথ ধরে আমাদের এগুতে দেয়নি। এ রকম পরিস্থিতিতে আমাদের অবশ্যই এর গভীরতা অনুধাবন ও এর বাহুল্যকে বর্জন করতে হবে (আমাদের সমৃদ্ধির পথে অন্তরায় থাকা সত্ত্বেও) এবং ঐ সকল জিনিস বর্জন করতে হবে যেগুলোকে আমরা বৈধতার আবরণে পবিত্র বলে গণ্য করি, যেগুলোতে আমাদের চিত্তচাঞ্চল্য আছে সেগুলোকে উপেক্ষা করার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। এটি নিঃসন্দেহ যে, আমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জনপ্রিয় রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রামের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি, যদিও এ সকল সংগ্রামের মূল প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা স্পষ্ট কোনো ধারণা লাভ করতে পারিনি। অধিকন্তু আমরা যেসব বিষয়কে পবিত্র জ্ঞান মনে করি, সেগুলো সম্পর্কে সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও আমরা সেসবের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারি না; এসব প্রভাব আমাদের হৃদয় ও আত্মাকে নিঃসাড় করে ফেলে এবং কোনো বিষয়ের গভীর গবেষণা থেকে বিরত রাখে এবং গভীরভাবে চিন্তা করা থেকে বিরত রাখে; সত্যিকার সাফল্য অর্জনে সহায়তা করতে পারে, এমন বুদ্ধি ও মনন দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা থেকেও বিরত রাখে।

www.pathagar.com

সুতরাং বর্তমান অবস্থা এবং সুদীর্ঘ ইতিহাসের প্রতিটি দিক বিবেচনা করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। মোটকথা পরিস্থিতিকে অবশ্যই ভালভাবে অনুধাবন করতে হবে এবং সত্যিকার কোন্‌টি পবিত্র এবং কোন্‌টি নয়, সেই পার্থক্যের সীমারেখা অপরের কাঁধে চাপানোর ব্যর্থ চেষ্টা এড়িয়ে চলতে হবে।

উম্মাহর বিদ্যমান সংকটের প্রথম চিহ্ন ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ধ্বংসাত্মক গৃহযুদ্ধ আকারের চেতনা। এসব যুদ্ধে তৃতীয় খলিফা উসমান (রা) এবং তাঁর উত্তরাধিকারী আলী ইবনে আবু তালিব শহীদ হন। পরিণামে খেলাফতের অবসান ঘটে এবং উমাইয়া বংশের অসৎচারিত্রকতা, স্বেচ্ছাচার, গোত্রবাদ এ স্থান দখল করে।

যে অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের কারণে খেলাফতের পতন ঘটে তা উম্মাহর ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত এ সম্বন্ধে সঠিকভাবে উপলব্ধি না করি, এর পেছনে কী কারণ ছিল, তা আবিষ্কার করতে না পারি এবং তা থেকে কি ফলাফল অর্জিত হলো তা হৃদয়ঙ্গম করতে না পারি, ততক্ষণ পর্যন্ত এটিকে আমাদের উপেক্ষা করা উচিত নয়। এ সম্পর্কিত তথ্য আমাদের প্রয়োজন, এ সময়কালের ঘটনাবলী এমনকি আজকের দিনেও আমাদের আচার-আচরণ ও মনোভঙ্গিকে প্রভাবিত করে চলেছে অব্যাহত গতিতে। এ অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল খিলাফত নেতৃত্ব। রাজনৈতিক ক্ষমতার মসনদে নীরবে, নিঃশব্দে এক অপরিহার্য পরিবর্তন ঘটে গেল। কারণ সাহাবায়েকেরাম (রা) ছিলেন রাসূল করিম (সা) প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের ক্ষমতার মূল ভিত্তির জন্য উৎসর্গীকৃত বাহিনী ও শাসকশ্রেণী। গুণগত মান, ঝুঁকিগ্রহণ, প্রশিক্ষণ, প্রজ্ঞা এবং নৈতিকতার ক্ষেত্রেও তারা খিলাফতের জন্য একই কাজ করেছিলেন।

তদানিন্তন পারস্য এবং পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের চ্যালেঞ্জসহ সে সময় যেসব ঘটনা ঘটে সে সময় পর্যন্ত গোত্র কেন্দ্রিকতা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন আরব বেদুঈন গোত্রগুলোর জন্য মুসলিম বাহিনীতে যোগদানের পথ খোলা ছিল। মুসলিম বাহিনীতে বেদুঈনদের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রবীণ সাহাবাদের সংখ্যা হ্রাস পেতে লাগল, কারণ এদের অনেকেই প্রথম দিকে বিজয় অভিযানকাল শাহাদাত বরণ করেছিলেন। এর ফলে বেদুঈনদের পক্ষে ইসলামের মৌল শিক্ষা ছাড়াও তাদের সব কুসংস্কার এবং মরুভূমির গোত্রগত আসক্তি ও ঝোঁকপ্রবণতা সংরক্ষণ, লালনপালন সম্ভবপর হয়েছিল। অথচ রাসূল (সা) তাঁর যত্ন ও সাধনার মধ্য দিয়ে বেদুঈনদের মন থেকে এসব কুসংস্কার, আসক্তি ও ঝোঁকপ্রবণতা দূর করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এভাবে বেদুঈনদের উত্থানের ফলে খিলাফতের রাজনৈতিক বুনিয়াদগুলোতে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। নব্য বাহিনী অথবা নয়া রাজনীতির জন্য বিশ্বনবী (সা)-এর প্রচারিত ইসলামী মূল্যবোধ, আদর্শ, লক্ষ্য ভালোমন্দ বিচারের মাপকাঠিকে এখন আর চালিকাশক্তি হিসেবে গণ্য করা হলো না। এর অনিবার্য ফল হলো অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন গোত্রের শক্তি-নির্ভর গোত্রকেন্দ্রিক স্বৈরাচারী উমাইয়া রাজবংশ।

www.pathagar.com

এটিও অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল যে, মক্কা ও মদিনায় ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব এক শতাব্দীর বেশি স্থায়ী হতো না এবং বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ বেদুঈনদের বিরুদ্ধে রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধে হোসেন বিন আলী, আবদুল্লাহ্ বিন যুবাইর, মুহাম্মদ নফক জাকিয়াহ, যায়েদ বিন আলী প্রমুখের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যেত। সময় অতিক্রান্ত হতে থাকল এবং বিপুল সংখ্যক পারসিক, বাইজান্টাইনীয়, ভারতীয়, তুর্কী, আফ্রিকান এবং অন্যান্য জাতি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করলো বটে, কিন্তু পুরোনো ধ্যানধারণা, কুসংস্কার এবং প্রাক-ইসলামিক মতবাদ বিসর্জন দেয়ার মতো ইসলামী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভের কল্যাণ থেকে তারা বঞ্চিত ছিল এবং হারিয়ে যাওয়া উপাদানটি শিগ্‌গিরই উম্মাহর অনেক সদস্যকে ইসলামী খাঁটি আচার অনুষ্ঠান, ধ্যানধারণা ও পদ্ধতি থেকে বিচ্যুত করে ফেলল। সংক্ষেপে বলতে গেলে যখন বেদুঈন গোত্রীয় সংখ্যাগরিষ্ঠরা ক্ষমতা দখল করল। রাজনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিবর্তন এলো এবং উম্মাহ এমন এক নেতৃত্বকে রাজনীতিতে বরণ করে নিতে বাধ্য হলো যা ছিল ইসলাম পূর্ব এবং ইসলামী পদ্ধতির রাজনৈতিক (Political power base) নেতৃত্বের একটা জগাখিচুড়ি সংস্করণ।

রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃত্বে ভাঙন

সেনাবাহিনীতে বেদুঈনদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ফলে খেলাফতের পতন এবং উমাইয়া রাজবংশের ক্ষমতা দখলকে পরিবর্তন ও বিচ্যুতির প্রথম কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়। এ প্রকাশ্য পালাবদলের ফলে যে সূক্ষ্ম মতবিরোধগুলো মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে সেগুলো নিশ্চিত্যভাবে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ। এ সময় সমাজের বিভিন্ন স্তরে রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় বুদ্ধিজীবী নেতৃত্বের মধ্যে একটি ফাটল সৃষ্টি হয়। যে অবিশ্বাস্য ধরনের শক্তি ইসলামের জীবনী শক্তি থেকে ইসলাম সঞ্চয় করেছিল, সেই শক্তি ক্ষয়ে এ ভাঙন অন্যতম ক্ষতিকারক উপাদানে পরিণত হয়েছিল। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় উপজাতিগত ও স্বৈরাচারী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পর হেজাজে ধর্মীয় বুদ্ধিজীবী নেতৃবৃন্দ এ পরিবর্তনের বাস্তবতা এবং কারণসমূহকে মেনে নিতে অস্বীকার করলো। বরং এর পরিবর্তে তারা গোঁড়া মতবাদ ও চিন্তাধারার ভিত্তিতে কোরাইশদের উমাইয়া শাখাসহ সকল উপজাতীয় শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুললো।

শতাব্দীব্যাপী গৃহযুদ্ধ, সংকীর্ণ জাতিগত ও গোত্রগত চিন্তাধারা, সংস্কৃতির ধারক-বাহক জনগণের সমর্থন লাভে ব্যর্থ ধর্মীয় বুদ্ধিজীবীদের শক্তি যখন নিঃশেষ করে দিল, তখন এদের অনুসারীরা পশ্চাদপসারণ করে কোনো উল্লেখযোগ্য বিরোধিতা সৃষ্টির প্রচেষ্টা না চালিয়ে অনেক দূর থেকে রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে প্রার্থনা করে। নতুন রাজনৈতিক নেতৃত্বের কৌশল ছিল বেশি বেশি চাপ সৃষ্টি করে ধর্মীয় বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে ধারণ করা এবং তাদের অনুসারীদের নিজেদের ইচ্ছামতো কাজ করতে বাধ্য করা। এভাবেই উলামাদের ভাগ্যে, বিশেষ করে যারা বিভিন্ন মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাদের সামনে

www.pathagar.com

নেমে আসে নির্যাতন এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। ইমাম আবু হানিফাকে (মৃত্যু ১৫০ হিঃ, ৭৬৭ খ্রি) ইসলামের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ নয় এমন একটি শাসনামলে বিচারকের পদ গ্রহণে অস্বীকার করায় কারাগারে নিক্ষিপ্ত ও মৃত্যুবরণ করতে হয়। যখন ইমাম মালেক (মৃত্যু ১১৭৫ হিঃ, ৭৯৫ খ্রি) জোরজবরদস্তিভাবে দেয়া তালাকের অবৈধতার পক্ষে তাঁর মতামত ব্যক্ত করলেন, তখন তাঁকে এমন নির্দয়ভাবে প্রহার করা হয় যে তার হস্ত মুবারক পঙ্গু হয়ে যায়। ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকেও (মৃত্যু ২৪১ হিঃ, ৮৫৫ খ্রি) অনুরূপভাবে ক্ষমতাসীনদের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষের বিরোধীতা করার কারণে অনেক জুলুম ও নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। ইমাম আল শাফেয়ীকে (মৃত্যু ২০৪ হিঃ, ৮২৭ খ্রি) শৃঙ্খলিত অবস্থায় ইয়েমেন থেকে বাগদাদে নিয়ে আসা হলে তিনি সেখান থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। অবশেষে তাকে রাজধানী থেকে বহুদূরে মিসরে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল। উম্মাহর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বুদ্ধিজীবী নেতৃত্বের মধ্যে সৃষ্ট ভাঙন, মুসলিম শক্তির পতনের সূচনা, মুসলিম সমাজ দেহে ফাটল এবং ইসলামী চিন্তাধারা ও প্রতিষ্ঠানসমূহে সংকটের প্রতীক হয়ে দাঁড়ালো। এসব উপাদানই দুর্নীতি ও পতনের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করার সহায়ক হয়েছে। ক্রমে ক্রমে ইসলাম তার প্রাণ শক্তিকে আর ধরে রাখতে পারেনি। এরই ফলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তার আধ্যাত্মিক শিক্ষার কিছু ছিটেফোঁটাই শুধু অবশিষ্ট রইল। তার গৌরবোজ্জ্বল সভ্যতার অবশিষ্ট সব কিছু ধ্বংস হয়ে গেল।

ধর্মীয় বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের এ ফাটলই ছিল উম্মাহর দেহে সকল রোগব্যাধির মূল কারণ। দেখা গেল পরবর্তীকালে এসব রোগব্যাধিই চারিদিক থেকে মুসলিম জাতিকে আক্রমণ করে বসলো। এই তিক্ত ভাঙনই বুদ্ধিজীবী নেতৃত্বকে উম্মাহর সকল বাস্তব ও সামাজিক দায়িত্ব থেকে অপসারণ করলো। অপরদিকে মুসলিম মনের অসাড়তা বা তার বোধশক্তিহীনতার পেছনে এটাই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ। আক্ষরিক অর্থেই মুসলিমগণ মসজিদের চারদেয়ালের মাঝে আবদ্ধ হয়ে পড়ল। চারদেয়ালের মাঝে আবদ্ধ থেকে তাদের জন্য একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ালো প্রাথমিকভাবে তাত্ত্বিক মতবাদের কিছু মোটা বই পুস্তক অধ্যয়ন, যেগুলো ছিল কুরআনের আয়াত, রাসূল (সা)-এর সুন্নাহর বর্ণনামূলক ও শব্দার্থ ভিত্তিক ব্যাখ্যায় ভরপুর। বুদ্ধিজীবী নেতৃত্বের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং তাদের সঙ্গে নিজেদের কর্মকান্ডের যৌক্তিকতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে কুরআন ও সুন্নাহর মূল বক্তব্য যাতে বিকৃত করতে না পারে এবং তার অপব্যাখ্যা দিতে না পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে তাদের প্রতিহত করা। এর ফল দাঁড়িয়েছে বস্তুগত বা মননের দিক থেকে উম্মাহ অন্যান্য সভ্যতার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারছে না। বাস্তবে তার অস্তিত্বই এখন সমসাময়িক পাশ্চাত্য সভ্যতা হুমকির সম্মুখীন।

www.pathagar.com

এ দুঃখজনক পরিস্থিতি মুসলিম জাতিকে এমন এক পথে নিয়ে গেল যার ফলে ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। কথাটি বহুবার বলা হলেও বাস্তবে ইজতিহাদের এমন কোনো দরজা ছিল না যা বন্ধ করার প্রয়োজন ছিল। বরং দরজা বন্ধ করার কথাটি ব্যবহৃত হয়েছিল ইসলামের প্রতি রাজনৈতিক নেতাদের অঙ্গীকারহীনতার কারণে। চিন্তার ক্ষেত্রে যে বন্ধ্যাত্ব দেখা দিয়েছিল রাজনৈতিক কারণেই তা হয়েছিল। কারণ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাদের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করার জন্য এবং সবকিছুই তার ও সাঙ্গোপাঙ্গদের স্বার্থে নিয়োজিত করার বিষয়টিকে ইসলামের প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকারের উপর প্রাধান্য দিয়েছিলেন। চারিদিকে নিরন্তর যেসব পরিবর্তন হচ্ছিল এসব কিছুই তা থেকে আলেম সমাজকে দূরে সরিয়ে নিয়ে মসজিদের আরো নিভৃত কোণে ঠেলে দিলো। দ্বিতীয়ত, এই ভাঙনের ফলে রাজনৈতিক নেতৃত্ব একটি উপযোগী বুদ্ধিবৃত্তিক বুনিয়াদ থেকে বঞ্চিত হলো। এ ধরনের বুনিয়াদ তাদেরকে পরিবর্তত পরিস্থিতিতে চিন্তাধারা, নীতিনির্ধারণী নির্দেশনা এবং কর্ম উপযোগী বিকল্প তাদের সামনে উপস্থিত করতে পারতো। কাজেই এটি আমাদের জন্য কোনো বিস্ময়কর ব্যাপার নয় যে, সাধারণভাবে বলতে গেলে ইসলামী বিশ্বে স্বৈরাচারী ও একনায়কত্ববাদী নেতৃত্ব চলে আসছে। মুসলিম বিশ্বে শূরার সুযোগ খুব কমই ছিল। এ শূরা হচ্ছে কুরআনের ভাষায় উম্মাহ পরিচালনায় জনগণের অংশীদারিত্ব। অবস্থা এ হয়ে থাকলে বিশ্বসভ্যতার দৃশ্যপট থেকে তার অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চিন্তাধারা এবং প্রতিষ্ঠানসহ উম্মাহ যেভাবে নিষ্প্রভ এবং বিলিন হয়ে গিয়েছে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। খেলাফতের পতনের পর উম্মাহর রাজনৈতিক কাঠামোতে যে উপদলীয় কোন্দল ও বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয় তা অনুধাবন করতে নিশ্চয়ই পাঠকের অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে সভ্যতা উদ্ভূত প্রাণশক্তির যে বহিঃপ্রকাশ দেখা গেছে তার সাথে পরবর্তীতে সে প্রাণশক্তির ব্যবধান অবশ্যই পাঠকের বুঝতে হবে। এ সম্পদ ও সাম্রাজ্যের অবশ্যম্ভাবী অর্জন অংশত সম্ভব হয়েছিল পার্শ্ববর্তী পারসিক ও বাইজেন্টিয় সাম্রাজ্যের অবশ্যম্ভাবী পতনের ফলে। মুসলিম উম্মাহর মধ্যে যে ক্ষয় শুরু হয়েছিল, তা সত্ত্বেও প্রাণশক্তির এ বহিঃপ্রকাশ দেখা গিয়েছিল। কারণ ইতোপূর্বে প্রাণশক্তি হারানোর যে কথা আমরা উল্লেখ করেছি তা ছিল একটি আপেক্ষিক ক্ষতি। বাস্তবে উম্মাহর মধ্যে তখনও বিরাট প্রাণশক্তি ছিল। সুতরাং এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, উম্মাহর শক্তি যে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল তা বাহ্যিক অবস্থা থেকে আঁচ করা না গেলেও পাঠকদের এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়।

www.pathagar.com

সমস্যার মূল এবং উম্মাহর ভবিষ্যৎ

চিন্তার সংকট, বিশ্বাসের নয়

উম্মাহর বিভিন্ন সমস্যার বিজাতীয় ও ঐতিহ্যানুগ সমাধানের জন্য বারবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মুসলিম জাতির মধ্যে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির উপলব্ধি সুস্পষ্ট হয়নি। এটি সম্ভবত বিশ্বাস ও চিন্তাধারা সম্পর্কে সাধারণ ভুল ধারণা পোষণ করার কারণেই হয়নি। অর্থাৎ বিশ্বাস ও চিন্তাধারাকে এক এবং একই বিষয় রূপে, নিরঙ্কুশ ও চিরকাল পবিত্র বলে মনে করা হয়েছে। এটি একটি ভুল ধারণা। বাস্তবে এ ভুল ধারণা আমাদের দুশমনেরা সংস্কৃতি, শিক্ষা ও প্রচারমাধ্যম নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে। বিশেষ করে ইসলাম ও মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কে প্রাচ্যবাদীদের অধ্যয়ন আমাদের বিভ্রান্তির ক্ষেত্রকে আরো স্ফীত করেছে। সমসাময়িক ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে সুস্পষ্টতার অভাবের পেছনের কারণ ছিল মনস্তাত্ত্বিক বাধাসমূহ। এর ফলে মুসলিম মন এখন গৃহপালিত পোষা প্রাণীর মতো নিস্তেজ ও নির্বীর্য। অন্যকথায় তার বুদ্ধিবৃত্তিক উত্তরাধিকার অথবা তার জ্ঞান যাকে আমরা পবিত্র বলে থাকি বিশ্লেষণ করার মতো যথেষ্ট সাহস তার নেই। এর ফলে সত্যিকার অর্থে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সে উপলব্ধি করতে পারছে না। মৌলিক ও নিরঙ্কুশের সঙ্গে সাময়িক ও সীমিত বিষয়গুলোর পার্থক্য করতে পারছে না। এমনকি কোন্‌টি অত্যাবশ্যক এবং কোন্‌টি অভিনব রুচির সাথে সম্পর্কিত তাও আমরা বুঝতে পারছি না। আমরা আমাদের ভেতরে যে ভয়, যে আত্মবিশ্বাসের অভাব অনুভব করছি সেসব ঘটনাপ্রবাহ ও তার আনুষঙ্গিক উপাদান আমাদের অতীতের বিচ্যুতির দিকে তাকাতে দিচ্ছে না।

সুতরাং মুসলিম মন যেসব ধ্যানধারণা ও মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির অচলায়তনে বন্দী হয়ে রয়েছে এবং যা তাকে অতীতের ভুলভ্রান্তি ও অবাস্তব বিষয়ের মধ্যে নিমগ্ন রেখেছে, যার কারণে সমস্যার অভ্যন্তরে প্রবেশ, ভালোমন্দের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় এবং নিজের পথ ও পন্থাকে সংশোধন করতে পারছে না। অথবা তার সামনে বিরাজিত সমস্যার গভীরে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না। যে জন্য মুসলিম জাতি সাহসের সাথে নিজের জন্য কোনো পথ তৈরি করতে পারছে না। কারণ সে দূর অতীতের ধূসর কোণায় হাত-পা বাঁধা ও চোখ বন্ধ অবস্থায় বসে আছে।

www.pathagar.com

চিন্তাধারার পদ্ধতি পরিবর্তন এবং দৃষ্টিভঙ্গি সংশোধন করা না হলে মুসলিম মন যে কোনো বিষয়ে সমালোচনামূলক অথবা অন্তর্ভেদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পারবে না। এর বদলে সে সবসময় এক ব্যর্থ সমাধান থেকে আরেকটি ব্যর্থ সমাধানের প্রতি আকৃষ্ট হবে। এ পথ পরিক্রমা চলতে থাকলে তা শুধু আরো খন্ড খন্ড বিভক্তি এবং পতনের দিকে পরিচালিত করবে নিঃসন্দেহে। এ দুর্ভাগ্য পীড়িত মুসলিম মানসে বোঝার উপর শাকের আঁটির মতো উম্মাহর বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ চেপে বসলো। তারা ইচ্ছা করেই হোক বা অনিচ্ছায় হোক, নেতৃত্বের উপর একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে চিরকালের জন্য হতাশ হয়ে পড়ল। এরপর প্রত্যেক গ্রুপ চাইলো উম্মাহর উপর নিজস্ব কায়দায় সন্ত্রাস চাপিয়ে দিতে। উদ্দেশ্য যাই থাকুক রাজনৈতিক নেতৃত্ব এ ধরনের একটি বস্তুবাদী সন্ত্রাস (material terror) এবং অপরদিকে বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব এ দু'ধরনের মনস্তাত্ত্বিক সন্ত্রাস (Psychological terror) নিয়ে মেতে উঠেছিল। এ দু'টি গ্রুপের এ ধরনের কর্মকান্ডে মেতে উঠার কারণ ছিল মুসলমানদেরকে যেন তাদের নেতৃত্বের সামনে সবসময় নিশ্চুপ, দুর্বল ও অধীন করে রাখা যায় তা নিশ্চিত করা। এটা অত্যন্ত হাস্যকর হলেও দুঃখজনক যে, এ সন্ত্রাসবাদ এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌছায় যেখানে রাজনৈতিক ও বুদ্ধিজীবী নেতৃত্ব নিজেরাও শোচনীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চূড়ান্ত ফলাফল হলো বিজাতীয় ঔপনিবেশিক শক্তির হামলার মুখে নিজের প্রতিরক্ষায় সে অক্ষম হয়ে পড়ল।

মুসলিম দৃষ্টিশক্তির এ কুয়াশাচ্ছন্নতার কারণে আমরা মুসলিম জাতিকে দেখি হয়তবা সে তার অতীতকে বরণ করছে; তার সব বিচ্যুতি, চিন্তাধারা, সমাজ ও সংগঠনের বিশেষত্বসহ অথবা তাকে তার সব সহজাত মূল্যবোধসহ পুরোপুরিভাবে প্রত্যাখান করছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী উম্মাহর ব্যক্তিত্বে একটির পর একটি যে প্রাণঘাতী রোগ দেখা দিয়েছে তার ফলে তার দৃষ্টিশক্তি আরো বেশি ক্ষীণ হয়ে পড়ছে। এ অসুস্থ মন ও দৃষ্টি দিয়ে সে সত্য ও অন্ধ বিশ্বাস, লক্ষ্য ও লক্ষ্যে পৌছার উপায়, ধর্ম ও লোককাহিনী, মূল্যবোধ ও গতানুগতিক ঘটনা এবং ধারণা ও অনুকরণের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধির যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে।

মৌলিকভাবে মুসলিম মন ও মানস দু'টি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এ দু'টি শিবির চেয়েছে ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও অলীক কাহিনী অথবা উদ্দেশ্য ও পন্থার কোনো বাছবিচার না করেই বা কোনো পার্থক্য না করেই সব কিছু গ্রহণ বা বর্জন করতে। উম্মাহর অভ্যন্তরে কয়েকটি গ্রুপ এমনও দাবি করলো যে, যেসব জাতি বা সমাজের বস্তুগত সম্পদহানি হয়েছে তার পেছনে রয়েছে অশরীরী বা বিমূর্ত সংকটের কারণ।

চিন্তাধারা ও উপায় সংক্রান্ত প্রশ্ন বনাম মূল্যবোধ ও উদ্দেশ্য সংক্রান্ত প্রশ্ন

এটি সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত যে, যেসব মূল্যবোধ, নীতি ও বিশ্বাস ইসলামের মূল বুনিয়াদ, তা নিয়ে সম্ভবত কেউ আপত্তি তুলবে না। তারপরও ইসলামের শত্রুরা এসব

www.pathagar.com

বিষয়ে কথা বলে না। তাদের মতে, যখন কেউ ইসলামের কথা বলে, তখন সে অন্ধ অদৃষ্টবাদ, জুলুম, রাজনৈতিক নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব, বুদ্ধিবৃত্তিক মনস্তাত্ত্বিক ত্রুটি-বিচ্যুতি, দাস ব্যবসা, অনাচার এবং নারী জাতির মর্যাদাহানির কথা বলে। এসব লোকরা আরো সোচ্চার কণ্ঠে বলে ইসলামী আকীদা, বিশ্বাস মুসলমানদের কিছু পৌরাণিক কাহিনী এবং ভুলভ্রান্তির ইতিহাসেরই নামান্তর মাত্র এবং তাদের রীতিনীতি, প্রথা এবং ঐতিহ্যই হচ্ছে তাদের ঈমান এবং একই সাথে এগুলোই হচ্ছে তাদের অজ্ঞতা, অযৌক্তিক অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কারের প্রতীক। যাহোক, আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, বিভিন্ন জনগোষ্ঠী তাদের পতনকালে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এ কারণে পরবর্তী কালে যা কিছু তাদের অর্জন, তা ছিল ইসলাম, তার নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মানজনক অবস্থানের ফসল। অপরদিকে ইসলাম ও ইসলামী মূল্যবোধের অস্তিত্ব সত্ত্বেও তাদের বিপথে পদচারণা ছিল তাদের অতীত সভ্যতার অনুশীলনের ফল। ইসলাম, এর মূল্যবোধ ও শিক্ষার সভ্যতাগর্বী প্রভাব না থাকলে নিঃসন্দেহে মুসলমানরা আরো বেশি অবিচার, দুর্নীতি ও অজ্ঞতার পঙ্কিলে নিমজ্জিত হতো।

এ সংকট ও সন্ধিক্ষণে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অনুধাবন করা প্রয়োজন, তা হচ্ছে মুসলমানদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো কোনোক্রমেই ইসলামের মূল্যবোধ, উদ্দেশ্য লক্ষ্যের কারণে ঘটেনি। বরং মুসলিম যে উপায়ে ও যেভাবে চিন্তা করছে, অনুভব করছে, যুক্তির অবতারণা করছে তারই ফল। কাজেই আমরা যখন সংস্কারের কথা বলি তখন আমরা বাস্তবিকই চিন্তা এবং মুসলিম মন-মানসের কথা বলি। যেদিকে বাস্তবিকই মনোযোগ নিবদ্ধ করা প্রয়োজন, তা হলো নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে এবং বিভিন্ন আবহ ও পরিমন্ডলে মুসলিম মন কীভাবে সমাজে ও সংগঠনে ইসলামের মূল্যবোধ ও শিক্ষাকে প্রয়োগ করছে।

সর্বোপরি পারস্পরিক ঐক্যমত, সংহতি এবং এসব নীতি বাস্তবায়নের জন্যে যে ব্যবস্থাপনা ও পদ্ধতির আশ্রয় নেয়া হয় (অথবা বাস্তবে যেসব নীতির অবসান ঘটাতে অথবা যেগুলোতে ধ্বস নামাতে প্রশ্রয় বা অনুমোদন দেয়া হয়) তার মধ্যে পার্থক্য আছে। শরিয়াহ বা শরিয়তের উচ্চতর লক্ষ্য এবং সেগুলো সুনিশ্চিত করার জন্য তৈরি নীতিমালার মধ্যে এবং শরিয়াহর নীতি ও মুল্যবোধ এবং তা বাস্তবায়নের কার্যপ্রণালী ও ব্যবস্থাপনার মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। মূল্যবোধ, নীতি এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মতো বিষয়গুলো বিশ্বজনীন অস্তিত্বের বিধিবিধানের অন্তর্ভুক্ত, যা স্থান-কালের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও একটি সুসমন্বিত মানবীয় চরিত্রের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। অপরদিকে কার্যবিধি, নীতি, দৃষ্টিভঙ্গি এবং বাস্তব ব্যবস্থা স্থান ও কালের জরুরি অবস্থার সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। এ সবের অর্থ এ যে, একদিকে ঈমান বা বিশ্বাস, নীতি ও মুল্যবোধের মধ্যে পার্থক্য এবং চিন্তাধারা, হৃদয়ঙ্গম করা এবং প্রয়োগ (অথবা প্রয়োগহীনতা বা অসম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ)-এর মধ্যে পার্থক্য একটি একান্তই মৌলিক বিষয়। আমাদের

www.pathagar.com

ভবিষ্যৎ কর্মপন্থাকে সঠিক দেখতে এবং যে কোনো অর্থপূর্ণ সংস্কার আনতে চাইলে আমাদেরকে এ বিষয়ে অবশ্যই সুস্পষ্ট অবস্থান নিতে হবে। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে তা সত্যই প্রতিভাত হয় যে, উম্মাহর সংকট মূলত বিশ্বাস নিয়ে নয় বরং চিন্তার ক্ষেত্রে, অর্থ উদ্ভূত নয় বরং পদ্ধতির এবং এতে যে সমস্যা সম্পৃক্ত তা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে নয় বরং উপায় বা কৌশল নিয়ে। তাহলে এটিই হচ্ছে সে সঠিক স্থান, যেখান থেকে আমরা গভীরভাবে অধ্যয়ন শুরু করতে পারি এবং তা করতে গিয়ে আমরা প্রতারণাপূর্ণ দাবি এবং কালজীর্ণ ঐতিহ্য সম্পর্কে অপ্রয়োজনীয় বিভ্রান্তির অবসান ঘটাতে পারি।

বুদ্ধিবৃত্তিক বিচ্ছিন্নতা

তকলিদ'র কারণ ও অনগ্রসরতা

সময়ের সাথে সাথে মুসলিম মন ও মানসের সংকটকে এড়িয়ে যাওয়া আরো কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে ওঠে। কারণ তত্ত্ব ও বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্য এখানে অনেক বেশি করা হয়। মুসলমানদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অলীক আশা ও উদ্ভট আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় এবং ইতিহাস ও অতীত দিনের স্মৃতির চেয়ে মুসলিম জাতির সাংস্কৃতিক গুণাবলী একটু বেশি অর্জিত হয়। যখন উম্মাহর নিয়ন্ত্রণ শত্রুর হাতে গিয়ে পড়ে মুসলিম সমাজ ও তার রাজনৈতিক নেতৃত্বের দেউলিয়াপনা স্বতঃই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের ভাগ্যে একই দশা জোটে এবং দুর্ভোগও তাদের সমান হয়, কারণ তারা এমন এক সময়ে পদার্পণ করে, যখন বিজাতীয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের হুমকি বা চ্যালেঞ্জের সামনাসামনি দাঁড়ানোর যোগ্যতা ও ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। উম্মাহ অতীতে সভ্যতার যে উচ্চমার্গে আরোহন করেছিল, তা ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগের ব্যক্তি মানুষের অদম্য প্রেরণার ফল। তথাপি সে স্ফুলিঙ্গকেও পরিণামে নিষ্প্রভ হতে হয় এবং একটি সময়ে আন্দোলনকেও স্থবির হয়ে যেতে হয়। সময় ও পরিস্থিতি বদলে যায়। কিন্তু উম্মাহর রাজনৈতিক নেতৃত্ব বুদ্ধিজীবী নেতৃত্ব থেকে পৃথক হওয়ার কারণে মুসলমানরা সত্যিকারভাবে পথ হারিয়ে ফেলে এবং নিজেদেরকে নতুন করে গড়ে তোলার যোগ্যতা আর তাদের মাঝে থাকে না। নেতৃত্বের এ বিভক্তি তাদের মাঝে আক্ষরিক অর্থে, তাকলিদ, অসংযম ও কুসংস্কারকে প্রশয় দেয়, ফলে অতি দ্রুত এগুলোই তাদের রীতিতে পরিণত হয়। এগুলোই হলো তাদের সমসাময়িক হালচাল। নতুন চিন্তাধারা সৃষ্টি, নিজেদের প্রতিষ্ঠানগুলোর মানোন্নয়ন এবং সভ্যতার ক্ষেত্রে আরো এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা, কর্মসূচি এবং নীতি প্রণয়নের যোগ্যতা উম্মাহ হারিয়ে বসে।

নেতৃত্ব পৃথক হবার পর থেকে, উম্মাহ ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের হাতে গড়া উদার সামাজিক বুনিয়াদের ধ্বংসাবশেষের উপর জীবন কাটিয়েছিল। তথাপি এ

www.pathagar.com

একই সময়ে মুসলিম জাতি ও তার নেতৃত্বের মধ্যে রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষয়িষ্ণুতার উপাদানগুলো ছড়িয়ে পড়ে এবং চিন্তাধারা ও ঝোঁকপ্রবণতা ইতিহাসখ্যাত ইসলামী সমাজ কাঠামোকে বাস্তবে ধ্বংস করে দেয়।

বুদ্ধিজীবী নেতৃত্ব বিচ্ছিন্নতার কারণে (প্রায়শ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব এ বিচ্ছিন্নতাকে তাদের উপর জোর করে চাপিয়ে দিয়েছে) সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছেন এমন উপলক্ষ ও ঘটনা খুবই বিরল। এর পরিবর্তে তারা নিজেদেরকে মনে প্রাণে নিয়োজিত করলেন ধর্মীয় মৌলিক গ্রন্থ অধ্যয়নে, ধর্মশাস্ত্র চর্চার একটি মরুদ্যান রচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন এবং ধর্মীয় সকল মৌলিক গ্রন্থ ও বিজ্ঞানের মাধ্যম হিসেবে প্রাচীন যুগের আরবি ভাষার জটিলতা ধরে রাখলেন। তাদের এসব কর্মকান্ডের ফলেই প্রতিষ্ঠা পেল কুরআন, সুন্নাহ এবং আরবি ভাষার পাঠ সংক্রান্ত বিজ্ঞান শাস্ত্র (Textual Sciences)। শুরু থেকেই ফিকাহ শাস্ত্র ব্যক্তির আনুষ্ঠানিক ইবাদতের নিয়মবিধি ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এ কারণে ফিকাহ শাস্ত্র প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনের আবহ ও পরিমন্ডল পেরিয়ে কখনো এগুতে পারেনি। একইভাবে ফিকাহর ব্যবহারিক বিজ্ঞান কখনো বিশ্বাস সম্পর্কীয় বিজ্ঞান অর্থাৎ আকাঈদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়নি। এ কারণে সাধারণভাবে বলতে গেলে এসবই হয়ে দাঁড়ালো তাত্ত্বিক ও অনুমানভিত্তিক। এভাবেই দেখা যায় বিশ্বাস সম্পর্কিত বিজ্ঞান (আকাঈদ) মুসলিম উম্মাহর দিক নির্দেশনায় কখনো তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেনি।

এমনকি ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের মন-মানস ও চিন্তাধারা যেসব ইসলামী নীতিমালা ও শিক্ষা দ্বারা পরিচালিত হয়েছে তাতে সুস্পষ্টভাবে বিভাজন সৃষ্টি হয় দু'ভাগে। প্রথমভাগে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণভাবে এলো সেসব ইসলামী শিক্ষা ও নীতিমালা যেগুলো ইসলামের মৌলিক গ্রন্থসমূহের সংরক্ষণ ও ব্যাখ্যার সাথে সম্পর্কিত ছিল। দ্বিতীয় ভাগে এলো অপ্রধান বলে গণ্য নীতিমালা ও শিক্ষার কথা যেগুলোকে তাৎপর্যহীন করে রাখা হয় এবং উপেক্ষা করা হয়। অথচ সেগুলো ছিল সামাজিক অবস্থা ও বিভিন্ন পরিস্থিতি ও সমাজ জীবনের পরিবর্তনশীলতা বিশ্লেষণের জন্য অপরিহার্য বিধিবিধান ও দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সম্পর্কিত।

এ বিভাজনের ফলে ইসলামী মৌলিক গ্রন্থসমূহের সাথে সম্পর্কিত নীতিমালাসমূহ অত্যন্ত জটিল বিজ্ঞানে রূপান্তরিত হয়, অপরদিকে দ্বিতীয় পর্যায়ের শিক্ষা ও নীতিমালা এবং সেসবের সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলোকে অবশ্যম্ভাবীরূপে উপেক্ষা করা হয়। উপরিউক্ত কারণে ইসলামী শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সঠিক অর্থে কোনো সমাজ বিজ্ঞান সৃষ্টি হয়নি। ইসলামী অর্থনৈতিক, শিক্ষামূলক, রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক বিজ্ঞান জন্ম না নেয়ার পেছনে এটিই ছিল কারণ। এর পরিবর্তে প্রাচীনকালের সেরা মুসলিম পণ্ডিতগণ হয়তবা কখনো কখনো আলোচনা প্রসঙ্গে অথবা আকস্মিকভাবে স্বগতোক্তি বা মন্তব্য হিসেবে

www.pathagar.com

এসবের উল্লেখ করেছেন। দেখা গেল এভাবেই মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরে ক্যাডার সৃষ্টি, তাকে সুসংগঠিত করা এবং এর উন্নয়নের উপযোগী নীতিমালা প্রণয়নের মতো বিষয়সমূহ পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া হিসেবে ছিল অত্যন্ত অস্থায়ী বা সাময়িক এবং পুরোপুরি খামখেয়ালীপূর্ণ। বিভিন্ন সামাজিক বিষয়গুলোর উপর আকস্মিকভাবে দৃষ্টিপাত করা এবং পুরোদস্তুর সমাজ বিজ্ঞানকে এ কাজে লাগানোর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে আনুষ্ঠানিক যার গবেষণার কাঠামোগত, এর শুরু বাস্তবতা থেকে এবং প্রকৃতির উপলব্ধি থেকে, তারপর এটি এগুতে থাকে লক্ষ্য, নীতিমালা ও মূল্যবোধের দিকে। সমাজ বিজ্ঞান প্রকৃত ফলাফল দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে এবং প্রায়শই যা দেখা যায়, আকর্ষণীয় বাক্য বিন্যাস ও অন্তঃসারশূন্য বাক্যাংশের পেছনে এর গা ঢাকা দেয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

মুসলিম মানসের সংকট হচ্ছে ইসলামের উচ্চতর লক্ষ্য অর্জন এবং এটি ইসলামী মূল্যবোধের মূর্ত প্রকাশের সাথে জড়িত। সুতরাং মূল এবং দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে এটি হচ্ছে চিন্তাধারারই সংকট। সমাজ বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্র হচ্ছে পদ্ধতিহীন থাকার সংকট। মুসলিম চিন্তার সংকট হচ্ছে সমাজ বিজ্ঞানের ঐ সকল শাখা প্রতিষ্ঠা করা যেগুলো উম্মাহকে তার চিন্তাধারার সংগঠন, প্রতিষ্ঠান এবং নীতির ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে। যখন আমরা সমাজ বিজ্ঞানের কথা বলি, তখন আমরা পদ্ধতিগত অধ্যায়ের ক্ষেত্রগুলো বিবেচনা করি এবং এ পদ্ধতিগত অধ্যয়ন বলতে আমরা ক্ষেত্রগুলো বিবেচনা করি। এ পদ্ধতিগত অধ্যয়ন বলতে আমরা কোনো বিশেষ মতবাদ বা চিন্তাধারা (পাশ্চাত্য, বামপন্থী প্রাচীন অথবা অন্য কোনো) বিবেচনায় আনি না। এ কথা বলা যায় যে, যেহেতু মুসলিম মনের জ্ঞানের উৎস পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাত্মক, এ কারণে বিজ্ঞান বিষয়ে এগুলো মূল্যবান অবদান রাখতে পারবে।

ইসলামী সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যা নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনার সময় এখনো আসেনি এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

www.pathagar.com

অধ্যায় দুই
ইসলামী চিন্তাধারার পুরনো পদ্ধতি
বিচার-বিবেচনা ও সমালোচনা

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, পুরনো সমাধান, হোক তা ইতিহাস নির্ভর বা বিজাতীয়, ব্যর্থ, কারণ তাতে সংস্কারের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি নেই। উম্মাহর সংকট সামর্থের বা সম্পদের নয় বরং ধারণা বা দৃষ্টিভঙ্গির। এ ধারণাগত সংকট বিশ্বাস, মূল্যবোধ অথবা নীতির সংকট নয় বরং চিন্তাধারা ও পদ্ধতির দীর্ঘস্থায়ী সংকট। উম্মাহর রাজনৈতিক ভিত্তিমূলে পরিবর্তনের ফলেই এ সংকটের সৃষ্টি এবং তার ফলে যে কোনো ধরনের সামাজিক দায়িত্ব থেকে বুদ্ধিজীবী নেতৃত্বের দূরত্বের অবস্থান। এ একটি ঘটনাই সকল বুদ্ধিবৃত্তিক এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি থামিয়ে দিয়েছে এবং উম্মাহকে উন্নয়ন এবং চ্যালেঞ্জের সাথে তাল মিলিয়ে চলার অযোগ্য করে তুলেছে। সভ্যতার অগ্রযাত্রা সম্বন্ধে অবহিত থাকার এ অপারগতা হলো সংকটের মূল কারণ। কিন্তু পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হবে না যদি কয়েকটি বিষয়ে মনোযোগ দেয়া না যায় এবং মুসলিম মনের গতি ঠিক না হয়। যেসব বিষয়ে মুসলিম চিন্তাধারার বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যা মোকাবিলা করতে হয় তা শোধরাতে হবে এবং বিভিন্ন ঘটনা, চ্যালেঞ্জ, সম্বন্ধ এবং সমাজ জীবনের অন্য করণীয় সব কিছুকে উপযোগী করে পদ্ধতি বিজ্ঞানকে পুনরায় ঢেলে সাজাতে হবে। উম্মাহর পদ্ধতি বিজ্ঞান সুষ্ঠু ও সঠিক হলে তার চিন্তাধারাই সংস্কার প্রচেষ্টার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় শক্তি যোগাতে পারবে।

এ কারণে মুসলিম মন-মানস ও চিন্তাধারাকে আরো ভালোভাবে বোঝার জন্য এবং তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ব্যর্থতা আরো ভালোভাবে চিহ্নিত করার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই তাদের মন-মানস ও চিন্তাধারার পদ্ধতিবিজ্ঞানের প্রতি মনোযোগী হতে হবে। তারপরই আমরা মুসলিম মনের সংস্কার কি উপায়ে করা যায় সে সম্পর্কে কিছু পরীক্ষামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হবো।

আল-উসূল ঃ সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা

উসূল আল ফিকহ বিজ্ঞান (আইনগত উৎস সম্পর্কিত পদ্ধতি বিজ্ঞান) হচ্ছে ইসলামী চিন্তাধারার ঐতিহাসিক পদ্ধতিবিজ্ঞান। এ বিজ্ঞান পুরনো ইসলামী শিক্ষায় যে পদ্ধতি

www.pathagar.com

ব্যবহার করা হয়েছে তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যারা এ বিজ্ঞানে পাণ্ডিত্য লাভ করেছেন তাদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষাপটে এটিকে ইসলামের পুরনো পদ্ধতিবিজ্ঞান বলা যেতে পারে। কারণ তার দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে অন্ধভাবে না হলেও নিষ্ক্রিয়তার বাধাকে গ্রহণ করা।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ পদ্ধতিবিজ্ঞানের ব্যাপক নীতি ও বিশ্বজনীন বিধানের মধ্য দিয়ে ইসলামী চিন্তাধারা, প্রকৃতি এবং ইসলামিক মিশনের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিফলিত হয়েছে। ইসলামের মৌলনীতি ও তার সৃজনশীল প্রয়োগের প্রকৃত দৃষ্টান্ত খোলাফায়ে রাশেদার আমলেই দেখা গিয়েছিল। এক সময় ওহীকে পথ নির্দেশ ও পরিচালনার উৎস হিসেবে নেয়া হয়েছিল এবং যুক্তি ও ইজতিহাদের মাধ্যমে ওহীকে উপলব্দি করা ও তার ব্যাখ্যা দেয়ার পদ্ধতি ব্যবহার করা হতো। এছাড়া যুক্তি ও ইজতিহাদকে বিভিন্ন ঘটনা এবং তার প্রতিক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে করণীয় ও নীতি প্রণয়নের জন্য কাজে লাগানো হতো। পরবর্তী সময়ে ইজতিহাদের যুগে উম্মাহর রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বের মধ্যে যখন বিভেদ সৃষ্টি হয়, মুসলিম চিন্তাবিদ ও পণ্ডিতগণ তখনো ইসলামের বাণীর মর্ম এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগের পদ্ধতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রেখে চলছিলেন। ফলে তাঁরা প্রাথমিক যুগের পদ্ধতি বিজ্ঞানের ভিত্তিতে লেখনী ধারণ ও চিন্তা করেন। তাদের মধ্যে রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয়ার পর একাডেমিক বিষয়াবলী ছাড়া বাকি সব কিছু তারা পরিত্যাগ করতে শুরু করলেন। তারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদান করতেন ও লিখতেন। কুরআন ও সুন্নাহর মূল বক্তব্যের ভিতর থেকে এককভাবে তারা ব্যক্তিগত বিষয়গুলোর বিভিন্ন দিক নিয়ে লিখতেন। যেমন, ইবাদত ও মোয়ামেলাত (লেনদেন)। কিন্তু তারা রাজনীতি, সরকার, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন গ্রুপ ও সমাজের সাথে সম্পর্কিত প্রশ্ন বা বিষয়গুলো উপেক্ষা করলেন। এর ফলে তারা পদ্ধতি বিজ্ঞানের যে সূত্র ব্যবহার করতেন তা যে পরিস্থিতিতে সৃষ্টি করা হয়েছিল তার সাথে সংগতি রেখে এবং যার উপর মুসলিম জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না তার দ্বারা তারা প্রভাবিত হয়ে ব্যবহৃত হতে লাগলেন। তারপরও তাদের পদ্ধতি বিজ্ঞানের সাধারণ নীতি বিকাশের এবং তার মাধ্যমে বাস্তব অবদান রাখার পথ খোলা রইল। কিন্তু তকলিদের বিপরীতে নতুন কিছু উদ্ভাবন বা সৃজন এবং চেতনা নির্ভর এ অব্যাহত বিকাশকে মেনে চলা পরবর্তী প্রজন্মের দায়িত্ব হিসাবে দেখা দিল। একমাত্র প্রগতির চেতনায় উদ্ভাসিত হলেই পদ্ধতিবিজ্ঞানের সঠিক ব্যবহার, এর থেকে কল্যাণ লাভ করা যাবে এবং পরবর্তী পরিস্থিতিতে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় একে আরো উন্নত করা সম্ভব এমন চেতনাই পদ্ধতি বিজ্ঞানকে ইতিবাচক ও কার্যকরভাবে বিকাশের পথে নিয়ে যাবে এবং এভাবেই পদ্ধতিবিজ্ঞান ব্যক্তিজীবনের চৌহদ্দীর বাইরে অবদান রাখতে পারবে। এ চেতনা বা মনোভঙ্গি ইসলামী চিন্তাধারার সর্বাত্মক ও মৌলিক প্রকৃতি সংরক্ষণ এবং তার ইজতিহাদ ও ইজতিহাদের বিভিন্ন উৎস ও শিক্ষার পরিপূরকতাকে রক্ষা করতে পারবে।

www.pathagar.com

আমরা বর্তমানে যতটুকু জানি তারই সূত্র ধরে ইসলামী চিন্তাধারার প্রচলিত পদ্ধতি বিজ্ঞানের সার্বজনীন নীতিগুলোর উপর স্বল্প পরিসরে একটি সমীক্ষা চালানো আমাদের জন্য সুবিধাজনক হবে। তারপরই আসবে সে সমীক্ষার মৌলিক ও অপরিহার্য কয়েকটি দিক এবং সেই পদ্ধতি বিজ্ঞানের অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর উপর আলোচনা। আমরা জানি বর্তমানে উসূল আল ফিকহ হচ্ছে ইসলামী চিন্তাধারার পদ্ধতি বিজ্ঞান। অপর দিকে তার সাধারণ নীতি বা স্বতঃসিদ্ধনীতিগুলো মুসলিম মন-মানসের যৌক্তিক বুনিয়াদ, মৌলনীতি ও কর্মবিধানসমূহের প্রতিনিধিত্ব করে। শিক্ষার একটি বিষয় হিসাবে উসূল আল ফিকহ খোলাফায়ে রাশেদার পরে সাহাবাদের পরবর্তী তাবেঈন তাবে তাবেঈনরা উদ্ভাবন করেছিলেন। এভাবে দেখা যায় ইমাম শাফেয়ীর আল-রিসালাকে সাধারণভাবে ইসলামী চিন্তাধারার পদ্ধতিবিজ্ঞানের প্রাচীনতম গ্রন্থ এবং বিশেষভাবে উসূল আল ফিকহকে বিজ্ঞানের প্রাচীনতম সংকলন হিসেবে মনে করা হয়।

যেসব মৌলনীতির উপর এ বিজ্ঞান ও পদ্ধতি দাঁড়িয়ে আছে, সেগুলোকে প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায় এ দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রাথমিক বুনিয়াদগুলো কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা (জ্ঞানীজনদের ঐক্যমত এবং কিয়াস সাদৃশ্য) এর সাথে সম্পর্কিত বিষয়বলী নিয়ে গঠিত। দ্বিতীয় পর্যায়ের বুনিয়াদ বলতে বোঝা যায় ঐসব সাক্ষ্য প্রমাণের উৎস, যেগুলো কীভাবে এবং কোন্ পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা যাবে সে সম্পর্কে পণ্ডিতদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে (আল আদিল্লা আল মুখতালিফ ফিহা)। দ্বিতীয় পর্যায়ের এসব উৎসের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ইসতিহসান (অধিকতর যুক্তিসংগত সাদৃশ্য বিধান), আল মাসালিহ আল মুরছালা (জাতির ব্যাপক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট), সাদ আল জারাই (অবৈধ লক্ষ্য হাসিলে প্রকাশ্যে বৈধ উপায়ে প্রতিবন্ধকতা) উরফ্ (প্রথা এবং আইনগত ব্যবহার, সাহাবাদের কথা এবং মদীনাবাসীদের বাস্তব আচরণ)।

শরিয়াহ এবং শরিয়াহ বহির্ভূত বিজ্ঞান

এ বিভাজনের ভিত্তিতে ইসলামের প্রথম যুগ থেকে ইসলামী বিজ্ঞান ও শিক্ষাকে শরিয়াহ এবং শরিয়াহ বহির্ভূত বিজ্ঞান হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। শরিয়াহ বিজ্ঞানের পার্থক্য সৃষ্টিকারী বৈশিষ্ট্য হলো কুরআন ও সুন্নাহর আইনগত ব্যাখ্যার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর ভিত্তিতে বলা যায় কুরআন, সুন্নাহ, ফিকহ, ধর্মতত্ত্ব এবং প্রাচীন আরবি ভাষাবিজ্ঞান নিয়ে শরিয়াহ বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে। প্রাচীন আরবি ভাষ্যকে শরিয়াহ বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করার পেছনে কারণ ছিল কুরআন ও সুন্নাহ অধ্যয়নে আরবি ভাষার একটি অপরিহার্য উপাদান।

ইসলামী চিন্তাধারার পদ্ধতি বিজ্ঞানের বুনিয়াদের এ বিভক্তি থেকে আমরা শরিয়াহ বিজ্ঞানের সর্বশেষ ধাপে ধর্মতত্ত্ব বিজ্ঞানের (ইলম আল কালাম) অবস্থান সম্পর্কে বুঝতে পারি। ইসলামী আকিদা বিশ্বাস ও মতবাদ ধর্মতত্ত্ব বিজ্ঞানের মূল বিষয় হলেও ধর্মশাস্ত্রের

www.pathagar.com

তুলনামূলক বিষয়ে ইলম আল কালামের প্রবেশ এবং অ্যারিস্টটলের যুক্তিবিদ্যা ও গ্রীক দর্শনের এতে অনুপ্রবেশের ফলে ইসলামী আকীদা বিশ্বাস ও মতবাদের আলোচনা ও অধ্যয়নের গুরুত্ব হ্রাস পায় এবং এসব বিষয়ের আলোচক ও গবেষকদেরকে প্রচন্ড বাক বিতন্ডা ও বিভক্তির মাঝে ঠেলে দেয়।

এভাবে উম্মাহর চিন্তাধারায় ধর্মতত্ত্ব দুর্বলতার একটি উৎস হয়ে রইল। এর ফলে উম্মাহ ধর্মতত্ত্বকে তার সামাজিক ও সভ্যতা সহায়ক সংগঠনসমূহ ও উন্নয়নের কাজেও লাগাতে পারেনি। ফলে ব্যক্তির স্বার্থকেন্দ্রিক আইন বিজ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষামূলক ও সার্বজনীন লক্ষ্যাভিসারী ধর্মতত্ত্ব বিজ্ঞানের আরো একটি বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হলো। আইন বিজ্ঞান ও ধর্মতত্ত্ব বিজ্ঞান একে অপরের পরিপূরক হিসেবে ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি বলেই ব্যাপকভাবে কোনো ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠেনি। পরিণামে এ দু'টি বিজ্ঞানের উন্নয়ন ও বিকাশ হলো অপূর্ণাঙ্গ ও অসম্পূর্ণ। তার ফলে পরবর্তীতে উম্মাহ যেসব পরিবর্তন ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় সে সম্পর্কে তারা অবহিত থাকতে পারেনি।

আলোচনার এ পর্যায়ের ঐতিহ্যবাহী ইসলামী চিন্তাধারার কাঠামোতে যেসব মূল বিষয় রয়েছে তাদের প্রত্যেকটির উপর আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। যার মাধ্যমে এর ত্রুটি-বিচ্যুতির পেছনে যেসব কারণ রয়েছে সেগুলো সর্বোত্তম উপায়ে কীভাবে সমাধান করবো তাও আমরা বুঝতে পারবো।

ইসলামের প্রাথমিক উৎস হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ। প্রাচীন পদ্ধতিবিজ্ঞান অনুযায়ী এ দু'টি অধ্যায়নের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে ইতিহাস, মতবাদ ও ভাষাগত জ্ঞান থাকা। পুরনো সকল ইসলামী শিক্ষা ও বিষয় হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে তত্ত্বনির্ভর। অপরদিকে এ দু'টি উৎসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী (অর্থাৎ ব্যাখ্যা বা ভাষা এবং বাস্তব অবস্থা পরিস্থিতির সাথে তার প্রাসঙ্গিকতা) দ্বিতীয় পর্যায়ের গুরুত্ব পেল। এসব উপাদানের ব্যবহার হঠাৎ কোনো ঘটনা, পণ্ডিত ব্যক্তিদের যোগ্যতা এবং তাদের ব্যক্তিগত জীবনযাপন পদ্ধতির উপর নির্ভর করতো। এ উপলব্ধি থেকেই বিভিন্ন ইসলামী বিষয়, বিজ্ঞান ও শিক্ষার উপর শব্দার্থ ভিত্তিক পদ্ধতিবিজ্ঞানের একচ্ছত্র প্রভাব ও ইজতিহাদের অন্তর্ধানের কারণ অনুধাবন করা যায়। অধিকন্তু, ইজতিহাদ নামক ইনস্টিটিউশনটির দীর্ঘদিনের স্থবিরতা সত্ত্বেও মুষ্টিমেয় কিছু প্রতিভাবান মনীষী শতাব্দীব্যাপী যে ইজতিহাদ করেছেন, তাদের যোগ্যতা ও প্রতিভা আরো পূর্ণাঙ্গভাবে মূল্যায়ন করা যায়। তাদের উজ্জ্বল প্রতিভার পটভূমি হিসেবে আমরা নিশ্চিতভাবেই সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে তাদের অংশ গ্রহণকে চিহ্নিত করতে পারি। সমাজ ও রাজনীতিতে প্রবেশের ফলেই তারা সমসমায়িক বিজ্ঞানে বুৎপত্তি অর্জন, গোটা উম্মাহর পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং বিভিন্ন সমস্যা সম্পূর্ণভাবে তাত্ত্বিক বা আভিধানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে না দেখে বাস্তবভাবে মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

www.pathagar.com

প্রাসঙ্গিকভাবে লক্ষ্য করা যায়, কুরআন ও সুন্নাহকে প্রাচীন পদ্ধতিতে অধ্যয়নের ফলে প্রায়ই এ দু'টির মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলা হয় এবং পরস্পরের বাস্তব অবস্থান এবং যেসব পদ্ধতিতে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে তা নিয়ে বিতর্কের বিষয় হয়। এগুলো থেকে গবেষণার কোনো প্রকার বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ভূমিকা নির্ণয় অথবা কুরআন ও সুন্নাহর মধ্য থেকে কোনো একটির বিশেষ অবদান চিহ্নিত করা প্রায় অসম্ভব। এ কারণেই সমসাময়িক ইসলামী বিষয়ে গবেষণা প্রচলিত ঐতিহাসিক তকলিদ এবং বাতিলকরণ সংক্রান্ত তত্ত্বের (নসখ) নিচে চাপা পড়ে গেছে। পরিণতিতে উচ্চতর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মাঝে পরিব্যাপ্ত প্রজ্ঞা, প্রাসঙ্গিক এবং জীবন জিজ্ঞাসার জবাব দিতে সক্ষম এমন ফিকহ হারিয়ে গেছে। উপরন্তু মননশীলতার ক্ষেত্রে বর্তমান স্থবিরতার ফলে সময় ও স্থানের মৌলিক বিষয়ে ওহীর সাধারণ ও স্বীকৃত অর্থের প্রেক্ষাপটে সুনির্দিষ্ট ও প্রাসঙ্গিক মূল বিষয়ের মর্যাদা এবং মানবজাতি ও বিশ্বজগতের প্রকৃতি সম্পর্কে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

এ ধরনের পরিস্থিতি সুন্নাহর বিপরীত বা খলিফা ও তাদের সমসাময়িক মহান ব্যক্তিগণের মতামতের বিপরীত। এ ভাবেই সুন্নাহর অধ্যয়ন হাদিসের সনদ ও রাবী সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতার জটিল প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়। আমরা এসব অধ্যয়নের গুরুত্বকে অস্বীকার করার জন্য নয় বরং এসব বিষয়গুলোকে গুরুত্ব অনুযায়ী কয়েক শতাব্দী পূর্বে নিম্পন্ন শ্রেণী বিন্যাস ও সংকলিত বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেছি। এ ধারণাকে সুস্পষ্ট করার জন্যই ঐ বিষয়গুলোর অবতারণা করা হয়েছে। দুঃখজনক বিষয় হলো, একই ধরনের হাদিস গুরুত্ব ও মানের দিক থেকে বুদ্ধিজীবীদের সাথে সমানভাবে বিবেচিত হয়নি। অনুরূপভাবে ইজমার মৌলিক ধারণা সম্পর্কে গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রচলিত উসূলের সংজ্ঞানুযায়ী এর লক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে স্বীকৃত নয় এবং সর্বসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত, যাতে ভিন্ন মতের কোনো অবকাশ নেই। যারা ইজমার চর্চা করেছেন, তারা উপলব্ধি করেছেন যে, কুরআন ও সুন্নাহ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত ঐসব মৌলিক বিষয়াবলীর জন্য না হলে ইজমাকে আকায়েদ বা বিচার ব্যবস্থায় তাৎপর্যপূর্ণ কোনো বিষয়ে ব্যবহার করা বাস্তবেই অসম্ভব। অবশ্য, যে সব ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বিষয়গুলো পাওয়া যায় সেখানে ইজমার কোনো প্রয়োজন নেই।

অধিকন্তু উসূলে ফিকহ শাস্ত্রের পণ্ডিত যে ধরনের প্রচলিত ইজমার সংজ্ঞা দিয়েছেন তা কুরআন ও হাদিস সম্পর্কে গবেষণা ও অধ্যয়নকালে বিশেষ তত্ত্ববিদদের নির্দিষ্ট কয়েকটি গ্রুপ ছাড়া আর কেউ উল্লেখ করেননি। এভাবে একান্তই ইজমা সৃষ্টির প্রয়োজন দেখা দিলে তবুও তা হবে অবশ্যই একটি তাত্ত্বিক ব্যাপার, সমসাময়িককালের মুসলিম জীবনের চাহিদা ও প্রয়োজনের উপর তা কোনো প্রভাব বিস্তার করবে না। এটি আমাদের চিন্তাচেতনার বাইরে এবং আমাদের বর্তমান পরিস্থিতির সাথে প্রাসঙ্গিক নয়। এ পরিস্থিতির তাত্ত্বিক ও কিতাবি মাত্রা ছাড়াও বাস্তব সামাজিক ও রাজনৈতিক মাত্রা রয়েছে।

www.pathagar.com

কারণ এ পরিস্থিতি ইজমাকে উম্মাহর বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যকার ফাটলকে টিকিয়ে রাখার ও উৎসাহিত করার একটি বিষয়ে পরিণত করে। ফলে পুরো সমাজই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই বাস্তব বিবেচনায় নেতৃত্বের দু'টি গ্রুপের সম্প্রীতি ও বৈধতার উপর ভিত্তি করে উম্মাহ বা মুসলিম সমাজের প্রকৃত ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটায়। সুতরাং উসূলবিদদের ধারণা অনুসারে ইজমা যথার্থই একটি তাত্ত্বিক বিষয়, এটি কোনো বস্তুর বা নির্ভরযোগ্য সূত্রের প্রতিনিধিত্ব করে না এবং ইসলামের সামাজিক বা রাজনৈতিক গতিবিজ্ঞানর কোনো বাস্তব অভিব্যক্তিও নয়। এ কারণেই সমসাময়িক মুসলিম সমাজের রাজনীতি, সরকার বা আইন প্রণয়নে ইজমা কোনো তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে না।

আরেক ধরনের ইজমা প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলমানদের সচেষ্ট হওয়া উচিত। এর ভিত্তি হবে ইজতিহাদ ও শূরা– যা যোগ্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত উপদেষ্টা গ্রুপ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ধারণা নির্বিশেষে ইসলামের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ সমাজনেতাদের ধ্যানধারণা থেকে প্রতিষ্ঠিত হবে।

কাঙ্ক্ষিত ইজমা সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসনের ধারণা থেকেও লাভ করা যায়। এ ইজমা (ঐকমত্য) সংখ্যাগরিষ্ঠের (majority) শাসনের ধারণার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ, যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রতিনিধিত্ব করবে সত্যিকার দায়িত্বশীল নেতৃত্বের (leadership)। এভাবে ব্যক্তিগত মতামত ভিত্তিক তাত্ত্বিক গবেষণা (বিশেষত লেনদেন, সংগঠন, সরকারি নীতি সংক্রান্ত বিষয়াবলী নিয়ে), বাস্তব, মতবাদগত ও নৈতিক দিক থেকে মুসলিম জীবনের উপর প্রভাব বিস্তারকারী। রাজনৈতিক ও আইনগত দিক থেকে অবশ্য পালনীয় আইনের মধ্যে সহজে পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। চতুর্থ প্রাথমিক ভিত্তি হচ্ছে কিয়াস। যেসব বিষয়ে কুরআন অথবা সুন্নাহ থেকে কোনো নির্দেশ বা হুকুম খুঁজে পাওয়া যায় না সেসব বিষয়ে যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করাই কিয়াস।

এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আলোচ্য ঘটনা এবং বিশ্বনবী (সা)-এর জীবদ্দশায় সংঘটিত অনুরূপ ঘটনার মধ্যে সাদৃশ্য সৃষ্টি করা বা খুঁজে বের করা, তখন এর পেছনে এ বিশ্বাস সক্রিয় থাকে যে, দু'টি ঘটনার মধ্যে দৃষ্ট সাদৃশ্যের কারণে উভয় ক্ষেত্রে একই হুকুম বা সমাধান প্রযোজ্য হবে। কিয়াসের ক্ষেত্রে একটি প্রধান শর্ত হচ্ছে উভয় ঘটনার ক্ষেত্রে সাধারণ সামাজিক পরিস্থিতি সমান্তরাল অবস্থানে থাকতে হবে। কোনো কিছু ভিন্ন ধরনের হলে এ বিষয় নির্ধারণ করতে হবে যে, এ পার্থক্য বা পার্থক্যগুলো অতি ক্ষুদ্র কি না, মৌলিক নীতির সাথে না হয়ে খুঁটিনাটি বিষয়ের মধ্যে সীমিত কী না এবং মনোযোগ নিবদ্ধ করার উপযোগী কী না। পার্থক্যগুলো পরস্পর বিপরীত না হলে ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি করা যেতে পারে এবং একই হুকুম বা সমাধান প্রয়োগ করা যেতে পারে।

উমর (রা)-এর খেলাফত আমলে ইসলামী রাষ্ট্রের সম্প্রসারণকাল থেকেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্রুত ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। কাজেই উপরোল্লিখিত সীমিত আকারের কিয়াস সমসাময়িক

www.pathagar.com

সমস্যা ও পরিবর্তনগুলো মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে মোটেই বাস্তব বা উপযোগী নয়। এ বিষয়টি কিছু পুরনো প্রাজ্ঞ পন্ডিত এগিয়ে নিয়ে যান। এ পদ্ধতিগত সূত্রটি সর্ব প্রথম ইরাক, পারস্য ও মধ্য এশিয়ার ফিকাহ্‌বিদদের মধ্যে প্রসার লাভ করে। অধিকন্তু ঐ সমস্ত এলাকায় প্রথমে ইসতিহ্‌সানের চর্চা শুরু হওয়ার পেছনে কারণ ছিল খিলাফতে রাশেদার আমলে সমাজে বিভিন্ন পরিস্থিতি ও ঘটনার উদ্ভব, পারস্যে ইসলামী চিন্তা এবং আব্বাসীয়া সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। এ সময়টি ছিল জনসংখ্যা বিষয়ক এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপক পরিবর্তনের যুগ। ইসলামের প্রাথমিক যুগে বা আরব উপদ্বীপে এমন ব্যাপক পরিবর্তন ইতোপূর্বে আর দেখা যায়নি। আরব উপদ্বীপে প্রথম খলিফার পর বুদ্ধিজীবীদের রাজনৈতিক ভূমিকার গুরুত্ব হারিয়ে যায়। উসূলে ফিকহ্ শাস্ত্রের দ্বিতীয় পর্যায়ের উৎস তালিকার শীর্ষে ইসতিহ্‌সানের অবস্থান। এ উদ্ভব সুস্পষ্টভাবে সমাজের পরিবর্তনশীল আইনগত ও সামাজিক চাহিদা ও প্রয়োজনকে দেখিয়ে দেয়। বিশেষ করে যেসব দেশ প্রাক ইসলামী সভ্যতায় সমৃদ্ধ ছিল সেসব দেশের অধিকতর উন্নত নাগরিক আবহে ইসতিহ্‌সানের বিকাশ ঘটে। কিয়াসের প্রচলিত ধারণা এবং সর্বক্ষেত্রে না হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এরকম দু'টি ঘটনাকে পরস্পর তুলনা করার পদ্ধতিটি ছিল একান্তই সরলীকরণ পদ্ধতি। এ ধরনের পদ্ধতি ছিল বাস্তবে বিভ্রান্তির। কারণ এ পদ্ধতি বুদ্ধিজীবী ও পণ্ডিতদেরকে সমাজের বিভিন্ন সমস্যার মূল কারণ খুঁজে বের করা থেকে বিরত রাখে এবং এর পরিবর্তে তাদেরকে উক্ত পরিস্থিতির সামগ্রিক চিত্র বা সভ্যতার বিপরীত পরিস্থিতির ভিত্তিতে তাদের আইনগত রুলিং ও রায় প্রদানের দিকে পরিচালিত করে। সুতরাং ইসতিহ্‌সানের প্রয়োজন ও চাহিদা ছিল সুস্পষ্ট। কারণ কোনো আইনবিদ ইসতিহ্‌সান ছাড়া কিয়াসের মাধ্যমে সীমিত দৃষ্টিভঙ্গিকে অতিক্রম করে সামনে এগুতে পারে না এবং শরিয়াহ উচ্চতর লক্ষ্য ও অগ্রাধিকারসমূহ বিবেচনায় সক্ষম ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে তার অক্ষমতাকে কাটিয়ে উঠে অগ্রসর হতে পারে না। একমাত্র এ পথেই একজন আইনবিদ তার সামনে উপস্থিত সমস্যাবলীর সীমিত বিবরণের বাইরে যেতে পারেন এবং শরিয়াহর চেতনা ও তার লক্ষ্যের প্রতিফলন ঘটিয়ে তার সিদ্ধান্ত দিতে পারেন। এ ধরনের সিদ্ধান্ত ইসলামের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

ইসলামী প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক পরিবর্তনের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বুঝতে হলে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে, পুরনো পণ্ডিতদের অনেকেই যারা আইনের আক্ষরিক দিক কঠোরভাবে মেনে চলেন, তাদের পক্ষ থেকে সামাজিক ফলাফলকে মেনে নেয়া হয়। শরিয়াহর নীতি এবং অগ্রাধিকারসমূহ বিবেচনার জন্য আক্ষরিকতাবাদী পদ্ধতিবিজ্ঞান ও তার সংকুচিত দিগন্তের সীমানা বাড়ানো ছাড়া তাদের জন্য আর কোনো ঠিকানা ছিল না। এ নতুন পরিস্থিতির অন্যতম দৃষ্টান্ত হচ্ছে মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা বা অবস্থান। সুন্নাহ অনুসারীদের দ্ব্যর্থহীনভাবে মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা হলেও এবং এ

www.pathagar.com

বক্তব্য বিদ্যমান থাকা অবস্থায় এবং সুন্নাহর সব কিছু আক্ষরিকভাবে গ্রহণের জন্য বুদ্ধিজীবীদের স্বাভাবিক ঝোঁক থাকা সত্ত্বেও তারা মূল্য নিয়ন্ত্রণের পক্ষে বিশেষজ্ঞ মত প্রদান করলেন। কারণ এটি তাদের কাছে স্পষ্ট ছিল যে, তারা এ ধরনের রায় না দিলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জুলুম শুরু হবে। তারা ভারসাম্য পুনঃ প্রতিষ্ঠায় অক্ষম ছিলেন, সেহেতু মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং বাজারে সরকারি হস্তক্ষেপ বিশেষ করে জিনিসপত্রের দাম বেঁধে দেয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করা ছাড়া তাদের গত্যন্তর ছিল না।

সমাজ বিজ্ঞানের অবহেলা

সাধারণ বিধিবিধানের মাধ্যমে অনুসৃত সনাতনি উসূল ও পদ্ধতিবিজ্ঞান এবং এগুলোর উৎস ও বিকাশ-এর ন্যায় বিষয়গুলো ইসলামী যুক্তিবাদ ও জীবনের বাস্তবতার নিরিখে দ্বিতীয় পর্যায়ের উসূলের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়। এগুলোতে ইজতিহাদের ভিত্তি ও বাস্তব প্রয়োগের বিষয়টি দেখা গেলেও এগুলোতে দ্বিতীয় পর্যায়ের গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আর এভাবেই সুস্পষ্টভাবে ইসলামী চিন্তাধারা ও পদ্ধতিবিজ্ঞানে যে ত্রুটিবিচ্যুতি ঢুকে পড়েছিল এতে তাই প্রমাণিত হয়। এসবই ছিল সামাজিক, সাংগঠনিক ও সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতার মাইল ফলক। এর পরিণামে দেখা দেয় উম্মাহর পতন।

জনজীবন থেকে বুদ্ধিজীবী নেতৃত্বের (বাধ্য হয়ে বা ভিন্ন কারণে) বিদায়ের স্পষ্ট ফল ছিল যে, তাদের নীতি এবং পদ্ধতিগত বিষয়গুলোকে সুস্পষ্টভাবে ইসলামী ফিকহ শাস্ত্র এবং মুসলিম সমাজকে (বর্তমান কালের সমাজবিজ্ঞান ও মানবিক বিষয়ের আলোকে) গড়ে তোলার কাজে গুরুত্বের সাথে ব্যবহার করা হয়নি। ভয়াবহ ফিতনা শুরু হয় উসমান বিন আফফান (রা)-এর শাহাদাতের পর থেকে যার ফলে উমাইয়া বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়। রাজনৈতিক গোলযোগের ফলে উম্মাহর রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব পৃথক পথে অগ্রসর হয়। আদর্শের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ ইসলামী বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার সব আসন থেকে ছিটকে পড়ার কারণে ইসলামী চিন্তাধারা সমাজকল্যাণের সংগঠনের সাথে সম্পর্কিত বিজ্ঞান ও শিক্ষার উন্নয়ন এবং বিকাশে তারা উসূলকে কাজে লাগানো থেকে বিরত থাকে। তারা বরং ব্যক্তি মুসলিমের আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক চাহিদার উপর আলোপকপাত করা ও তাকে গুরুত্ব দেয়ার পথ বেছে নেয়।

ইসলামী চিন্তাধারা এবং তার পদ্ধতিবিজ্ঞানের সৃষ্টি, উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য দায়ী ঘটনাবলী বিবেচনার পর আমরা এখন ইসলামী যুক্তিবাদের ব্যর্থতার পেছনের কারণসমূহ এবং উম্মাহর ইতিহাস, ক্ষতিকারক ইজতিহাদ এবং মননশীল উদ্যোগের দ্বার এত তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে গেল কেন তা আরো ভালোভাবে বুঝতে পারি। এসব ক্ষেত্রে কিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীবীর অনন্য সাধারণ অবদান ছিল ঠিকই, তবে সেগুলোকে বড়জোর কিছু ব্যক্তি, মানুষের প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে এবং এসব প্রচেষ্টার ফলে আনুষ্ঠানিকভাবে

www.pathagar.com

কোনো সাংস্কৃতিক আন্দোলনের জন্ম হয়নি। এ কারণে আমরা ফিকহ শাস্ত্রে সমাজের প্রকৃতি ও কর্মকান্ড নিয়ে গভীর চিন্তাধারার উদাহরণ দেখতে পাই। এসব বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারাকে কোনোভাবেই ইসলামী সমাজবিজ্ঞান হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। অথবা এসব চিন্তাধারা ইসলাম চিন্তাধারার অভ্যন্তরে একটি নতুন ধারায় পরিণত হবে বা উম্মাহ এবং তার প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের সমস্যা সমাধানে দিক নির্দেশনা দেবে তারও প্রত্যাশা করা যায় না।

ইসলামী চিন্তাধারার বিকাশ সম্পর্কে আমাদের অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে আমরা সমাজের সাধারণ সংগঠন এবং ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সরকার, খেলাফত ও রাজনীতি বিষয়ে গভীর মননশীল অধ্যয়নের যে অভাব রয়েছে তার কারণ সহজেই অনুধাবন করতে পারি। এভাবেই উম্মাহর গঠনের মূল উপাদান এবং তার অস্তিত্বের সার-নির্যাস কি তা হয়তো ইচ্ছাকৃতভাবে অবেহলা করা হয় অথবা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে লেখা কিছু পুস্তিকার আলোচনা প্রসঙ্গে এসবের উল্লেখ করা হয়। উম্মাহর রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বের বিচ্ছিন্নতা থেকে উদ্ভুত বুদ্ধিবৃত্তিক রূপরেখা ইসলামী চিন্তাধারার বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি বিজ্ঞানের উপর এবং ইসলামী জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা ও তাদের সীমা-পরিসীমার উপর প্রভাব বিস্তার করে। এর ফলে এসব গবেষণা (studies) হয় বর্ণনামূলক এবং পুরনো। আক্ষরিকতার মধ্যে এগুলো নৈরাশ্যকরভাবে আটকে যায়। এর মাধ্যমেই আমাদের ক্লাসিক্যাল পণ্ডিতগণ (Classical scholars) ভাষা, সাহিত্য এবং যা কিছু কুরআন-সুন্নাহকে বুঝতে সাহায্য করে তার উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে এ ব্যবধান উম্মাহর মধ্যে সুস্পষ্ট বিভাজন সৃষ্টি করে। এক দিকে ছিল ব্যক্তি, অপর দিকে ছিল পুরো সমাজ। প্রাচীনপন্থি ইসলামী বিজ্ঞজন ব্যক্তির উপরেই তাদের সব মনোযোগ নিবদ্ধ করলেন, বিশেষ করে ইবাদত-বন্দেগী, আচার-অনুষ্ঠান, ব্যক্তিজীবন, সংশ্লিষ্ট আইন এবং কাজ-কারবার, লেনদেন ইত্যাদি তাদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। এভাবে দেখা গেল ব্যক্তি মুসলমানের জীবনের অধিকাংশ বিষয় আইনজ্ঞদের মতামত ও তাদের আইনগত ঘোষণা বা ফতওয়ার সাহায্যে পরিচালিত হতো। সামগ্রিকভাবে সমাজের বিভিন্ন বিষয় রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড, রাজপরিবার এবং সামন্ত বা প্রভাবশালী গোষ্ঠীর এখতিয়ারভুক্ত বিষয়ে পরিণত হয়। এসব নেতা ও কর্তৃপক্ষ সাধারণ মানুষ এবং মনীষীদের চোখে অবিশ্বস্ত ও সন্দেহভাজন বলে পরিগণিত হয়। বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিচ্ছিন্নতার এ পরিবেশ বর্তমান থাকার কারণে প্রাচীনপন্থি পণ্ডিতবর্গ রাজনীতি এবং সাধারণভাবে সমাজ সম্পর্কে খুবই অকিঞ্চিতকর ও অসম্পূর্ণ ধারণা লাভ করেন। তারপর বিজ্ঞজনদের দিক নির্দেশনা ও জ্ঞানের অনুপস্থিতিতে উম্মাহর নীতি এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বুদ্ধিজীবী নেতৃত্বের বাস্তব সহায়তায় প্রকৃত ইসলামী প্রতিষ্ঠান কখনো গড়ে ওঠেনি। এর স্থলে যেসব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে

www.pathagar.com

সেগুলো দুর্নীতিপরায়ণ লোকদের কবলে পড়ে। ফলে সমগ্র উম্মাহর অস্তিত্ব, উম্মাহর সন্তুষ্টি, রাষ্ট্র বা সমাজ কখনো মুসলিম জাতির অন্তরাত্মায় আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি।

এ ব্যবধানে আরো একটি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তা হলো ইসলামের শিক্ষা ও নীতির প্রতি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ক্ষীণ অঙ্গীকার এবং কোনো আনুষ্ঠানিক অথবা সমন্বিত শিক্ষার অথবা সাংস্কৃতিক কর্মসূচির অভাব। উম্মাহ এবং তার প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়ে। একই সাথে দুর্বলতা দেখা দেয় নেতৃত্বের ভূমিকায় ও তার আইনে। শেষ পর্যন্ত উম্মাহ বিভক্ত হয়ে পড়ে বিভিন্ন ফেরকা, গোত্র, ভূমিদাস এবং পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন নানা গ্রুপে। ধর্ম বা বিবেক তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি।

এসব কারণে ইসলামী চিন্তাধারা ও শিক্ষার মূল বিষয় রূপান্তরিত হলো ভয়, বাধ্যবাধকতা ও আত্মসমর্পণে। নানাভাবে এটি অনুশীলন ও প্রচার করা হতো এবং উৎসাহিত করা হতো উম্মাহর সকল স্তরের রাজনৈতিক, সামাজিক ও বুদ্ধিজীবী নেতৃত্বের ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়।

ওহী ও যুক্তির দ্বন্দ্ব

বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা মোকাবিলার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ফলাফলের মধ্যে ছিল যুক্তি ও ওহীর মধ্যে একটি কাল্পনিক সংগ্রামের অস্তিত্ব। এ লড়াইয়ের ফলে সৃষ্টি হলো ফিকহ্ শাস্ত্র এবং ইলমুল কালামের মধ্যে এক অস্বাভাবিক ভাঙন বা ফাটল। এ ভাঙন বাহ্যিক চেহারা বা কোনো সুনির্দিষ্ট বিশেষ তত্ত্বের মধ্যে সীমিত ছিল না, কারণ এটি ছিল একটি মারাত্মক বুদ্ধিবৃত্তিক ভাঙন। একদিকে ধর্মের ধারণা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং অপরদিকে সমাজ এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সম্পর্কের উপর এটা গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এর একটি ফল হলো, এ ধর্মতত্ত্ব বিদ্যা দার্শনিক যুক্তি এবং যুক্তিবাদী বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে (অধিকাংশ সময়ে অদৃশ্য জগতের সাথে সম্পর্কিত অধিবিদ্যামূলক বিষয়াদি নিয়ে)। ইসলামী মননশীলতার বিষয়গুলোর সাথে এগুলোর কোনো বিষয় প্রাসঙ্গিক ছিল না। এ ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্ক ও কসরতবাজী ক্রমে ক্রমে মুসলিম মননকে নিঃশেষ করে দেয় এবং সত্যিকার ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিকে ঝাপসা করে দেয়। এভাবেই মুসলিম মনন বা বোধশক্তিকে দৃশ্য ও অদৃশ্য বিষয় আলোচনায় নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। (অর্থাৎ ওহী, যুক্তি, ঈমান, তকদীর ও স্বাধীন ইচ্ছা, আল্লাহর নাম ও গুণাবলী এবং উম্মাহর চিন্তাধারা বা তার ঈমানের ক্ষেত্রে কোনোরূপ অবদান রাখতে পারেনি– এমনি ধরনের নিরর্থক বুদ্ধিবৃত্তিক কূটতর্ক)। ফলে ফিকহ শাস্ত্র এবং সাধারণভাবে ইসলামী চিন্তাধারা উম্মাহর জন্য সামাজিকভাবে ও সাংগঠনিক দিক থেকে অগ্রগতি সাধন বা উন্নয়নের সহায়ক লক্ষ্য ও নীতি নির্ধারণের জন্য সুস্পষ্টভাবে কোনো ধর্মতাত্ত্বিক ভিত্তি উপস্থাপন করতে পারেনি। এভাবে ইসলামী মন ও চিন্তাধারা একটি সুনির্দিষ্ট ও সীমিত পদ্ধতি বিজ্ঞানের কাছে বন্দী হয়ে যায় যার ফলে উন্নয়ন ও

www.pathagar.com

বিকাশের পথে এগুতে পারেনি এবং পরিবর্তনশীল বাস্তবতা, চাহিদা ও সম্ভাবনার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারেনি।

বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যকার এ ব্যবধান ইসলামী চিন্তাধারার আরেকটি পুরনো বিষয়, যার এখনো কোনো সমাধান করা যায়নি, তা হলো কুরআন ও সুন্নাহর মূল পাঠ বাতিল বা মনসুখ করা। এ ব্যাপারে ব্যাপকভাবে মনে করা হয় যে, ওহীর মাধ্যমে সর্বশেষ যে আয়াতসমূহ পাওয়া গেছে তার মধ্যেই সঠিক আইনগত সিদ্ধান্ত বা শিক্ষা নিহিত রয়েছে এবং এর আগে নাজিলকৃত আয়াতসমূহ থেকে যে অর্থ বা সিদ্ধান্ত ইতোপূর্বে গ্রহণ করা হতো তা বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু পূর্বেকার সিদ্ধান্ত বাতিল করার সময়ে কোন্ পরিস্থিতির আলোকে সে সময় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল বা সে সময় এ ধরনের আইনের পেছনে কোন্ প্রজ্ঞা কাজ করেছিল, তা বিবেচনা করা হয়নি। এভাবে ইসলামী আইনে মনসুখের ধারণার সাথে নাসখ প্রায় সমার্থবোধক হয়ে গেল, অথচ ইসলামী আইন ও মানুষের তৈরি আইনে পরিবেশ পরিস্থিতির পার্থক্য অনুসারে সাবেক আইনের উপর বর্তমান আইন অধিক গুরুত্ব লাভ করে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে এ মতবাদ থেকে এ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, ইসলামী আইন প্রণয়নের সকল ক্ষেত্রে ও সামাজিক সংগঠনে প্রিয়নবী (সা)-এর জীবনকালের শেষভাগে মদীনা ও মক্কা বিজয়ের পরবর্তী সময়ের উদাহরণগুলো অনুসরণ করতে হবে এবং সে অনুযায়ী তা ঢেলে সাজাতে হবে। এটিকে আমরা প্রথম মাদানী যুগ থেকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করে দ্বিতীয় মাদানী যুগ বলতে পারি। প্রথম মাদানী যুগের বৈশিষ্ট্য ছিল ভয়, দুর্বলতা ও অদক্ষতা। কারণ এটি ছিল একটি বৈরী পরিবেশে সমাজ ও সভ্যতা বিনির্মাণের যুগ। আমার মতে বিশ্বনবী (সা)-এর সময়কালকে সুষ্ঠুভাবে তিনটি ভাগে দেখা যায়। প্রাথমিক পর্যায় ঃ এ সময় ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য ব্যক্তিগত পর্যায়ে তাবলীগের পদ্ধতি অনুসরণ করা হতো। এ সময়কালে ঈমানের মৌলনীতি এবং সমাজ পরিবর্তনের নীতিসমূহ সাধারণভাবে সমাজের কাছে তুলে ধরা হতো, তারপর প্রথম মাদানী যুগ এবং সর্বশেষে দ্বিতীয় মাদানী যুগ।

ক্রমাগত ওহী নাযিল এবং নবীর (সা) কাজের ধারাবাহিকতার দিকে তাকালে দেখা যায়, বিভিন্ন অবস্থা ও পরিস্থিতি মোকাবিলায় যেসব নীতি ও উদ্যোগ গ্রহণ করা হতো তা ভিন্ন ভিন্ন হলেও তাতে খোদায়ী একক উৎস থেকে উৎসারিত একই মূলনীতি মেনে চলা হতো। মক্কী জিন্দেগী বা মক্কার সময়কাল ছিল প্রচারের যুগ এবং নতুন ও উন্নত আদর্শের ভিত্তিতে সংস্কারের যুগ। এ কারণে এ যুগের সংশ্লিষ্টতা ছিল দাওয়াত, মৌলনীতি সম্পর্কিত সংলাপ ও সার্বজনীনতার সাথে। এ কারণেও রাসূল (সা) মোকাবিলার পদ্ধতি অবলম্বন না করতে অথবা শত্রুতার জবাব শত্রুতা দিয়ে না দিতে তাঁর অনুসারীদের গুরুত্ব সহকারে বলতেন। এ দুঃখ ও যাতনা ভোগ করে তাদেরকে চড়া মূল্য দিতে হলেও

www.pathagar.com

প্রাথমিক যুগের মুসলিমরা তাদের মূল কাজ সমাজ সংস্কার থেকে কখনো মুখ ফিরিয়ে থাকেননি। অধিকন্তু সাধারণভাবে বলতে গেলে এটি ছিল একটি রাজনৈতিক ইস্যু। যে বিষয় রাজনীতিবিদদের প্রভাবিত করতে পারে তা হচ্ছে রাজনীতি। অধিকন্তু সহিংসতার জবাবে সহিংসতার আশ্রয় নিলে সারা বিশ্বের সামনে আগ্রাসী শক্তির মুখোশ খুলে যায় এবং বিবাদ-বিসম্বাদ ও মতবিরোধের বিষয়টি ছোট হোক বা বড় হোক, সবার মনোযোগ ও সহানুভূতি আকর্ষণ করে।

প্রথম মাদানী যুগ হোদায়বিয়া সন্ধির আগের যুগ। এ সময় আরবের বিভিন্ন গোত্র ইহুদী জোটের ষড়যন্ত্রের মুখে তাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। আমরা দেখি এ সময়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল শৃঙ্খলা ও ত্যাগ এবং শত্রুদের ভীত করে তোলা এবং মুসলমানের বিরুদ্ধে সহিংসতা অবলম্বন থেকে চিরতরে নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে শক্তির জবাবে শক্তি প্রয়োগ করা।

দ্বিতীয় মাদানী যুগ ছিল হোদায়বিয়া সন্দির পর থেকে নতুন মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রের সব দুশমনের উপর নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তারের সময় পর্যন্ত। এর বৈশিষ্ট্য ছিল নয়া সমাজ ও তার অগ্রগতি হেফাজত করার লক্ষ্যে সাংগঠনিক ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করা। এ আমলেই নতুন মুসলিম রাষ্ট্র তার শত্রু পক্ষ ও প্রতিবেশী দেশগুলোর প্রতি ক্ষমা ও সমঝোতার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল।

এখানে আমরা দেখি কী উপায়ে ও পদ্ধতিতে বিভিন্ন কাজ করা হতো এবং সে সময়ের আইন প্রণয়নের ধরন কী ছিল। যদিও এগুলো সম দৃষ্টিভঙ্গি ও লক্ষ্যের প্রতিনিধিত্ব করেছিল এবং সে সময়ের বাস্তবতা ও উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নীতিমালার প্রতিফলন, সে ধরনের অবস্থা বা পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করা, তাতে দিক নির্দেশনা প্রদান করা এবং তাতে অর্থবহ পরিবর্তন নিয়ে আসাই ছিল এসবের লক্ষ্য।

ঐ সময়ে যে কোনো কাজ ও আইন প্রণয়নে সুনির্দিষ্ট স্বাভাবিক অবস্থা বিবেচনা না করার ধারণা উম্মাহর বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটনের অনুরূপ হলে ইসলামের দিক নির্দেশনা ও বাস্তবতা, পরিবেশ ও পরিস্থিতি এবং প্রত্যেক পর্যায়ের উপযোগী নীতি ও কৌশল থেকে বিচ্ছিন্ন একটি তাত্ত্বিক বিষয়ে পরিণত হবে। কাজেই একটি পুরোপুরি একাডেমিক ও আইনগত দৃষ্টিভঙ্গিতে নাসখ মতবাদকে পরবর্তীর সাহায্যে পূর্ববর্তীকে বাতিল করার মতবাদ হিসাবে ধরে নেয়া হলে কঠোরভাবে সংসদীয় আইনে পরিচালিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বাইরে অন্য কোথাও এটি প্রযোজ্য হবে (এর সুস্পষ্ট কারণ, একমাত্র এসব প্রতিষ্ঠানেই আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ উপযোগী প্রতিষ্ঠিত দিক নির্দেশনা রয়েছে)। এভাবে পরবর্তীতে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে যে আইনই প্রণয়ন করা হোক না কেন তা স্বাভাবিকভাবে আগে প্রণীত আইনকে আইনগতভাবে বাতিল করে দেবে। তবে এ বিষয়টি ওহীর ব্যাখ্যা করার বিষয় থেকে পুরোপুরি ভিন্ন। অথবা যে কোনো সময়ে ও যে কোনো স্থানে মানবিক বিষয়ে তার কাছে দিক নির্দেশনা প্রার্থনা করার বিষয়ও এটি নয়।

www.pathagar.com

নাসখের ধারণা সম্পর্কে আগে থেকেই আমরা জানতে পেরেছি এটি ইসলামী চিন্তাধারার পদ্ধতি বিজ্ঞানে একটি স্থবির উপলব্ধির প্রতিফলন। কারণ এ মতবাদ কুরআনের সাধারণ ও বিশ্বজনীন শিক্ষার বিপরীতে সুন্নায় বিভিন্ন বিষয়ে যে সুনির্দিষ্ট ও বিশেষ বিবেচনা করা হয়েছে তার মধ্যকার পার্থক্য লক্ষ্য না করেই অগ্রসর হয়। নাসখের ঐতিহ্যগত ধারণায় কুরআনের নাজিলকৃত ব্যাখ্যা বা প্রয়োগ প্রক্রিয়ায় সময় ও স্থানের যে উপাদান রয়েছে তা মোটেই গ্রাহ্য না করার বিষয়ে শামিল রয়েছে। নাজিলকৃত অংশগুলো তুলনা ও বিশ্লেষণের বেলায়ও সময় ও স্থানের উপাদানগুলো বিবেচনা করে না। আসবাব আর নুজুলের (কুরআন বিভিন্ন আয়াত নাজিলের উপলক্ষ) প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ না দেয়া এবং এ বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখার অনুপস্থিতি থেকে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়। এমনকি রাসূল (সা) কি কারণে কোন্ উপলক্ষে কি বলেছেন বা করেছেন সে সম্পর্কে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা বরং আরো কম পাওয়া যায়।

পদ্ধতিগত উসূল অধ্যয়নে ঐতিহ্যগতভাবে নাসখের যে ধারণা পাওয়া যায় (এ মতবাদ মানুষের তৈরি আইন প্রণয়ন পদ্ধতির অনুকরণে পরস্পর বিরোধিতা এবং বিলুপ্তির জন্ম দেয়) তা পণ্ডিত, চিন্তাবিদ, আইন প্রণেতা বা নেতার সংবেদনশীলতায় তাৎক্ষণিকভাবে আঘাত হানে। কারণ বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের দিক নির্দেশনা, আইনগত সিদ্ধান্ত, নীতি, ভাবধারা ও সমাধানের জন্যে নবী (সা) যুগের বিষয়ের সাথে নবী যুগের ঘটনাবলীর কিছু মিল থাকলেও গরমিলই অনেক বেশি।

আজকের যুগের মুসলিম ছাত্ররা লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবে যে, ঐতিহ্যগতভাবে নাসখের ধারণা বা মতবাদ অহীর অনেক মৌলনীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়ে পড়ছে। নাসখ আসলে ওহীর মৌলনীতিগুলোকে শুধু দ্বিতীয় মাদানী যুগের প্রাসঙ্গিক ঘটনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে তার প্রয়োগের চৌহদ্দীকে বাতিল বা সীমিত করে দিয়েছে। কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাই যে, নাসখের ঐতিহ্যগত ব্যাখ্যা এ পরিস্থিতি থেকে কাঙ্ক্ষিত সংস্কার, চারিত্রিক বিশুদ্ধিকরণ এবং প্রতিরোধ সৃষ্টিতে সক্ষম এমন শক্তির সাহায্যে অবিচার ও জুলুমের মোকাবিলার প্রয়োজনীয় প্রেক্ষিতকে এই পরিস্থিতি থেকে বের করে আনতে পারেনি। এর পরিবর্তে দাওয়ার এবং অমুসলিমদের সাথে সব ধরনের আলোচনার ক্ষেত্রে এ প্রচলিত ব্যাখ্যা প্রয়োগ করা হয়। এসব ঘটনা থেকে সামঞ্জস্য খুঁজে বের করে সম পর্যায়ভুক্তদের সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে তা জানা যায়। সৎকর্মশীলদের পাওনা আদায় করা এবং যারা ইসলামের কাছাকাছি এসে গেছে তাদের অন্তরকে কোমল করার ফলে এসব কিছুর চেতনা হারিয়ে যায়। এভাবে পরমতসহিষ্ণুতার ধারণাটি একটি শর্তযুক্ত বিষয় হয়ে দাঁড়ালো এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যবহারযোগ্য একটি মূল্যবোধে পরিণত হলো। অপরদিকে ব্যক্তির ধর্ম বিশ্বাসের স্বাধীনতা সীমিত করার বিরুদ্ধে বাঁধাধরা বিষয় হয়ে গেল।

www.pathagar.com

একইভাবে কুরআনের পরিভাষা, 'আহলে কিতাব' অর্থ এবং রাসূল (সা) যে পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন তার ব্যাপকতা হারিয়ে ফেলে এবং সকল উন্নত সভ্যতা ও ধর্মের অনুসারীদের আহলে কিতাবদের মধ্যে শামিল করা হয়নি। এর পরিবর্তে কুরআনের নাসখের ধারণার নেতিবাচক ফলাফলে দুটি উদাহরণ হচ্ছে মুসলিম ও অমুসলিমের সম্পর্কের বিষয়। দাওয়া, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, ইসলামী আইন এবং রাজনৈতিক কৌশলের উপর ভুল ব্যাখ্যার কারণে যে প্রভাব পড়েছে সে ব্যাপারে মুসলিম সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই কুরআনে বলা হয়েছে 'পৌত্তলিকদের যেখানে দেখা পাও, সেখানে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো' (৯ : ৫)। নাসখকে বাতিল বা রদ করে যে প্রাচীনপন্থি ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে তার নেতিবাচক ফলাফলের এটি একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত।

এ আয়াত দ্বিতীয় মাদানী যুগের শেষ দিকে নাজিল হয় এবং এটি সে সময়ে নাজিল হয় যখন মুসলিমরা পৌত্তলিক আরবদের উপর ক্ষমতা ও আধিপত্যকে সুদৃঢ় করে নিয়েছিল। এসব পৌত্তলিকরা প্রায় দীর্ঘ ২০ বছর ধরে মুসলিমদের এবং মুসলিম রাষ্ট্রের কূটনীতি, শান্তি প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন উদ্যোগ এবং ইসলামের মিশন ও বাণীর প্রকাশ্য বিরোধিতা, ষড়যন্ত্র এবং বারংবার চুক্তিভঙ্গের মাধ্যমে বিরোধিতা করেছে। এভাবে অবাধ্য ও উদ্ধত পৌত্তলিকরা যে পর্যন্ত ইসলামের কাছে আত্মসমর্পণ করে সংহত ও সুসভ্য মুসলিম সমাজের সদস্য না হয়, সে পর্যন্ত কুরআন তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার নির্দেশ দিয়েছে। এ ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করলে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটবে এবং তাদের আগ্রাসন বন্ধ হবে। নাসখ সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণের কারণে একটি ভুল করে অপরটির জন্য অবস্থান নেয়া যাবে না। অন্য কথায় আইনগত সিদ্ধান্তের প্রয়োগ বিশেষ পরিস্থিতির উপর সব সময় নির্ভরশীল। যাই হোক, পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে একটি অপ্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্ত বহাল রাখার জন্য পীড়াপীড়ি করা অর্থহীন, বরং নতুন পরিস্থিতি বিবেচনা করে তার আলোকে নতুন সিদ্ধান্ত কামনা করা উচিত। এমন করেই আমরা তরবারির আয়াতকে কুরআনুল করিমে অমুসলিমদের প্রতি ব্যবহারে সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যের উপর যে জোর দেয়া হয়েছে তাকে পুরোপুরি সামঞ্জস্যশীল হিসাবে বুঝতে পারি।

এ কারণে এ আয়াতের ব্যাখ্যাকে এ বিষয়ে সর্বশেষ নাজিলকৃত কালাম বলে গণ্য করা এবং রাসূল (সা)-এর চূড়ান্ত আমল হিসেবে ধরে নেয়া, বস্তুত ইসলামের পরিপূর্ণতা ও বিশ্বজনীন মিশনের বিরোধিতারই নামান্তর। প্রিয় নবী (সা)-এর ওফাত কালে নতুন ইসলামী সমাজ সমগ্র আরব উপদ্বীপে ইসলামের দুশমনদের উপর প্রকৃত অর্থেই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিল। উমাইয়া ও আব্বাসীয় খিলাফত আমলে যখন ইজতিহাদ চালু ছিল এবং প্রাচীন ফিকাহর মাজহাবগুলো প্রচলিত ছিল তখন ঐ সমস্ত শর্ত অপরিবর্তনীয় ছিল। আজকের যুগে মুসলিম সমাজ দুর্বল হয়ে পড়ায় এ শব্দটি সুনির্দিষ্টভাবে এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লিখিত ইহুদী, খ্রিস্টান এবং অগ্নি উপাসকদের ক্ষেত্রে ব্যবহারের বেলায় সীমিত হয়ে গেল।

www.pathagar.com

এ বিষয় এবং এর সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ায় আমার লিখিত The Islamic Theory of International Relations : New Directions for Islamic Methodology and Thought বইতে আলোচনা করা হয়েছে। এ বইতে সুচিন্তিত মত প্রকাশ করা হয়েছে, নাজিলকৃত ওহী এবং শরিয়াহর সিদ্ধান্তের মধ্যে দৃশ্যত যে পরস্পর বিরোধিতা বা বৈপরিত্য দেখা যায় তার দ্বারা অবশ্যই এ কথা বুঝায় না যে, এ দু'টোর একটি রহিত হয়ে গেছে। বরং এ ধরনের পরস্পর বিরোধিতা বা অসংগতির সত্যিকার তাৎপর্য হচ্ছে এ যে, মানব জীবন ও সমাজ বিভিন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে তার ভিন্ন ভিন্ন রকমের নিয়ন্ত্রণ বা বিধির প্রয়োজন হয়। তবে শরিয়াহর একটি সিদ্ধান্ত বা রায়ের প্রয়োগ বিদ্যমান পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। উদাহরণ স্বরূপ, যখন অমুসলিমরা মুসলিমদের সাথে শান্তিতে বাস করে এবং শোভন আচরণ করে তখন মুসলিমদেরও উচিত তাদের সাথে অনুরূপ আচরণ করা। কিন্তু যখন অমুসলিমরা ইসলাম ও মুসলিমদের উপর আগ্রাসন চালায় তখন মুসলিমদের পক্ষ থেকে সঠিক জবাব হবে তাদের মোকাবিলা করা, প্রয়োজনে প্রকাশ্য বিরোধিতায় লিপ্ত হওয়া। নাসখের পুরনো ব্যাখ্যার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হলো দাওয়ার কৌশল। এটি ইসলামী চিন্তাধারার অবস্থান এবং ইসলামী আইনের বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। মূলতঃ এসব ব্যাপারে দু'ধরনের চিন্তাধারা লক্ষ্য করা যায়। প্রথম দলের মতে মুসলিম বিশ্বের বর্তমান অবস্থা, মক্কী জিন্দেগী ও প্রথম মাদানী যুগের মত তাদেরকে প্রাথমিক যুগের মুসলিমদের ধর্মীয় বিষয় এবং তার প্রচার নিয়ে ব্যস্ত থাকা উচিত। কাজকারবার, লেনদেন ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের মতো বিষয়গুলো দ্বিতীয় মাদানী যুগের বৈশিষ্ট্য ছিল এবং এসব বিষয় এখন বিবেচনা করার প্রয়োজন নেই। অপর দলটি মনে করেন বর্তমান অবস্থার সঙ্গে দ্বিতীয় মাদানী যুগের অবস্থার বেশি মিল রয়েছে। এ সময় মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন। যেহেতু এ দ্বিতীয় দলটি নাসখ বলতে বোঝেন দ্বিতীয় মাদানী যুগের সিদ্ধান্ত ও নীতি প্রাথমিক যুগের সিদ্ধান্ত ও নীতিকে বাতিল করে দিয়েছে, সেহেতু তারা দ্বিতীয় মাদানী যুগের শিক্ষা মেনে চলাকেই তাদের জন্য যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন। মক্কা নগরীতে শুরুতে যারা মুসলমান হয়েছিলেন তারা যেসব পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন, যে সময়ে তারা প্রথম ইথিওপিয়া হিজরত করলেন, প্রথম মাদানী যুগের হোদায়বিয়া সন্ধি এবং মক্কা বিজয়ের আগে, শত্রুপক্ষ যখন তাদের মৃত্যু ও ধ্বংসের হুমকি দিচ্ছিল, বর্তমান যুগের মুসলিমরাও অনুরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। সমসাময়িক যুগের মুসলিমরা ইসলামের শিক্ষাকে আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করলে এবং হোদায়বিয়ার সন্ধি ও মক্কা বিজয়ের আগে রাসূল (সা) কোন্ বিষয়ে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন, তাঁর নীতি, সংগঠন ও রণকৌশল কি এবং কেমন ছিল তা ভেবে দেখলে, মজলুম, দুর্বল ও অস্ত্রশস্ত্র ও পার্থিব সামর্থ্যহীন জাতিগুলো শক্তিশালী দুশমনের চ্যালেঞ্জ কত দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করতে পারে তা বেশ ভালোভাবেই শিখতে পারবে। বিশ্বনবী (সা) সে সময়কালের প্রতিকূল অবস্থায় নিপতিত সমাজের অর্থনৈতিক,

www.pathagar.com

রাজনৈতিক এবং সামরিক উন্নতি ও প্রগতির জন্য যেসব নীতি ও পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন তা থেকে এ কালের দুর্বল ও নির্যাতিত মুসলিমদের অনেক কিছুই শেখার আছে। অবশ্য আমাদের সন্দেহ নেই যে, প্রাথমিক যুগের কিছু সিদ্ধান্ত বা ফতোয়া এবং শিক্ষা পরবর্তীযুগে পরিবর্তন করা হয়েছিল। তবে আমাদের এ কথাও বিশ্বাস করতে হবে যে, ধর্ম ও মিশন বাস্তবে একই বিষয়ের দু'টি অংশ। কাজেই এ কথা বললে ভুল হবে যে, কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বর্তমানে প্রায় মক্কী যুগের সময় অতিক্রম করছে এবং সে কারণে সে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে পরবর্তী মাদানী যুগের শিক্ষা মেনে চলতে হবে না। বরং আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা এবং মিশরের নমনীয়তা কয়েকটি সুস্পষ্ট পৃথক পর্যায় অতিক্রম করেছে এবং আমরা ঐসব স্তর বা পর্যায়কে বর্তমান সময়ের সাতে তুলনা করতে পারি না। কারণ, ইতিহাসের যে কোনো সময়কে বিকৃত করে একটি সাদৃশ্য ঘটনাকে জোর করে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা হবে অযৌক্তিক। কারণ ওহী নাজিল পর্ব সম্পূর্ণ হওয়ার পর যারা এসব করছে তাঁদের সাথে যারা ওহী নাজিল হওয়ার সময়ে জীবিত ছিলেন তাঁদের কোনো তুলনা হতে পারে না।

১. প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে কতগুলো বিশেষ বিষয় এবং কতগুলো সাধারণ বিষয়। ইসলামী চিন্তাধারার পদ্ধতিবিজ্ঞান, সমাজ গঠনে স্থান-কালকে বিষয় ধরে নিয়ে আইনতগত সাদৃশ্য বা কিয়াসের মাধ্যমে তাদের শতাব্দীকালের সিদ্ধান্ত বা রায়কে অনুসরণ করার বিষয়; এমনকি না বুঝেই সফলদের শ্রদ্ধা করা সম্পর্কিত আমাদের যে মিথ্যা বোধ রয়েছে তা একটি চাবুকে পরিণত হয়েছে এবং আমরা যেন নিজেরা নিজেদেরকে এ ব্যাপারে বেত্রাঘাত করছি।

২. এ ধরনের নিষেধাজ্ঞার পেছনে যে প্রজ্ঞা কাজ করছিল তা ছিল মালিকদেরকে তাদের জমি উৎপাদনশীল করে গড়ে তোলার জন্য উৎসাহিত করা। প্রাচীনপন্থি ফকিহরা এ নিষেধাজ্ঞাকে রিবা হিসেবে বুঝেছেন। তাঁদের মতে চুক্তি করার সময় একটি শস্য যার পরিমাণ জানা নেই তার একটি অংশ দেয়ার জন্য চুক্তি হচ্ছে এক ধরনের Deferred payment. এটি একটি নিষিদ্ধকৃত নসিয়াহ, যার অর্থ একটি অজ্ঞাত জিনিস বা বস্তুর জন্য কোনো কিছু প্রদান করা।

৩. ফকিহগণ প্রায়ই এ ধরনের সিদ্ধান্তসমূহ রাজপরিবার বা ধনী ভূমি মালিকদের চাপে পড়ে নিতে বাধ্য হতেন।

৪. এসব এবং অন্যান্য বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, লেখকের Introduction to Islamic Economic Theories : Contemporary Aspects of Economic and Social Thinking in Islam, American Trust Publications Plainfield Indiana-1976.

www.pathagar.com

পদ্ধতিবিজ্ঞান ও চিন্তাধারায় এ ধরনের ত্রুটি বিচ্যুতির ফলে দেখা গেল অভিজ্ঞ মুসলিম অর্থনীতিবিদগণ যখন ইসলামী অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয়কে পেশাজীবীদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেন, তখন মুসলিম আর্থিক নীতিমালায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন একটি প্রাতিষ্ঠানিক ও মননশীল ধারার সূচনা করলো। আশা করা যায় যে, ইসলামী অর্থনীতির চিন্তা ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য সমসাময়িক যুগে একটি আন্দোলন শুরু হয়েছে। এভাবে সামনে অগ্রসর হলে ইসলামী চিন্তাধারার এ ধরনের ত্রুটিপূর্ণ ধারণা সংস্থা ও অগ্রগতির উদ্যোগের পথ আগলে দাঁড়ায়। এ কারণেই আমরা দেখি যে, সমসাময়িক যুগের পণ্ডিত বা মনীষীদের আলোকিত ধারণা ও চিন্তাধারা প্রাচীন পাঠকদের হাতে বিকৃত হচ্ছে। তাদের মতে সেসব চিন্তাধারা বা তত্ত্বের সঙ্গে অবশ্যই পূর্ববর্তীদের চিন্তাধারা বা তত্ত্বের মিল থাকতে হবে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, এটা এখন স্পষ্ট যে, ইসলামের ঐতিহ্যানুসারী পদ্ধতিবিজ্ঞান সে যুগের রাজনৈতিক ও সভ্যতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সমাধানের জন্য যথেষ্ট ছিল। এই পদ্ধতি বিজ্ঞানের অনেকগুলো ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল, একটি ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণ হলো উম্মাহকে অগ্রগতি এবং উন্নয়নের বিষয়সমূহ সম্পর্কে অবহিত করার জন্য সাহায্য না করে তাকে তার দীর্ঘস্থায়ী সমস্যাগুলোর আবর্ত থেকে বের করে আনার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালানো। যদিও পুরনো মতামতের মধ্যে সমাজ বিজ্ঞানের অনুসন্ধানের জন্য অত্যাবশ্যকীয় পদ্ধতিবিজ্ঞানের বীজ উপ্ত রয়েছে, কিন্তু বংশ পরম্পরায় পন্ডিতেরা এ বীজগুলো কখনো বপন বা লালন করার অবকাশ পাননি। আমাদের জন্য এটা জানা জরুরি যে, বর্তমান কালের সমস্যাগুলোর মোকাবিলায় পুরনো দিনের পদ্ধতিবিজ্ঞান কোথায়ও খাপ খাওয়াতে পারছে না। কারণ এ বিষয়টি অকার্যকর হওয়ার পেছনে শুধু পদ্ধতি বিজ্ঞানের ত্রুটিই দায়ী নয়, বরং পুরনো দিনের পন্ডিতেরা যে ত্রুটিযুক্ত প্রচেষ্টা চালিয়েছেন তাও দায়ী।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিগত বিষয় সম্পর্কে মনে রাখতে হবে। সে বিষয়টি সুন্নাহর মূল পাঠ্যাংশের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আশ্চর্যের বিষয় যে, সুন্নাহ সংকলন ও সংরক্ষণের পর এত সময় অতিবাহিত হলেও এখনো পণ্ডিতগণ এর বিশুদ্ধতা ও প্রামাণ্যতার বিষয় নিয়ে বিভিন্ন ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হন। অনুরূপভাবে আগেকার হাদিস বিশারদগণ যে উন্নত মানের টেকনিক্যাল শব্দার্থ বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটিয়েছেন, তা সমসাময়িক ইসলামী চিন্তাবিদগণের বিভ্রান্তির অবসান ঘটাতে পারেনি। ফলে যখন কোনো গ্রন্থকার কোন হাদিসের উদ্ধৃতি দেন তিনি আপনা আপনিই সমালোচনার সম্মুখীন হন এবং পাঠককে অপ্রয়োজনীয়ভাবে উক্ত হাদিসের সনদ সম্পর্কিত খুঁটিনাটি বিষয়ে বিরোধের মধ্যে ব্যস্ত রাখেন। ফলে লেখক যে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন তা থেকে তাদের দৃষ্টি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেয়ে বেশি কিছু করতে পারেননি। সুতরাং এটি

www.pathagar.com

আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি যে, প্রামাণ্য সুন্নাহর মূল পাঠগুলি হুবহু সংগ্রহ করা, শ্রেণীবিন্যাস করা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে পণ্ডিত, গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের নাগালের মধ্যে নিয়ে আসা। এ সব মূল পাঠগুলির অবশ্যই সূচী তৈরি করতে হবে এবং উপাদানের গুরুত্ব অনুধাবনের ব্যর্থতা দূর করতে হবে এবং যুক্তি ও প্রকৃতির সম্পূর্ণ জ্ঞানের উৎসরূপে ওহীর ধারণা গ্রহণ করতে হবে যাতে মানবজাতি পৃথিবীতে সৎকর্ম করার ভূমিকা পূর্ণরূপে পালন করে যেতে পারে। বিভিন্ন দেশ ও কাল, ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে পরিবেশ পরিস্থিতি, সুযোগ-সুবিধা, চাহিদা-প্রয়োজন ও চ্যালেঞ্জের পার্থক্য থাকবে। সমসাময়িক যুগের বিভিন্ন সমাজের মধ্যে চিন্তার পার্থক্য থাকবে যাতে যুগ থেকে যুগান্তরের পার্থক্যকে দেশ থেকে দেশান্তরের পার্থক্যের তুলনায় খুব কমই তাৎপর্যবহ বলে মনে হবে। এভাবে বিষয়টির প্রতি আমরা যখন তাকাই তখন কোনো পরিস্থিতি, অবস্থা বা সময়কে মক্কী বা মাদানী অভিধায় অভিহিত করার অবকাশ থাকে না।

বরং এ ব্যাপারে উচিত হবে সব পরিস্থিতিকেই বাস্তবতার নিরিখে মুল্যায়ন করা এবং এ মূল্যায়নের ভিত্তি হবে প্রাকৃতিক আইন এবং শরিয়াহর উচ্চতর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও নীতি। অতীত যুগের সেকেলে এবং চাপিয়ে দেয়া আইনগত সাদৃশ্য ঘটনা বা কিয়াসের ভিত্তিতে না হয়ে আমাদের প্রয়োজন সমসাময়িক সমাজের পরিস্থিতি বা অবস্থার উপযোগী প্রাণশক্তিতে ভরপুর চিন্তাধারার বুনিয়াদে গঠিত একটি গতিশীল ফিকাহ। এভাবেই প্রত্যেক ব্যক্তি ও সমাজ শরিয়াহর উদার ও বিস্তৃত নীতির আলোকে নিজস্ব বিশেষ স্তর পার হয়ে সম্মুখে এগুবে।

বর্তমানের উম্মাহ যেসব সমস্যায় আক্রান্ত, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে রিবা (সুদ) সমস্যা। এ বিষয়ে মুসলিম পণ্ডিত ও ছাত্ররা সমসাময়িক যুগে ঐতিহ্য অনুযায়ী যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তাতে তারা হাদিসের মূল পাঠের কড়াকড়ি অনুসরণের সাথে সাথে আইনের প্রকৃত পরিবর্তন ঘটাতে পারেন।

রফী ইবনে খুদাইজ বর্ণিত হাদিসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এমনটি হয়েছে। এ হাদিসটিতে প্রিয়নবী (সা) একজন জমির মালিককে উৎপাদিত শস্যের সমানুপাতিক অংশের বিনিময়ে একজন কৃষকের কাছে জমি ভাড়া দিতে নিষেধ করেছিলেন। এসব প্রাচীনপন্থি ফকিহরা মত প্রকাশ করেছেন যে, জমির মালিক কৃষককে বীজ সরবরাহ করলে তিনি আইনসম্মতভাবেই ফসলের একটি অংশ নিতে পারেন। প্রাচীনপন্থি ফেকাহবিদদের আরেকটি গ্রুপ যে মত প্রকাশ করেন তাতে শরিয়াহর উচ্চতর অর্থনৈতিক লক্ষ্য এবং প্রজ্ঞাকে বিসর্জন দেয়ার শামিল। তবে তা শুধু হাদিসে বর্ণিত রিবা আল ফযলের (সোনা, রূপা, লবণ) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। তারা বলেন, ব্যাপক ক্ষেত্রে এর প্রয়োগের প্রয়োজন নেই।

আবু সাইদ খুদরী (রা) এবং আরো কয়েকজন এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তাদের বর্ণনা অনুযায়ী এতে নবী করিম (সা) বলেছেন, সোনার জন্য সোনা, রৌপ্যের জন্য রৌপ্য,

www.pathagar.com

জবের জন্য জব, গমের জন্য গম, খেজুরের জন্য খেজুর, লবণের জন্য লবণ একই পরিমাণের এবং এক হাত থেকে আরেক হাতে। যে কেউ এর বৃদ্ধি করে অথবা বাড়ানোর নির্দেশ দেয় সে যেন সুদ নিল।

কুরআনের প্রাসঙ্গিক নির্দেশনা এবং নবী করিম (সা)-এর আমলের আলোকে এটি যথেষ্ট নয়। অর্থনৈতিক বিষয় এবং সমাজ বিজ্ঞানে মুসলিম পণ্ডিতদের সীমিত দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতার কারণে এসব ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা দিয়েছে। মুসলিম পণ্ডিত ও ছাত্রদের প্রচেষ্টার কারণে এ শব্দের অর্থ ও তাৎপর্যের ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী অনুশীলন করা হয়েছে। বর্তমানে এ একটি মাত্র বিষয়ে ২০টিরও বেশি চিন্তাধারার অনুসারী রয়েছে।

লক্ষণীয় যে, বেশ কয়েকটি চিন্তাধারার অনুসারীরা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য হাদিসকে এড়িয়ে গেছেন। অথচ এ হাদিসকে ব্যাপক অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে রাসূল (সা)-এর অর্থনৈতিক নীতিসমূহের পেছনে কী যুক্তি ছিল এবং তা কোন্ কোন্ স্তর বা পর্যায় অতিক্রম করেছে তার অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে দাঁড়াত। উসমান ইবনে জাহেদ (রা) বর্ণিত এ হাদিসে দেখা যায় ছয়টি সমজাতীয় পণ্যের বিনিময় ক্ষেত্রে রিবা কীভাবে Deferred Payment এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতি বিজ্ঞানের কারণে কয়েকটি পুরনো চিন্তাধারার অনুসারীরা আইনগত চাতুর্যের প্রাণশক্তি ও সর্বাত্মক রূপ নিয়ে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে।

পদ্ধতিবিজ্ঞানের আরেকটি ত্রুটি যারা এটি প্রয়োগের প্রচেষ্টা চালান তাদের মতে পূর্ববর্তীদের কথা এবং মতামতও কম পবিত্র নয়। পূর্ববর্তীদের বোধশক্তি, ইজতিহাদ এবং ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে সত্য হবে এগুলোর মধ্যে কোনো কোনোটিকে ঐতিহ্যানুসারীগণ ওহীর অবস্থানে উন্নীত করেছেন। সুতরাং স্থান কালের পরিপ্রেক্ষিতে মানবীয় সীমাবদ্ধতার পরিবেশ স্বীকার করে নিলেও খোদায়ী ওহী ছাড়া আর কোনো কিছুই পবিত্র নয়। এ মর্মে তত্ত্বগতভাবে নিশ্চিত হওয়ার পরও আমরা দেখতে পাই মুসলিমরা সফল হয়েছে বা পূর্বর্তীদের লেখা থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। এগুলো থেকে সমসাময়িক সময়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রামাণ্য ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি বা প্রেক্ষিত বের করার উদ্দেশ্যে নয় বরং আমাদের অবস্থা বা পরিস্থিতিকে তাদের অবস্থা বা পরিস্থিতি হিসাবে বিবেচনা করতে হবে।

ইসলামের প্রথম বিজয় যুগের পর উম্মাহর উপর যে দুর্যোগ নেমে আসে যে বিপর্যয়ের ফলে খেলাফতের পতন হয় তা ইসলামী চিন্তাধারার কারণে নয়, এমনকি রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভুলভ্রান্তি বা বাড়াবাড়ির কারণেও নয়। বরং দুর্যোগ ও বিপর্যয়কে পতনের প্রধান কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। সঠিকভাবে ইসলামী জীবন ধারার সাথে একাত্ম হওয়ার আগেই বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও জাতির ইসলামী সমাজে প্রবেশ অথবা (ইসলামের আদর্শ ও লক্ষ্য এবং মহৎ মূল্যবোধ সম্পর্কে নিজেদের শিক্ষিত করে তোলার

www.pathagar.com

আগেই ইসলামী সমাজে শামিল হওয়ার ঘটনা) নতুন রাজনৈতিক নেতৃত্ব ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত ছিল সেভাবে গড়ে ওঠেনি। এর পরিবর্তে নতুন রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সামাজিক নেতৃত্ব পুরনো প্রাক-ইসলামী জীবনধারা ও নতুন জীবনধারার এবং অদ্ভুত জোড়াতালি দেয়া ব্যবস্থার প্রতিভূ হয়ে গেল। এ কারণে বিশেষ করে রাজনৈতিক ও বুদ্ধিজীবী নেতৃত্ব পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর ইসলামী চিন্তাধারার কার্য উপযোগিতা কখনো প্রশাসন বা অসামরিক বিজ্ঞানে প্রসারিত হয়নি, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

এসব কিছু সত্ত্বেও প্রাথমিক যুগে সে চিন্তাধারার ফলে যা অর্জিত হয়েছিল বা যে সফলতা এসেছিল তা মানব জাতির জন্য আলো, দিক নির্দেশনা ও জ্ঞান দানের জন্য যথেষ্ট ছিল। বর্তমান মুসলিমগণ পূর্ব পুরুষদের সাফল্যের প্রেক্ষাপটে যা অর্জন করতে পারেনি সে জন্য তাদের দোষারোপ করার কোনো যৌক্তিক কারণ থাকতে পারে না।

অবাক হওয়ার কিছুই নেই যখন আমরা দেখি যে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি আচ্ছন্ন ও অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং ইসলামের মৌলিকত্ব বা সৃজনশীলতার শক্তি এমনভাবে নিঃশেষ হয়ে গেল এবং শেষ পর্যন্ত তা পুরোপুরি দৃশ্যপট থেকে অপসৃত হয়ে গেল। উম্মাহর চিন্তাধারা শুধু নিছক অনুষ্ঠানের অন্তঃসারশূন্য বুলি, শ্রদ্ধাষ্পদ উত্তরাধিকারে রূপান্তরিত হলো, কিন্তু পরবর্তী প্রজন্ম তাকে প্রচন্ড ভাবে ভুল বুঝল। এভাবে দেখা যায় সাধারণভাবে মানবজাতি এবং বিশেষভাবে উম্মাহর কল্যাণে ইসলামী চিন্তাধারার সাফল্যে আমরা গর্ব অনুভব করছি। বাস্তবিকই আমাদের ইতিহাসের কোনো অর্জন বা সাফল্যকেই ইসলামের অবদান, তার চিন্তাপদ্ধতি, সভ্যতা ও সংস্কার ভিন্ন অন্য কিছুর ফলশ্রুতি হিসাবে দেখা যায় না। সুতরাং এটির যা দেয়ার সামর্থ্য ছিল তার সব কিছু দিতে না পারলেও এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তার পথে বিস্তর বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও সে অনেক কিছুই উপহার দিয়েছে। আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে, আমাদের ক্ষেত্রে যা কিছু ঘটেছে অন্য জাতি ও সম্প্রদায়ের বেলায়ও তা ঘটে থাকে। কিন্তু জাতিসমূহের অগ্রযাত্রা যখন ব্যাহত হয় তখন প্রয়োজন পড়ে তাদের মৌলিক ও বিশুদ্ধ নির্ভেজাল দৃষ্টিভঙ্গি পুনরায় ফিরিয়ে আনার, যাতে তারা নতুন সকল ধরনের সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত থাকতে পারে।

সুন্নাহর এ ধরনের শ্রেণীবিন্যাস নিম্নোক্তভাবে সাজানো হবে :

১. যে সব হাদিস সনদের দিক থেকে বিশুদ্ধ এবং অর্থের দিক থেকে সুস্পষ্ট সেগুলিকে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

২. সনদের দিক থেকে বিতর্ক থাকলেও অর্থের দিক থেকে সুস্পষ্ট হলে সেসব হাদিসকেও প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

৩. যেসব হাদিস বিশুদ্ধতা অথবা সনদ সম্পর্কে যাই বলা হোক না কেন, অর্থের দিক থেকে প্রশ্নাতীত নয়, অর্থাৎ তাদের অর্থ কোনো না কোনোভাবে শরিয়াহর নীতি ও উদ্দেশ্যের সাথে বিরোধী বলে মনে হয়।

www.pathagar.com

৪. যেসব প্রমাণ হাদিসের সনদের দিক থেকে সন্দেহজনক এবং অর্থের দিক থেকে বিরোধপূর্ণ সেগুলিকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করার জন্য বিবেচনায় আনা যাবে না।

পদ্ধতিবিজ্ঞান সংক্রান্ত এ বিষয়টির গুরুত্ব সুন্নাহর অসাবধান ব্যবহারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, কারণ অনেক ক্ষেত্রে মুসলিম মন ত্রুটিপূর্ণ অগভীর বিষয় নিয়ে অভিভূত হয়। ফলে যখন সে কোনো ত্রুটিপূর্ণ বিষয়কে ত্রুটিহীন বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে, সে তখন বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে না এবং প্রতিটি বিষয়কে তার যথার্থরূপে আবিষ্কার করতে পারে না। সবশেষে দেখা যায় মুসলিম মন, চিন্তাধারা এবং পদ্ধতিবিজ্ঞান যখন কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত নীতি গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে তখন তার মন, মূল্য ও উপযোগিতা বিলীন হয়ে যায়। তাহলে এটা সুস্পষ্ট যে, চিন্ত াধারার নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সচেতন এবং শরিয়তের নীতি, মূল্যবোধ সম্পর্কেও অনুরূপভাবে সজাগ থাকার মধ্যেই রয়েছে ওহী, বিশ্বনবী (সা)-এর বাণী এবং শরিয়তের সব বিকৃতি ও ভ্রান্ত উপস্থাপনা থেকে সংরক্ষণের প্রকৃত মাপকাঠি। একইভাবে এসব গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠিই মুসলিম মন ও পদ্ধতিবিজ্ঞানের স্বাধীনতা ও বিশুদ্ধতার গ্যারান্টি দিতে পারে। অধিকন্তু মুসলিম মন ও পদ্ধতিবিজ্ঞানের হেফাজতের কাজটি খোদ ইসলামের হেফাজতের শামিল।

সুন্নাহর ক্ষেত্রে যা সত্যি ঐতিহ্যধারার মাধ্যমে প্রাপ্ত সাহিত্যকর্মের বেলায় তার ব্যতিক্রম নেই। আমাদের পুরো-সাহিত্যে বিদ্বজ্জনদের অবাধ প্রবেশাধিকার থাকবে সে অধিকার উপলব্ধির ও অধিগত করার অধিকার। পূর্বপুরুষের কাছ থেকে আসা এ সাহিত্যকর্ম অবশ্যই বিশ্লেষিত হতে হবে এবং এমন আঙ্গিকে তা উপস্থাপন করতে হবে যেন বিজাতীয় প্রভাব বৃদ্ধি সত্ত্বেও ইসলামের সরল সহজ ও মহান শিক্ষাগুলো আলোয় ঝলমল করে ওঠে। এভাবেই আমাদের পুরো-সাহিত্য সামগ্রিকভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক বিরোধ নবায়নের উপায় হিসেবে গণ্য না হয়ে সমসাময়িক প্রাজ্ঞল মুসলিম চিন্তাধারার সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে।

এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো (পরবর্তী কোনো অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে) ইসলামী পদ্ধতিবিজ্ঞানে ওহী ও যুক্তির ভূমিকা সম্পর্কে বিভ্রান্তি। প্রথম দিকে ইসলামের বিজয় ও সম্প্রসারণের পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে মুসলিমগণ যখন বিজাতীয় সভ্যতা ও ধর্মের (প্রধানত রোমান ও গ্রিক) সংস্পর্শে এসে তাদের দেখলেন, তখন তাঁরা ধর্মবিদ্যা সম্পর্কে গবেষণা শুরু করলেন। এমনকি নেতৃস্থানীয় ইসলামী চিন্তাবিদগণ মুতাজিলাদের এক বিরাট অংশের ন্যায় দুর্বোধ্য অধিবিদ্যামূলক গবেষণার দ্বারা প্রভাবান্বিত হলেন। বহু গোঁড়া লোক ইসলামী ব্যক্তির যুক্তি ও তার ভূমিকাকে প্রত্যাখানের চরম অবস্থানে ফেলে দিলেন। এভাবেই ইসলামী চিন্তাধারাকে কালামে ওহীর আক্ষরিক ও বর্ণনামূলক অধ্যয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হলো। এ ধরনের অধ্যয়নের প্রভাব দীর্ঘায়িতভাবে ইসলামী চিন্তাধারার উপর পড়েছে। ফলে ইসলামী চিন্তাধারার কাছে সব ধরনের যুক্তিবাদী গবেষণা সন্দেহজনক হয়ে উঠেছে।

www.pathagar.com

আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক উত্তরাধিকার : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

ইসলামী পদ্ধতিবিজ্ঞানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের এ সংক্ষিপ্ত সমালোচনা শেষে আমাদের জন্য এটি অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছে যে, সমসাময়িক ইসলামী চিন্তাধারার পরিস্থিতি এবং আধুনিক বিশ্ব ক্রমবর্ধমান হারে তার সামনে যেসব সমস্যা তুলে ধরেছে তা থেকে উদ্ভূত কিছু প্রশ্ন বিবেচনা করার জন্য আমাদের একটু স্থির হতে হবে। সবচেয়ে জরুরি প্রশ্ন হচ্ছে, বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দায়ী কে? এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে যে, এ ধরনের প্রশ্ন করার কোনো অবকাশ এখানে নেই। শুধু এটিই গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, আমরা এ দায়িত্ব বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা যুগের উপর চাপিয়ে দিতে পারবো না। এ ধরনের অনুশীলন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সমস্যার সঠিক উপলব্ধি থেকে আমাদের ফিরিয়ে রাখে এবং উম্মাহ যে অগ্রগতি লাভ করেছে তার সঠিক চিত্র গ্রহণে আমাদের বাধা দেয়। বরং আমাদের জানা প্রয়োজন, যেসব সমস্যা আমাদের মোকাবিলা করা দরকার তার মাত্রা উপলব্ধি করার জন্য সঠিক রূপরেখা কি হবে? আমরা যে পথ বেছে নিয়েছি তার রূপরেখা নির্ণয় কীভাবে করতে পারি? এসব প্রশ্নের জবাব দিতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই নিচের বিশ্লেষণগুলো করতে হবে।

১. আমাদের অতীতকে অবশ্যই বুঝতে হবে, তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তার ইতিবাচক দিকগুলোর উপর মনোযোগ দিয়ে তার উপর ভিত্তি করে উন্নতি লাভ করতে হবে। আমাদের ইতিহাসের নেতিবাচক দিকগুলোকে নিয়ে আমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী বৃথা সময় কাটিয়ে দিয়েছি এবং এটা নিশ্চিত করে বলা যায় আমরা এ ধরনের বিষয় নিয়ে আর সময় নষ্ট করতে পারি না বা এ ধরনের প্রচেষ্টায় জড়িয়ে পড়ার সময় আর নেই।

২. এগিয়ে যেতে হলে আমাদের অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে, অতীতে সদুদ্দেশ্য নিয়েই আমরা ভুল করেছি। সুতরাং এটা আমাদের জন্য মানানসই হবে যদি আমরা শুধু ইতিবাচক ও কল্যাণকর দিকগুলো গ্রহণের জন্য অতীতকে অধ্যয়ন করি। অধিকন্তু আমাদের ইতিহাসের মারাত্মক অধ্যায়গুলো পুনরায় অধ্যয়নের পক্ষে কোনো যুক্তি নেই। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, অতীতে ইসলাম, ইসলামী চিন্তাধারা ও পদ্ধতি বিজ্ঞান অনুসরণের ফলে উম্মাহ সাফল্য অর্জন করতে পেরেছিল। ইসলাম এবং শুধু ইসলামই উম্মাহকে সারা বিশ্বে তার সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করতে দিয়েছে, তথাপি এ অধ্যয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে পাঠকদের দৃষ্টি ও মনোযোগকে ভবিষ্যতের দিকে পরিচালিত করা যাতে উম্মাহ অব্যাহতভাবে উন্নতি লাভ করতে পারে এবং নতুন দিগন্তে পৌঁছাতে পারে। শুধু এ পদ্ধতিতে চিন্তা করেই উম্মাহ তার শক্তি, নেতৃত্ব ও সংস্কারমূলক প্রাণশক্তি পুনরায় ফিরে পেতে পারে।

৩. উম্মাহকে তালফিক প্রবণতা অথবা নিজেদের রাজনৈতিক, সামরিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলীতে পাশ্চাত্য সমাধান ঢুকিয়ে দেয়ার জিদ বা হঠকারিতা কাটিয়ে

www.pathagar.com

উঠতে হবে। তালফিক ও তাকলিদের পরিবর্তে আমাদেরকে অবশ্যই মৌলিক ও অখন্ড ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি বা উদ্যোগ নিয়ে আসতে হবে যা অনুকরণকে প্রত্যাখান করবে। এ সংস্কারমূলক আন্দোলন ইসলামী ধ্যান-ধারণা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটবে। চূড়ান্ত বিশ্লেষণ এ জন্যে প্রয়োজন যেহেতু ইসলামী সমাজবিজ্ঞান লালিত স্বাধীনতা ইসলামী মননশীল গবেষণা যা তার উৎস এবং অসাধারণ ভূমিকা ও দৃষ্টিভঙ্গির জন্য নির্ধারিত। শেষ কথা হচ্ছে একটি মৌলিক ও সুসংবদ্ধ মননশীল দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই সৃষ্টি করতে হবে, যা অন্যের অর্জিত সাফল্য ও কৃতিত্বের কারণে দুর্বল হয়ে পড়বে না বা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না বরং তাদের সাফল্যকে স্বাগত জানাবে এবং নিজেদের অনুপম দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষাপটে যাচাই করে সেগুলোকে উম্মাহর উপযোগী করে নেবে।

কী করে পথের দিশা খুঁজে বের করা যাবে? সুতরাং এখানে আমরা পুনরায় প্রশ্ন করতে পারি আমাদের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল কেন? কীভাবে আমরা পুনরায় আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, আমাদের শক্তি ফিরে পেতে পারি এবং চলার পথ নির্ভুল করতে পারি? আমাদের অধ্যয়ন ও গবেষণার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির নবায়নের লক্ষ্যে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া, আমাদের পদ্ধতি বিজ্ঞান সংস্কার করা এবং শক্তির উৎসগুলোকে সমৃদ্ধ করা। সমীক্ষার এ পর্যায়ে আমরা একটি উপযুক্ত স্থানে পৌঁছেছি। আমরা বর্তমানে যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছি তা পুরোপুরি সামনে রেখে এখান থেকে আমরা আমাদের চিন্তাধারা ও পদ্ধতিবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের দিকে সর্বাত্মক দৃষ্টিপাত করতে পারি।

ইসলাম এসেছিল ইতিহাসের এক অজ্ঞানতার যুগে সমগ্র সৃষ্টির কাছে হিদায়াত বা পথ নির্দেশনারূপে যখন আগের যুগের আসমানী কিতাবসমূহকে বিকৃত করা হয়েছিল এবং সারা বিশ্বে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছিল। ইসলাম এসে জনগণের মন ও মননের উপর আলো, শিক্ষা ও সভ্যতার দ্বার উন্মুক্ত করে দিলো।

ইসলামের শুরুতে প্রথম যুগে ইসলামের পদ্ধতিবিজ্ঞান ছিল একটি স্বাভাবিক ও স্বয়ংক্রিয় ধরনের পদ্ধতিবিজ্ঞান। এ পদ্ধতিবিজ্ঞান নির্ভর করতো ওহীর প্রজ্ঞা, মানবিক যুক্তির বিশুদ্ধতা এবং ইজতিহাদের উপর, যার উৎস ছিল অমলিন ও মানবীয় স্বাভাবিক প্রবণতা। এভাবেই বলা যায় সকল প্রজন্মের মানুষের জন্য প্রিয়নবী ও খলিফাদের যুগই ছিল মানবীয় চেতনার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। আজকের যুগে বিভিন্ন মুসলিম দেশে আমরা যা কিছু ভালো দেখতে পাই তা সরাসরি ইসলামী উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের কারণেই হয়েছে। কাজেই এ কথা নির্দিধায় বলা যায় মুসলিম জাহানের পতনের সবগুলো উপাদান বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ইসলামই উম্মাহর জন্য একমাত্র আশ্রয়স্থল।

www.pathagar.com

অধ্যায় তিন

ইসলামী চিন্তাধারায় পদ্ধতিবিজ্ঞানের নীতিমালা

নিজেদের প্রতি এবং ইসলামের ইতিহাসের প্রতি বিশ্ব মুসলিমের দায়িত্ব রয়েছে। তাদেরকে ইসলামের মহান আদর্শের আলোকে খেলাফতের কর্তব্য পালন ও সভ্যতার সংস্কার সাধানের কাজ করতে হবে। বর্তমানবিশ্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে মানবজাতি ও মুসলিম উম্মাহর সামনে ইসলামের কোনো বিকল্প নেই। একমাত্র ইসলামের মাধ্যমেই আধুনিক সভ্যতার সংস্কার সাধন সম্ভব।

ইসলামের শিক্ষা উপলব্ধি করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই পদ্ধতিবিজ্ঞানের ব্যাপক কাঠামোর সংজ্ঞা দিতে হবে, কারণ এটি হচ্ছে কেন্দ্রবিন্দু যার চারপাশে ইসলামী চিন্তাধারা আবর্তিত হচ্ছে।

ইসলামী চিন্তাধারার পদ্ধতিগত কাঠামো ঃ

শুরুতে এ বিষয়টি উপলব্ধি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, ইসলামী চিন্তাধারার কাঠামো জগৎ ও জীবনের সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করে। এটি উপলব্ধির পর ইসলামী চিন্তাধারা এবং তাকে নিয়ন্ত্রণকারী বিভিন্ন সম্পর্ক, মতবাদ, ধারণা এবং নীতিসমূহ বুঝার সূচনা করা যায়। সুতরাং আমরা যদি ইসলামী চিন্তাধারা ও পদ্ধতি বিজ্ঞানের প্রকৃতি যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে ইচ্ছুক হই এবং ইসলাম যেসব লক্ষ্য অর্জন করতে চায় তা কখনো বুঝার আশা রাখি, তাহলে প্রথমে আমাদের ইসলামের দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্পর্কিত ধারণা উপলব্ধি করা অত্যাবশ্যক। এসব ধারণা জীবনের উদ্দেশ্যকে সংজ্ঞায়িত করে এবং বস্তুজগতের বাইরের জগতের সাথে তাকে সম্পর্কিত করে। অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে শুধু আল্লাহতাআলাই জানেন। তিনি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী যে কোনো বান্দার কাছে অদৃশ্যজগৎ সম্পর্কে যতটুকু চান, তা প্রকাশ করেন। তারপর তিনি তার সেসব বান্দাদের রাসূল বা দূতরূপে মানবজাতির কাছে হেদায়াতের জন্য এবং তাদের অস্তিত্বের তাৎপর্য সুস্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্য পাঠান। অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কিত ইসলামী ধারণা অনুসারে অদৃশ্য জগতের সাথে মানুষের উত্তম ও গঠনমূলক সম্পর্ক রয়েছে। এ সম্পর্কের লক্ষ্য হচ্ছে পৃথিবীতে সত্য ও ইনসাফ সুপ্রতিষ্ঠা করা এবং তাকে দুর্নীতি মুক্ত রাখা।

তিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমাদের মধ্যে কর্মে কে সর্বোত্তম তা পরীক্ষা করতে পারেন (৬৭ : ২)।

www.pathagar.com

আল্লাহ তোমাদের ইনসাফ (আদল) করার, সৎ কাজ (ইহসান) করার এবং আত্মীয় স্বজনের প্রতি উদার হতে নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন সব লজ্জাজনক, ঘৃণ্য ও বিদ্রোহাত্মক বা অন্যায় কাজে (১৬ : ৯০)।

আমরা অদৃশ্য বা গায়েবের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ নীতিসমূহ এবং তা মানুষকে কী দিতে পারে তা সংক্ষেপে আলোচনা করতে পারি।

জীবনের একটি উদ্দেশ্য আছে, তা হচ্ছে নৈতিক কল্যাণ। এটি উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করা হয়নি। তুমি কি ধারণা কর যে তোমাকে আমি বৃথা সৃষ্টি করেছি এবং তুমি কখনো আমাদের কাছে ফিরে আসবে না? (২৩ : ১১৫)

বিশ্বে সব কিছুর মধ্যে মৌলিক ও চিরন্তন সম্পর্ক রয়েছে। মানব মনের উপলব্ধি মানুষের ক্ষমতার বাইরে।

মানুষের জন্য অদৃশ্য জগতের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন হলো মহান আল্লাহর অস্তিত্ব, যিনি চিরন্তন স্রষ্টা, এক ও একক। তাঁর মতো আর কিছুই নেই এবং তিনি সব কিছু সম্পর্কে জানেন।

আখেরাতে পাপ-পূর্ণ বিচারের দিনে সকল রূহ পুনরুজ্জীবিত হবে। সেখানে মানুষকে ইহজাগতিক জীবনের কাজ অনুযায়ী পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া হবে।

এ পৃথিবী হচ্ছে ইতিবাচক কাজের জায়গা গড়ে তোলার স্থান এবং সব কিছুকে শৃঙ্খলার মধ্যে স্থিত করার স্থান। এ পৃথিবীতে মানুষকে খলিফা হিসাবে তার মিশনের জন্য সব কিছুকে তার ইচ্ছাধীন করা হয়েছে। সে এখানে বসবাস করবে। সব কিছুকে শৃঙ্খলায় ফিরিয়ে আনবে। পৃথিবীর সব কিছুকে তার অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল করে দেয়া হয়েছে, সব কিছুর রক্ষণাবেক্ষণ তাকেই করতে হবে, পৃথিবীকে ভালো কাজে ব্যবহার করতে হবে। এতে দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা করে ক্ষমতার অপব্যবহার করবে না। সর্বশক্তিমান আল্লাহর সর্বজ্ঞতা থেকে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা উৎসারিত। এটি আল্লাহর সৃষ্টির অন্যতম আশ্চর্যজনক বিষয় এবং তাঁর মহত্ব ও ক্ষমতার একটি নিদর্শন। আল্লাহ তাঁর ইচ্ছায় অন্য সব কিছুর মতোই মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে ইচ্ছার স্বাধীনতা দান করে তাকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ও সম্পর্কিত করেছেন।

আল্লাহ এ বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে প্রাকৃতিক আইনের অধীন করেছেন। এসব আইন অনুসারে কাজ করে বিভিন্ন কর্ম সম্পাদন করা যায়, লক্ষ্য অর্জন করা যায় এবং মানবীয় ইচ্ছা, তার দৃঢ় সংকল্প ও নির্দেশনার প্রকাশ ঘটানো যায়। এসব আইন প্রয়োগ না করলে কোনো ইচ্ছা বা দৃঢ় সংকল্পের অস্তিত্ব থাকে না, কোনো লক্ষ্যে পৌছা যায় না এবং কিছুতেই প্রকাশ করা যায় না। মুমিন যখন প্রাকৃতিক আইনকে উপলব্ধির প্রচেষ্টা চালায় এবং সে অনুযায়ী কাজ করে তখন তাকে আল্লাহর উপর ভরসা (তাওয়াক্কুল)

www.pathagar.com

করতে হয়। কারণ তিনি অদৃশ্য জগতকে জানেন এবং গোটা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। আল্লাহ তাঁর বিশ্বাসী দাসের (মুমীন বান্দা) জন্য সব কিছুর বিধান দিয়েছেন। তারপর বান্দা প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী তার সব দায়িত্ব পালন করে। এসবই বান্দা বা দাসের ইহকাল ও পরকালে কল্যাণের জন্যই। ওহী মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় অদৃশ্য জগতের জ্ঞান সরবরাহকারী খোদায়ী উৎসকেই বলা হয়।

অপরদিকে যুক্তি হচ্ছে দৃশ্যমান জগৎ, এ পৃথিবীতে মানুষের জ্ঞান আহরণ ও তা প্রয়োগের জন্য সহায়ক হাতিয়ার। মানুষের কাছে যুক্তির প্রয়োজন দেখা দেয় খেলাফতের দায়িত্ব পালন এবং সত্য, ইনসাফ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য হাসিলের জন্য। সুস্থ মানব প্রকৃতি (ফিতরাত), আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস এবং তাঁর ওহীর উপস্থিতিতে ওহী, যুক্তি ও প্রাকৃতিক বিশ্ব সম্পর্কিত ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিরোধের কোনো অবকাশ নেই। ওহীর কাজ অদৃশ্যজগতকে নিয়ে। ওহী যে সত্যকে ধারণ করে তা গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে আমরা সুষ্ঠু ও কলুষিত জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের উপাদান খুঁজে পাই। ফেরেশতার সঠিক দিকনির্দেশনা প্রাপ্ত জ্ঞান এবং ইবলিসের কলুষিত জ্ঞান ও যুক্তির মধ্যে পার্থক্য করার এটিই হচ্ছে মাপকাঠি। তারা বলল, জ্ঞান সম্পর্কে আপনি আমাদের যা শিখিয়েছেন তার বাইরে আর কিছু জানি না (২ : ৩২)। ইবলিস উদ্ধত স্বরে ঘোষণা করেছিল যে, সে উন্নতর উপাদানে সৃষ্ট। আপনি আমাকে আগুন থেকে এবং তাকে (আদমকে) মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন (৭ : ১২)। পরিপূর্ণ জ্ঞান ও শক্তির অধিকারী আল্লাহ বলেন, আমি যা জানি তা তোমরা জান না (২ : ৩০)।

চিন্তাধারার এ ব্যাপক ও সর্বাত্মক কাঠামোর মধ্যেই মুসলমানদের প্রথম প্রজন্ম তাদের সব প্রশ্নের জবাব, সব চাহিদার সমাধান খুঁজে পেয়েছিল। আল্লাহ কুরআনের সর্বত্র ঈমান বা বিশ্বাসকে সৎকর্মের সাথে গ্রথিত করে দিয়েছেন, এটি মুসলিমদের দৃষ্টি এড়ায়নি।

যারা বিশ্বাস আনে এবং সৎকাজ করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়। (১০৩ : ৩)

সৎকাজ (সালেহ) বলতে বাস্তব উপলব্ধি, ঐকান্তিক প্রচেষ্টাকে বুঝায়। অন্যকথায় সদিচ্ছাই শুধু যথেষ্ট নয়।

মুসলিম মন-মানসকে তার শক্তি পুনরুদ্ধার করতে হলে তাকে প্রথমে তার দৃষ্টিভঙ্গিকে পুনরায় আবিষ্কার করতে হবে। এর পরেই মানুষ ও তার চিন্তাধারাকে পরিচালনা করা যাবে, তার প্রচেষ্টা সাফল্যমন্ডিত হবে এবং শক্তি ও বিজয়ের জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে।

www.pathagar.com

প্রত্যাদেশ, যুক্তি ও মহাবিশ্ব

জ্ঞান ও পথ নির্দেশনার উৎস হিসেবে ওহী হচ্ছে মানব জীবনের জন্য সে সত্য যা আল্লাহ তাঁর রাসূলদের কাছে প্রত্যাদেশরূপে পাঠিয়েছেন, যাতে তারা মানুষের কাছে আল্লাহর আদেশ পৌঁছে দিতে পারে এবং মানব জীবনের অস্তিত্বের অর্থ, তাৎপর্য, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে মানুষকে পথ নির্দেশনা দিতে পারে, প্রশিক্ষণ দিতে পারে। ওহী মানুষের জন্য যে বাণী বয়ে এনেছে তার নির্যাস হচ্ছে আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্কের ব্যাখ্যা এবং এ পৃথিবীতে তাদের অস্তিত্বের লক্ষ্য। মানুষ আল্লাহর সবচেয়ে সম্মানিত সৃষ্টি। কারণ মহান প্রভু তাদেরকে স্বাধীন ইচ্ছা দান করে ধন্য করেছেন। তারা স্বেচ্ছায় সত্যকে মেনে চলবে, তাদের হতে হবে সবার সেরা এবং তারা সৎ কাজ করবে। অপরদিকে খেয়াল-খুশির আবর্তে পড়ে সত্যকে অবজ্ঞা করলে তারা হবে অসৎ, দুর্নীতিপরায়ণ ও অত্যাচারী। শ্রেষ্ঠজীব মানুষের সাথে আল্লাহর সম্পর্ক হচ্ছে নিজেকে সমর্পণের, শৃঙ্খলার এবং নিয়ন্ত্রণের, দাসত্বের। এ সম্পর্ক হচ্ছে খেলাফত ও সম্মানের, প্রশংসা ও উজ্জীবনের। মানুষ যখন মহান আল্লাহর অনুজ্ঞাকে অনুসরণ করে তাঁরই দিকে মুখ ফেরায় এবং তিনি যা নিষেধ করেছেন তা এড়িয়ে চলে তখন সে সম্পর্ক হয় সম্মান ও মর্যাদার। কারণ, এটি তাকে সত্যে পৌঁছায় এবং সত্যকে অর্জন করে, যা হচ্ছে কল্যাণ ও আসল বাস্তবতা, সঠিক পথ, যে মহান লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য সকল সৎ ও ন্যায়পরায়ণ মানুষ প্রচেষ্টা চালায়। মানুষ তার কর্মপ্রচেষ্টার বলেই উন্নত হয়, মহৎ হয় এবং ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে এ সম্পর্ককে উপলব্ধি করার জন্য কোনো অবমাননা, অবমূল্যায়ন, ঘৃণা বা শোষণের ধারণা গ্রহণ করার কোনো সুযোগ নেই। এ সম্পর্কে মহানবী (সা) বলেছেন, রোজাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর কাছে মেশকের সুগন্ধ অপেক্ষা উত্তম (বোখারী ও মুসলিম)। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি মরুভূমিতে সফরে থাকো এবং নিজের বাহন উট হারিয়ে ফেলো যেটি তোমাদের জন্য খাদ্য ও পানীয় বহন করছিল, তারপর এ উটের ব্যাপারে হতাশ হয়ে একটি গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়ো এবং তারপর দেখতে পাও যে, তোমার উট ফিরে এসে তোমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, তখন তোমরা যে সন্তুষ্টি লাভ কর তার চাইতে আল্লাহ অনেক বেশি সন্তুষ্ট হন যখন তাঁর দাস তাঁর কাছে তওবা করে (মুসলিম)।

আল্লাহ বলেন, আল্লাহর তরফ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে একটি আলো এবং একটি প্রাঞ্জল গ্রন্থ– এর সাহায্যে আল্লাহ, যারা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায় তাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার পথে পরিচালিত করেন। তিনি তাঁর ইচ্ছায় তাদেরকে অন্ধকার থেকে

www.pathagar.com

আলোর পথে নিয়ে যান এবং তাদেরকে সরল সঠিক ও সোজাপথে পরিচালিত করেন (৫:১৫-১৬)।

যুক্তি

যুক্তি হচ্ছে মানুষের এমন একটি হাতিয়ার, যা কোনো কিছুর মর্ম উপলব্ধি করতে, নিরীক্ষণ করতে, দু'টি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে এবং তুলনা করতে সহায়ক হয়। দৃশ্যমান জগতে বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের জন্য এটিই হচ্ছে অবলম্বন। কোনো কিছু উপলব্ধি করার জন্য এটি মৌলিক উপায় হওয়া ছাড়াও যুক্তি এমন একটি বিষয়, যার সাহায্যে মানুষ জীবন, জগৎ ও অন্যান্য সৃষ্টির সাথে তার সম্পর্কের মর্ম বুঝতে পারে। এর ভিত্তিতে মানুষ তার অস্তিত্বকে উপলব্ধি করতে পারে, যুক্তিকে বাদ দিয়ে কোনো মানুষ আর মানুষ থাকে না, কোনো উপলব্ধির ক্ষমতা থাকে না, তার কোনো গুণের সঠিক মূল্যায়ন থাকে না এবং কোনো দায়িত্বও থাকে না। সত্যিকার ওহী এবং বিভিন্ন বিভ্রান্তি কর মিথ্যাচার, বানোয়াট বিষয় এবং অবাস্তব কল্পনা ও পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে যুক্তিই পার্থক্য সূচনা করতে পারে। অনুরূপভাবে যুক্তিই মানুষের মধ্যে যাচাই এবং পছন্দ ও অপছন্দের ক্ষমতা সৃষ্টি করে এবং তারা যা কিছু পছন্দ করে তার পরিণতি ভোগ করার জন্য তাকে সক্ষম করে তোলে।

অতীত জাতিগুলোর কাছে প্রেরিত ওহীকে যখন বিকৃত করা হলো, তখন ওহীর বিশুদ্ধতা ও প্রামাণিকতা হারিয়ে গেল। অপরদিকে মুসলিম মন-মানস একটি পূর্ণাঙ্গ ও সত্যিকারের ওহী লাভ করে এবং দৃশ্যমান ও অদৃশ্য জগতকে পরিবেষ্টনকারী তার জ্ঞানের উৎসকে খুঁজে পেয়ে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হলো। এভাবে ওহী এবং যুক্তি বিশ্বজগতের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে একীভূত থেকে মানুষকে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য বুঝতে এবং খলিফার ভূমিকা পালন করতে সক্ষম করে তোলে। যুক্তির ভূমিকা হচ্ছে ওহীর প্রামাণিকতা ও বিশুদ্ধতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এবং তারপর দৃশ্যমান বিশ্বে মানব অস্তিত্ব সম্পর্কে তার উদ্দেশ্যকে উপলব্ধি করে দৃশ্যমান জগতকে বোঝা। মুসলিম মনের ভূমিকা হচ্ছে দৃশ্যমান জগতকে গঠন করা এবং আল্লাহর ইচ্ছার নির্দেশনা ও লক্ষ্য অনুযায়ী খলিফার কর্তব্য পালন করা। মুসলিম মন-মানস ওহীর উপলব্ধি থেকেই তারা শক্তি, স্থিতিশীলতা এবং ন্যায়পরায়ণতার অধিকারী হয়। মুসলিম মন হচ্ছে একটি বিশ্বাসী, সঠিকরূপে পরিচালিত এবং পূর্ণ আস্থাশীল মন। এটি হঠকারী নয় এবং অনুমানের কারণে কোনো নিশ্চিত বিষয়কে অথবা অন্ধকারের জন্য আলোকে বা ভ্রান্তির জন্য পথ নির্দেশকে ত্যাগ করে না। এ মন একটি শক্তিশালী সক্ষম মন, এটি খলিফার ভূমিকা পালনেই পুরোপুরি নিমগ্ন। মুসলিম মন অনুমান নির্ভর বিষয়ে সময় বা শক্তি কোনোটাই ব্যয় করে না বা যেসব বিষয় সত্যিকার অর্থে কল্যাণকর বা প্রয়োজনীয় নয় তার পেছনে তার সময় ও শক্তিকে কাজে লাগায় না। এমনি দ্ব্যর্থহীন সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মুসলিম মন অদৃশ্য জগতের বিষয়াব-

www.pathagar.com

লীতে তর্ক জুড়ে দেবে না অথবা সে ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত কালামে ইলাহীর সুস্পষ্ট উচ্চারিত বাণী ও তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে উপলব্ধি ও ব্যাখ্যায় এবং সেগুলোকে বাস্তবায়নে যুক্তির ভূমিকাকে পাশ কাটিয়ে যাবে না। ইসলামের এ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে প্রকৃতি ও বিভিন্ন ঘটনাবলী অথবা বিভিন্ন পদ্ধতি বা ব্যবস্থা সৃষ্টিতে অথবা দায়িত্ব বহনে যুক্তির ভূমিকাকে কোনোক্রমেই অবজ্ঞা করা যায় না।

এ দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে খেলাফতের দায়িত্ব পালনে, ধর্মের নামে মানুষের উপর যাজক ও পুরোহিতদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিরোধ এবং যালিমদের অপতৎপরতা থামিয়ে দিতে সাহায্য করে। পরিণামে শরিয়তের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বিপরীতে ধর্মীয় আবেগের অপব্যবহার বন্ধ করতে সাহায্য করবে। সত্যিকার ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে যুক্তি বা ধর্মের নামে বিচ্যুতি বা যুলুমের কোনো সুযোগ নেই। ইসলামী চিন্তার ইতিহাসে ওহী ও যুক্তির মধ্যে যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়েছিল তা ছিল একদিকে রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও লক্ষ্যের বহিঃপ্রকাশ এবং অপরদিকে বিভিন্ন গোত্র ও জনগোষ্ঠির ইসলাম গ্রহণের ফলশ্রুতিতে তাদের মধ্যে থেকে পাওয়া প্রাক-ইসলামী যুগের সংস্কৃতির ফল। এর ফলে মুসলিম চিন্তাধারাকে দু'বিপরীত দিকে টানাহেচড়া করা হলো। ঐতিহাসিক দিক থেকে বলতে গেলে মুসলমানরা অদৃশ্য বিষয়াবলী, আল্লাহর প্রকৃতি ও গুণাবলী সংক্রান্ত বিষয়সমূহ নিয়ে দার্শনিক বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে তাদের প্রচুর শক্তি নষ্ট করেছে।

তথাপি কিছু মায়া, মোহ এবং কুতর্ক এখনো বিরাজ করছে। উম্মাহ এখনো ধর্মতত্ত্ব নিয়ে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত আছে এবং এসব তর্ক-বিতর্ক অব্যাহতভাবে প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে। সবচাইতে জঘন্য ব্যাপার হচ্ছে, কায়েমী স্বার্থবাদীরা এসব অস্তিত্ব বিনাশকারী বাজে বিষয়গুলো সমর্থন করছে। এতে উৎসাহ দিচ্ছে এবং এভাবে উম্মাহকে যেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা উচিত তা থেকে দৃষ্টি ভিন্ন দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছে। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে এ ধরনের পরিস্থিতি উম্মাহর দুশমনদের তাদের উদ্দেশ্য হাসিলে সাহায্য করবে। এ প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কথা এ যে, ইসলামী পদ্ধতিবিজ্ঞান নিয়ে অধ্যয়নকালে ইসলামী জ্ঞানের উৎস ওহী যুক্তি এবং মহাবিশ্বের প্রাকৃতিক আইনকে গবেষণা ও অধ্যয়নের মাধ্যমের সঙ্গে যেন আমরা তালগোল পাকিয়ে না ফেলি। প্রতিটি বৈজ্ঞানিক বিষয়ে তার জন্য বিশেষভাবে উপযোগী উপায় বা মাধ্যম রয়েছে। এটি সুস্পষ্ট যে, ইসলামী শিক্ষা অবশ্যই ওহী, যুক্তি এবং আল্লাহর সৃষ্টিকে যে মানদন্ড দিয়েছেন তার ভিত্তিতে রচিত হবে। এভাবে তৈরি নতুন ইসলামী শিক্ষা ব্যাপক ও অনন্য হবে এবং মানবজাতির জন্য কল্যাণকর জ্ঞান সৃষ্টিতে সক্ষম হবে।

আধুনিক যুগে মুসলিম মন এখনো ইসলামী জ্ঞানের সূত্রসমূহের কোনো নিয়মানুগ সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেনি। তথাপি এসব সূত্রের আলোকেই ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির উপযোগী সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করতে হবে। একমাত্র এ ধরনের সমাজ বিজ্ঞানের সাহায্যেই

www.pathagar.com

গবেষণা ও সমীক্ষার মাধ্যমে উম্মাহ তার যুব সমাজকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে পারবে। তবে মুসলিম মনকে তার নিজস্ব সমাজবিজ্ঞান সৃষ্টির আগে যেসব নীতি মতবাদের ভিত্তিতে ইসলামী চিন্তাধারা গড়ে উঠেছে তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে হবে।

ইসলামী পদ্ধতিবিজ্ঞান ও চিন্তাধারার মূলনীতিসমূহ

ইসলামী পদ্ধতিবিজ্ঞান ও চিন্তাধারার কিছু মৌলনীতি রয়েছে। এগুলোর সাহায্যে আমরা তাকে অন্যান্য পদ্ধতিবিজ্ঞান ও চিন্তাধারা থেকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করতে পারি। আমরা এসব নীতি বুঝতে না পারলে সেগুলো কাজে লাগাতে পারবো না বা ব্যবহার করতে পারবো না। এসব নীতি আসলে মৌলিক ও পূর্ব প্রতিষ্ঠিত স্বতঃসিদ্ধ ধারণারই প্রতিনিধিত্ব করে। এসব স্বতঃসিদ্ধ ধারণা জীবন ও জগতের উপলব্ধিতে একটি সৃজনশীল ও মননশীল আন্দোলনে মানুষের মনকে দিকনির্দেশনা দেয়। একটি প্রগতিশীল উপায়ে কীভাবে জীবন ও জগতের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় নিজেকে সঁপে দিতে হয় তার শিক্ষাও মুসলিম মন এবং স্বতঃসিদ্ধ ধারণা থেকেই লাভ করা যায়।

এসব মূলনীতি হচ্ছে একত্ববাদ, খেলাফত এবং দায়িত্ব। তিনটি নীতি মুসলিম মৌলিক কাঠামো গঠন করে তার গতিপথের সংজ্ঞা নিরূপণ করে এবং লক্ষ্যগুলোকে সুস্পষ্ট করে। এসব নীতির ভিত্তিতে না হলে কোনো কিছুই মুসলিম সচেতনতাকে উদ্বুদ্ধ করতে পারবে না বা তাতে শক্তি যোগাতে পারবে না। অতীতে ইসলামী চিন্তাধারার ব্যর্থতার পেছনে এসব নীতির গুরুত্ব অনুধাবনে ব্যর্থতাই অনেকটা দায়ী হবে। বর্তমান সময়ে মুসলিম মনের বিভ্রান্তি এবং তার অকার্যকারিতার ব্যাখ্যাও বহুলাংশে সেভাবেই করা যেতে পারে। পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে আমরা তিনটি নীতিকে পৃথক পৃথকভাবে পরীক্ষা করে দেখবো।

একতত্ত্ববাদ : কালেমা শাহাদাতে আল্লাহর একত্ব স্পষ্টভাবে বর্ণিত এবং কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যা অনুযায়ী এ নীতি ইসলামী চিন্তাধারা ও পদ্ধতিবিজ্ঞানকে এ সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত করে যে, পরম সত্যই হচ্ছে সমগ্র বিশ্বের ভিত্তি, উৎস, চূড়ান্ত নিয়তি। বিশ্বজগত একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য নিয়েই টিকে আছে এবং সমগ্র বিশ্বের চূড়ান্ত নিয়তি তুলনাহীন আল্লাহর হাতেই রয়েছে। সমগ্র বিশ্ব একটি একক উৎস থেকেই জন্ম লাভ করেছে এবং... একটি একক বাস্তবতারই প্রতিনিধিত্ব করে; এবং মানুষ হচ্ছে অদ্বিতীয় ও অনুপম সৃষ্টি। আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং সত্য ও ইনসাফের ভিত্তিতে মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা ও খেলাফতের দায়িত্ব দিয়ে সম্মানিত করেছেন।

আপনার মহামহিমান্বিত প্রতিপালকের তাসবীহ পাঠ করুন, যিনি সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সুঠাম করেছেন। আর যিনি তকদীর নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন (৮৭ : ১-৩)।

www.pathagar.com

আল্লাহ কোনো সন্তান জন্ম দেননি অথবা তাঁর সাথে আর কোনো সৃষ্টিকর্তাও শরিক নেই (যদি অনেকগুলো প্রভু হতো তাহলে প্রত্যেক প্রভু সে যা সৃষ্টি করেছে তা নিয়ে আলাদা হয়ে যেত এবং অতঃপর একজন অন্যজনের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতো)। আল্লাহ পবিত্র সেসব কথা থেকে যা এসব লোকেরা মনগড়া ভাবে বলে (২৩ : ৯১)।

এরা কি কোনো সৃষ্টিকর্তা ছাড়া নিজেরাই অস্তিত্ব লাভ করেছে অথবা এরা নিজেরাই নিজেদের সৃষ্টিকর্তা (৫২ : ৩৫)?

তিনি বললেন, আমাদের রব তিনি যিনি প্রত্যেকটি জিনিসের মূল সৃষ্টি কাঠামো দান করেন এবং তারপর তাকে পথ দেখিয়েছেন (২০ : ৫০)।

এমনই হবে আল্লাহর কুদরতের বিস্ময়কর কীর্তি, যিনি সব জিনিসকেই সুষ্ঠুভাবে মজবুত করে বানিয়েছেন। তোমরা কী করছ তা তিনি খুব ভলোভাবেই জানেন (২৭ : ৮৮)।

তিনি পৃথিবী ও আকাশমন্ডলকে সত্যিকার ভিত্তিতে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন, আর তোমাদের আকার-আকৃতি বানিয়েছেন এবং অতীব উত্তম বানিয়েছেন, শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে (৬৪ : ৩)।

তোমাদের মহাদয়াবানের সৃষ্টি কর্মে কোনোরূপ অসংগতি পাবে না। দৃষ্টি আবার ফিরাও, কোথাও কোনো দোষ-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয় কি (৬৭ : ৩)?

যদি আসমানে ও জমিনে এক আল্লাহ ছাড়া আরো বহু খোদা থাকতো, তা হলে উভয়ের শৃঙ্খলা ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যেত। আরশের মালিক আল্লাহরই জন্য সমস্ত গৌরব ও প্রশংসা, তিনি সেসব কথা থেকে পবিত্র যা এসব লোকেরা বলে বেড়ায় (২১ : ২২)।

বিশ্বলোকের কোনো জিনিসই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সব কিছু শোনেন ও দেখেন (৪২ : ১১)।

এবং যে কেউ আল্লাহতে ঈমান আনে, আল্লাহ তাকে হেদায়াত দান করেন। আর আল্লাহ সব কিছু জানেন (৬৪ : ১১)।

এটি এ জন্য যে, আল্লাহই প্রকৃত সত্য, আর সেসব কিছুই বাতিল যাদেরকে তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে ডাকে। আল্লাহই প্রবল ও মহান (২২ : ৬২)।

খেলাফত : পৃথিবীতে এবং মহাবিশ্বে মানুষের খেলাফতের দায়িত্ব পালন করতে হলে তাকে এ পৃথিবী, বিশ্বজগত ও অন্যান্য সৃষ্টির সাথে লেনদেন ও সম্পর্ক-সম্বন্ধ বজায় রাখতে হবে এবং এজন্যে তাকে অভিভাবক ও আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে যেতে হবে। একজন মুসলিম তার ফিতরাত, আকিদা, চিন্তার পদ্ধতি, স্বাধীন ইচ্ছা এবং আল্লাহ তাকে শেখার যে ক্ষমতা দিয়ে সম্মানিত করেছেন তার অধিকারী হয়ে মহাবিশ্বে মানুষের অবস্থানকে একটি দায়িত্বশীল অভিভাবকের অবস্থানে নিয়ে যেতে হবে। মানুষ

www.pathagar.com

যদি অবিরাম কর্মে ব্যাপৃত না থাকে এবং প্রকৃতি জগতে তার পরিপার্শ্বকে কীভাবে পরিচালনা করতে হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত না নেয় তাহলে সে তার উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারবে না। জীবনে তার ভূমিকা পালন করতে পারবে না অথবা মানসিক শান্তি খুঁজে পাবে না। ইসলামী চিন্তাধারা অনুযায়ী খিলাফতের নীতি মানুষের সহজাত আকাঙ্খাগুলোকে সংজ্ঞায়িত করে এবং তাকে পরিচালিত করে। এভাবে মানুষের সহজাত কামনা-বাসনা সত্য, ইনসাফ ও সংস্কারের অভিমুখে পরিচালিত হয়।

তোমরা কী তাহলে চিন্তা করেছিলে যে, আমরা তোমাদেরকে অকারণে পয়দা করেছি আর তোমাদেরকে কখনো আমার কাছে ফিরে আসতে হবে না (২৩ : ১১৫)?

তিনিই মৃত্যু ও জীবন উদ্ভাবন করেছেন, যেন তোমাদেরকে পরখ করে দেখতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে সেরা মানুষ কে (৬৭ : ২)?

সে সময়ের কথাও কল্পনা করে দেখ যখন তোমাদের প্রভু ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে এক খলিফা নিযুক্ত করতে ইচ্ছুক (২ : ৩০)।

তিনি জমিন ও আকাশমন্ডলের সব জিনিসকেই তোমাদের অধীন ও নিয়ন্ত্রিত করেছেন, সব কিছুই তাঁর নিজের নিকট থেকে এতে বড় নির্দশন রয়েছে সেসব লোকদের জন্যে যারা চিন্তাভাবনা গবেষণা করতে অভ্যস্ত (৪৫ : ১৩)।

সেই আল্লাহই তোমাদের জন্য ভূতলকে অধীন করে রেখেছেন, তোমরা চলাচল কর এর বক্ষের উপর এবং খাও আল্লাহর রিযক, তাঁরই নিকট তোমাদেরকে পুনর্জীবিত হয়ে যেতে হবে (৬৭ : ১৫)।

ইসলামী চিন্তাধারায় খেলাফতের বহুমাত্রিকতা থেকে আমরা বুঝতে পারি প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের অফুরন্ত প্রাণশক্তিকে, বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা)-এর অতুলনীয় কর্মশক্তিকে এবং তাঁর সঙ্গি-সাথিদের তেজ ও কর্মচাঞ্চল্যকে– যারা কখনো কর্মে ক্লান্তি অনুভব করেননি, ত্যাগ স্বীকার এবং অবিরাম জিহাদেও কোন ক্লান্তি যাদের স্পর্শ করেনি। এসবই আমাদেরকে খেলাফতের এ বহুমাত্রিক চিন্তা ও মানসে তার বিস্তারই উপলব্ধি করতে শিখিয়েছে। মাত্র অল্প কয়েক বছরের ব্যবধানে সমসাময়িককালের পরিচিত বিশ্বের পুরোটাতেই সত্যের ও সংস্কারের এক আন্দোলন শুরু হলো, পৃথিবী নামক গ্রহের কোনো অঞ্চল তার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলো না।

নৈতিক দায়িত্ব : তৃতীয় যে নীতির উপর ইসলামী চিন্তাধারা ও পদ্ধতিবিজ্ঞানের সত্যতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত তা হচ্ছে নৈতিক দায়িত্ব। মুসলিম চিন্তাধারার বহুমাত্রিকতা ও বিস্তারকে বিবেচনা ছাড়া আমরা মুসলিম চিন্তাধারাকে বুঝতে পারবো না। এমনকি পশ্চাৎপদতা ও অনগ্রসরতার ঘোর অন্ধকার যুগেও মুসলিমকে তার বিবেক, তার দায়িত্ব ও ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে সতর্কতা তার সচেতনতাকে টিকিয়ে রেখেছে এবং তাকে বিলু-

www.pathagar.com

ষ্ঠির হাত থেকে বাঁচিয়েছে। এ কারণে মুসলিম মন বরাবরই অস্থির ছিল এবং তা কখনো তার নিশ্চিত অবস্থা ও পশ্চাৎপদতাকে গ্রহণ করেনি। তার কারণ, মুসলিম মন মানস তার নৈতিক দায়িত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, এখন আর উদাসীন থাকা যায় না। এ কারণে পরবর্তী মুসলিম উম্মাহ যখন তার পথ হারিয়ে পিছনে পড়ে গেল তখন তার ইতিহাস পরিণত হলো উৎকণ্ঠা ও দুঃখের ইতিহাসে। মুসলিম মন যা রেখে গেছে এবং যা কিছু সংরক্ষণ করেছে তা হলো খলিফা হিসাবে তার দায়িত্ববোধ। এভাবে মুসলিম মন-মানসের গঠনে দায়িত্ব নীতি খেলাফত নীতির অপরদিকের প্রতিফলন ঘটায়। খেলাফত-এর পেছনের উদ্দেশ্য এবং তার প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য (স্বাধীন ইচ্ছা, বিচার শক্তি প্রয়োগ করার ক্ষমতা এবং অধিক জ্ঞান অর্জনের সম্ভাবনা শক্তি)-এর সাথে থাকে তার ভূমিকা এবং তা পালনের জন্য যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় মানবিক দায়িত্ব।

একজন মুসলিম তার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য সার্থক করার জন্য ইচ্ছা ও সক্ষমতাকে ব্যবহার করতে পারলে তার দায়িত্ব পালন করলো এবং পরকালে তার যোগ্যস্থান অধিকার করলো। উদাহরণ স্বরূপ, সে যদি তার ইচ্ছা ও সক্ষমতাকে এবং সঠিক উদ্দেশ্যকে পাশ কাটিয়ে ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে, যুলুম ও দুর্নীতির স্বার্থে ব্যবহার করে, তাহলে সে তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলো। তার কর্তব্যের সম্মানকে ভূলুণ্ঠিত করলো এবং তার অস্তিত্বের উদ্দেশ্যকে হারিয়ে ফেলল। তারপর পরকালে নিকৃষ্টতমদের মধ্যে হবে তার শেষ ঠিকানা।

বল, আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ। (তবে) আমার কাছে ওহী এসেছে যে তোমাদের খোদা শুধুমাত্র এক ও একক। অতএব, যে লোক নিজের প্রভুর সাথে সাক্ষাতের আশা করে সে যেন নেক আমল করে এবং বন্দেগী ও দাসত্বের ব্যাপারে নিজের খোদার সাথে অপর কাউকে শরিক বানিয়ে না নেয় (১৮ : ১১০)।

তিনি-ই মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যে তোমাদেরকে পরখ করে দেখতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে আমলে সর্বোত্তম কে। তিনি যেমন সর্বশক্তিমান, তেমনি ক্ষমাশীলও (৬৭ : ২)।

হে মানুষ জমিনে যেসব হালাল ও পবিত্র দ্রব্যাদি রয়েছে তা খাও এবং শয়তানের পথে চলো না, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন (২ : ১৬৮)।

আল্লাহ তোমাকে যে ধনসম্পদ দিয়েছেন তা দিয়ে পরকালের ঘর তৈরির চিন্তা করো, অবশ্য দুনিয়া থেকেও নিজের অংশ নিতে ভুলো না। তুমি অনুগ্রহ করো যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টির চেষ্টা করো না, আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না (২৮ : ৭৭)।

www.pathagar.com

সে দিনের লাঞ্ছনা ও বিপদ থেকে আত্মরক্ষা করো, যেদিন তোমরা আল্লাহর দিকে ফিরে যাবে। সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার উপার্জিত পাপ বা পূণ্যে পুরোপুরি ফলদান করা হবে এবং কখনো কারো উপর জুলুম করা হবে না (২ : ২৮১)।

আল্লাহ সুবিচার, ইনসাফ, অনুগ্রহ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দিচ্ছেন এবং অন্যায় পাপ, নির্লজ্জতা ও জুলুম অত্যাচার করতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে নসিহত করেছেন যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারো (১৬ : ৯০)।

যে নেক আমল করবে সে নিজের জন্যই করবে, আর যে অন্যায় করবে সে নিজেই তার পরিণতি ভোগ করবে। শেষ পর্যন্ত সকলকে যেতে হবে নিজেদের রবের কাছে (৪৫ : ১৫)।

উহা এ যে কোনো বহনকারী অন্য কোনো লোকের বোঝা বহন করবে না এবং এ যে মানুষের জন্যে কিছু নেই শুধু তাই যার জন্যে সে চেষ্টা করেছে, এ যে তার চেষ্টা প্রচেষ্টা শীঘ্রই দেখা যাবে এবং তার পূর্ণ ফল তাকে দেয়া হবে (৫৩ : ৩৮-৪১)।

অতঃপর সকলেই স্বীয় প্রকৃত মাবুদের নিকট প্রত্যাবর্তিত হয়। সাবধান! ফয়সালা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমস্ত ইখতিয়ার কেবল তাঁরই রয়েছে। হিসাব গ্রহণে তিনি পূর্ণ মাত্রায় ক্ষমতাশালী (৬ : ৬২)।

যে লোক বিন্দু পরিমাণও নেক আমল করে থাকবে সে তা দেখবে এবং যে লোক বিন্দু পরিমাণ বদ আমল করে থাকবে সেও তা দেখতে পারবে (৯৯ : ৭-৮)।

মুসলিম মনে খেলাফতের নীতির সাথে দায়িত্ব নীতির একীকরণ থেকে আমরা প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের ভালোবাসা ও ত্যাগের শক্তিকে হয়তবা বুঝতে পারবো প্রাথমিক যুগের মুসলমানরা সব জাতি ও সমাজের জন্যে যে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। লোভ, ভন্ডামী ও ঔদ্ধত্যমুক্ত এবং সম্পদ আহরণ ও সঞ্চয় অনাগ্রহের জন্য খ্যাত প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের অসাধারণ দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা এভাবেই দেয়া যেতে পারে। পার্থিব অর্থ সম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতা বৃদ্ধির সাথে সাথে সম্পদ সংগ্রহ ও সঞ্চয়ে তারা ক্রমেই আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে থাকে। কুরআনে বর্ণিত লোকদের মধ্যে তারা অন্তর্ভুক্ত এবং আল্লাহর ভালোবাসায় তারা মিসকীন, এতিম ও কয়েদীদের খাবার খাওয়ান।

তারা বলে আমরা তোমাদেরকে শুধু আল্লাহর জন্যেই খাবার দিচ্ছি, আমরা তোমাদের কাছে না কোনো প্রতিদান চাই, না কোনো কৃতজ্ঞতা (৭৬ : ৮-৯)।

দায়িত্ব-নীতি, সঠিক ইসলামী চিন্তাধারা এবং সুষ্ঠু পদ্ধতিবিজ্ঞানের জন্য প্রয়োজন আরো একটি গ্যারান্টি। নিয়ত অনুযায়ী কাজ হয় এবং প্রত্যেক মানুষ তাই পাবে যে জন্যে সে

www.pathagar.com

নিয়ত করেছে (বোখারী ও মুসলিম)। একজন মুসলিমকে সত্য ও ইনসাফের পথ থেকে বিচ্যুত করা যায় না। কারণ সে নিশ্চিতভাবে জানে যে, তার মানসিক শান্তি এবং পরকালে তার পরিণতি নির্ভর করবে যে কর্মে ব্যস্ত থেকে, সংগ্রাম করে ত্যাগ স্বীকার করে এবং নেক কাজ করে যতটুকু দায়িত্ব পালন করেছে তার ওপর। তাওহীদ, খেলাফত এবং দায়িত্ব এ তিনটি নীতি মুসলমানদের কাছে সুস্পষ্ট হলে উম্মাহ তার পথ খুঁজে পেতে সক্ষম হবে, তার প্রাণশক্তির উৎসকে পুনরায় আবিষ্কার করবে এবং তার তরুণ প্রজন্মকে সুষ্ঠু ইসলামী পদ্ধতিবিজ্ঞান অনুযায়ী গড়ে তুলতে পারবে। এর ফলে উম্মাহকে ইতহাসের অগ্রণী ও সৃজনশীল শক্তি হিসাবে তার অবস্থান পুনঃপ্রতিষ্ঠায় মুসলিম মন আবারো যোগ্যতা অর্জন করবে।

তাওহীদের সঠিক ও উপলব্ধি নিয়ে মুসলিম মন তার সত্যিকার দিক নির্দেশনা খুঁজে পাবে এবং সাফল্য অর্জন করবে। খলিফার ভূমিকা পালন করে মুসলিম মন এগিয়ে যাবে এবং সফল হবে। অখন্ড বিজ্ঞান নিয়ে মুসলিম মন হয়ে উঠবে প্রত্যয় এবং উৎপাদনমুখী।

ইসলামী পদ্ধতিবিজ্ঞানের মৌলিক ধারণাসমূহ

ইসলামী চিন্তাধারা ও পদ্ধতিবিজ্ঞান কীভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য এ দু'টি নীতি যে নীতির উপর ভিত্তি করে পদ্ধতিবিজ্ঞান গড়ে উঠেছে তার রূপরেখার সঙ্গে পরিচিত হওয়াই যথেষ্ট নয়। বরং উক্ত রূপরেখার বাস্তব দিকের প্রতিনিধিত্বশীল ধারণাগুলোকে বোধশক্তির দিকে নির্ণয় করাও প্রয়োজনীয়। পদ্ধতিবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক দিকগুলো জানা যথেষ্ট নয়। কারণ এর দ্বারা কীভাবে কাজ হয় তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। সংস্কারমুখী বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চাইলে আমাদের সেসব ধারণা সম্পর্কে জানতে হবে, যেসব ধারণা অনুসারে এবং যেসব চাহিদার ভিত্তিতে মুসলিম মন কাজ করে। বাস্তবে ইসলামী পদ্ধতিবিজ্ঞান, জাহেলি সংস্কৃতি ও দর্শন দ্বারা বিকৃত হয়ে যায়। ইসলামে দীক্ষা গ্রহণকারী নও মুসলিমরা এ জাহেলিয়াতের সংস্কৃতি ও দর্শন সাথে নিয়ে এসেছিল। যেহেতু এ সংস্কৃতি ও দর্শন নও মুসলিমদের জ্ঞানে ও বাস্তব জীবনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল, এ কারণে উম্মাহর চিন্তাধারার উপর এসবের প্রভাব পড়ে। পরবর্তী সময়ে ইসলামের প্রতি উম্মাহর রাজনৈতিক নেতৃত্বের অঙ্গীকারহীনতা ও তাদের ন্যায়-অন্যায় বিচারশূন্য অপকর্মের ফলে এ পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে। ইসলামী পদ্ধতিবিজ্ঞানে এ বিভ্রান্তি রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্যে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে ওঠে। তারা এ হাতিয়ার ব্যবহার করে যাতে উম্মাহর পরিস্থিতি পুরো অনুধাবন করতে না পারে। এ হাতিয়ার তারা কাজে লাগালো যুলুমবাজ নেতৃত্ব কায়েম করতে এবং উম্মাহর দৃষ্টিকে নেতৃত্বের নৈতিকতা বিরোধী অপকর্ম ও লক্ষ্য থেকে ভিন্ন দিকে ফিরিয়ে দিতে। পদ্ধতিবিজ্ঞান সম্পর্কিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ

www.pathagar.com

সৃষ্টি ও অস্তিত্বের উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রকৃতি
সত্যের বিষয়মুখীতা এবং পরিস্থিতির আপেক্ষিকতা
সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা ও স্বাধীন ইচ্ছা
তাওয়াক্কুলের ব্যাপকতা বা সর্বাত্মক রূপ
বিভিন্ন কর্মের কার্যকারণ সম্বন্ধ

সৃষ্টি ও অস্তিত্বের উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রকৃতি

মুসলিম চিন্তাধারার বুনিয়াদ হচ্ছে তাওহীদ এবং এককত্বের নীতি। এর থেকে উৎসারিত হয়েছে সৃষ্টির, জীবন, মানুষ্য এবং বাস্তবতার ঐক্য। এ এককত্ব ও ঐক্য, সৃষ্টি ও অস্তিত্বের পেছনের উদ্দেশ্যকে পরোক্ষভাবে প্রকাশ করে।

আকাশ ও পৃথিবীকে এবং উভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি (২১:১৬)।

আমি জিন ও মানুষকে শুধু আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের কাছে কোনো রিজিক চাই না। অথবা আমি এটাও চাই না যে, তারা আমাকে খাওয়াবে (৫১ : ৫৬-৫৭)।

আল্লাহই সৃষ্টিকর্তা-এ বিশ্বাস থেকে এ অর্থ উপলব্ধি করা যায় যে, সৃষ্টির একটি মাত্রই উদ্দেশ্য রয়েছে। মানুষের স্বাভাবিক সাধারণ জ্ঞান ও মুসলমানদের এককত্বে বিশ্বাস অনুযায়ী ঐক্য ও সৃষ্টির উদ্দেশ্য অথবা সৃষ্টির মূলে যে অখন্ডত্ব ও ঐকতান রয়েছে সে সম্পর্কে মুসলিম মন অনবহিত থাকবে তা মোটেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তাওহীদে বিশ্বাসের প্রতি মুসলিম মনের স্বাভাবিক প্রবণতা তাকে অবশিষ্ট সৃষ্টির সাথে তার ভূমিকা পালনে পরিচালিত করে। মুসলিম মন এবং অবশিষ্ট সৃষ্টির সাথে তার সম্পর্কের এ ধারণার আলোকে বিশৃঙ্খল চিন্তা মোটেই মেনে নেয়া যায় না। তার মানব প্রকৃতি ও ইসলামী সচেতনতা তাকে যোগ্য করে গড়ে তুলেছে। সে জন্যই মুসলিম একজন খলিফা, একজন সাক্ষী এবং সৃষ্টির অভিভাবক।

সে যাই হোক, কার্যকরণ সম্বন্ধ এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রকৃতি সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝির কারণে তাওয়াক্কুল ও তকদীর (কাজা ও কদর) সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। ফলে মুসলিম মনকে এক হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতি ও অবসন্নতা পেয়ে বসেছে। এ পরিস্থিতিতে সে হয়ে উঠেছে উদাসীন ও অদৃষ্টবাদী এবং সন্দেহাতীতভাবে ইসলাম বিরোধী কঠোর বৈরাগ্যবাদ নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত। তারপর স্বল্প সময়ের ব্যবধানে সে বিশ্বে সংস্কার ও সভ্যতার শক্তি হিসাবে তার কর্মশক্তি ও ভূমিকা হারিয়ে ফেলেছে।

প্রকৃতির সব কিছু উদ্দেশ্যপূর্ণ-এ ধারণা সঠিকভাবে বুঝতে পারলে এটি উদাসীনতা ও অকর্মন্যতা প্রত্যাখানের একটি সুদৃঢ় ভিত্তি হয়। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে এটি মুসলমানদেরকে জ্ঞান অর্জনে এবং জীবন, জগৎ তার চারিদিকের ঘটনা প্রবাহের মধ্যকার সম্পর্ক ও সম্বন্ধ বুঝতে উদ্বুদ্ধ করে।

www.pathagar.com

যার সাথে বাদশাহীতে কেউ শরিক নেই, যিনি সব জিনিসই পয়দা করেছেন এবং সেসবের তকদীর নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন (২৫ : ২)।

এমনই হচ্ছে আল্লাহর কুদরতের বিস্ময়কর কীর্তি, যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে সুষ্ঠুভাবে মজবুত করে বানিয়েছেন। তোমরা কি করছ তা তিনি খুব ভালোভাবেই জানেন (২৭:৮৮)।

সত্যের বাস্তবতা এবং পরিবেশ-পরিস্থিতির আপেক্ষিকতা ঃ

মুসলিম ফিতরাত সত্যের বাস্তবতার ধারণাকে এ অর্থে প্রকাশ করে যে, সে এ সসীম বিশ্বের একটি সসীম সৃষ্টি এবং ব্যাপক ও সঠিক আইনের অধীন। বিশ্বের আইন হচ্ছে একটি বাস্তবতা, মানুষকে এর সাথেই থাকতে হয়। মানুষ এসব আইনের অধীন এবং জীবনের প্রতি মুহূর্তে এগুলোর সাথে তার মোকাবিলা হয়। আরো বলতে গেলে, মানুষ হয়ত বা এ বিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞাত থাকতে পারে এমনকি প্রাকৃতিক ব্যবস্থার কয়েকটি দিক এবং তার অস্তিত্বকে নিয়ন্ত্রণকারী বিধিবিধানগুলো বুঝতে পারে। সে নিজে পূর্ণ ব্যাপারটি বুঝতে পারে না এমনকি তার গভীরতাও অনুধাবন করতে পারে না। মুসলিম মন যে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছে এবং ওহীর মাধ্যমে যেসব নীতিমালা শিখেছে তার কারণে সে এসব আইনকে গ্রহণ করে এবং এসবের প্রতি তার দায়িত্ব পালন করে। এভাবে মুসলিম মন জীবন ও মানব অস্তিত্বের উদ্দেশ্য বুঝতে পারে।

ওহীর আলো এবং দিক নির্দেশনা থেকে মুসলিম মন ও তার সাধারণ জ্ঞান অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে। মুসলিম মনের কাছে বাস্তবতা হচ্ছে বৈষয়িক, যে এর অস্তিত্ব ও বহুমাত্রিকতাকে জানে এবং তার সাথে ও তার বিধিবিধানের সাথে মিথস্ক্রিয়া করতে চায়। মুসলিম মন পুরোপুরিভাবে বৈষয়িক। এটি খেয়ালের বশে চালিত হয় না এবং প্রত্যেককে সে অবজ্ঞা করে না। সাধুতা ও ন্যায়পরায়ণতাই তাকে উদ্বুদ্ধ করে এবং তার সমস্ত উদ্যম, সব প্রচেষ্টা বিশ্বের বিধিবিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সত্য অন্বেষার দিকে পরিচালিত হয়।

সাফল্যের ধারণা

মুসলিম মনের প্রবণতা অনুসারে অবাধ যৌনতা ও দুর্নীতির মধ্যে জীবনে সাফল্যের ধারণা নিহিত নয় বরং শৃঙ্খলা, সচেতনতা এবং প্রকৃতির সাথে ঐকতানের মধ্যেই তা নিহিত রয়েছে। ব্যক্তি জীবনে বা সমষ্টি জীবনে যা সত্য এবং মানব অস্তিত্বের জন্য যা কিছু কল্যাণকর তা নিয়ে মুসলিম মনে কোনো বিরোধ নেই। অথবা মুসলিম মন-মানসে আধ্যাত্মিক জগৎ ও বস্তুজগতের মাঝে অথবা এ জীবনের জন্যে যা ভালো এবং পরকালের জন্যে যা ভালো তার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। এসবই অস্তিত্বের বাস্তবতার বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিত্ব করে। তারা এর সাথে একীভূত হয় এবং এর সাথে মিশে যায়।

একজন মুসলিম যে কাজই সে করুক না কেন এবং যে ভূমিকাই সে পালন করুক না কেন, সব কিছুতেই সে একজন অভিভাবক ও দায়িত্বশীলের অবস্থানে বর্তমান থাকে।

www.pathagar.com

সে তার চারিদিকে সব কিছুর সাথে ইনসাফ করার জন্য সচেষ্ট থাকে। সে পরামর্শ করে তার কাজকর্ম সম্পাদন করে এবং সত্য ও সুবিচার প্রার্থনা করে। সে যদি এ পন্থায় কাজ না করে সে তার উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারে না।

তোমরা প্রত্যেকেই রাখাল এবং প্রত্যেকেই তার পালের জন্য দায়ী (বোখারী ও মুসলিম)।

বিশ্বাসীদের সকলের জীবনের মূল্য সমান। তারা শত্রুদের বিরুদ্ধে এক দেহ এক প্রাণ হয়ে লড়াই করে। তাদের মধ্যে সাধারণ মানুষটিও সমষ্টিগত বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করতে পারে (আবু দাউদ, আল নাসায়ী)।

নবী করীম (সা) বলেছেন, "দ্বীন হচ্ছে আন্তরিকতা।" সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন, "কার প্রতি বা কার জন্য এ আন্তরিকতা?" নবী (সা) জবাব দিলেন, "আল্লাহ, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল, মুসলমানদের নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ মুসলমানদের জন্য" (মুসলিম)।

মুসলমানরা পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে তাদের বিষয়াদি পরিচালনা করে। তারা আছবিয়া (গোত্রকেন্দ্রিকতাবাদ), জাতীয়তাবাদ, দলবাদ অথবা সাম্প্রদায়িকতাবাদে বিশ্বাসী নয় এবং জুলুম, স্বৈরাচার অথবা দুর্নীতি তাদের কাছে কোনো তাৎপর্য বহন করে না।

বাস্তবতা মুসলমানদের মতে একটি বস্তুগত ব্যাপার হলেও এর দ্বারা সংকীর্ণতা বুঝায় না। এমনকি বাস্তবতা মৌলিক দিক থেকে এক এবং অপরিবর্তনশীল হলেও এতে মানুষের অবস্থান, ব্যক্তি বা সমাজের একটি অংশ হিসাবে খুবই ক্ষুদ্র এবং তা স্থান-কালের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হয়। এর অর্থ এ দাঁড়ায় দৃষ্টিভঙ্গি, অবস্থান এবং প্রয়োগ এ সবই আপেক্ষিক। মানুষের বিভিন্ন চাহিদা ও অবস্থান অনুযায়ী বাস্তবতার সঙ্গে মুসলিম মন-মানসের ব্যবহারে পরিবর্তন ঘটে। শিশু বয়স্ক মানুষের মতো নয়, একজন যোগ্য ব্যক্তি অযোগ্য ব্যক্তির মতো হয় না, জ্ঞানী মূর্খের মতো নয়, শিক্ষা ক্ষণস্থায়ী বিবেচনার মতো নয়, শান্তি যুদ্ধের মতো নয় এবং প্রাচুর্য দুর্ভিক্ষের মতো নয়। মুসলিম মন ঐক্যে, সর্বাত্মক বিশ্বাসে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হলেও এটি আবার বহুমুখী এবং স্থান ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে তার মূলভিত্তি বা দিকনির্দেশনা না হারিয়ে বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন সমাধান দিতেও সক্ষম।

স্বাধীনতা

স্বাধীনতার ধারণাকে বুঝার চেষ্টা করলে এটি অনুশীলনের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলীকেও আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। স্বাধীনতা একটি অধিকার, এর দৃষ্টিভঙ্গি এবং যে কোনো দায়িত্বের মতো একটি দায়িত্ব। বিচ্ছিন্নতার মধ্যে অথবা বিশৃঙ্খলার মধ্যে স্বাধীনতার অনুশীলন করা যায় না। যে কোনো কিছুর তুলনায় এটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। কারণ মানুষের জীবন এবং তার অস্তিত্বের উপর এবং গভীর প্রভাব রয়েছে। ইচ্ছার স্বাধীনতা

www.pathagar.com

সাধারণভাবে এবং উপাসনার স্বাধীনতা বিশেষভাবে পরিণত ও সুস্থ বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির অধিকার, যে স্বাধীনতার অর্থ ও তার ফলাফল বুঝতে পারে, তার নিজ জীবনে স্বীয় কর্মের এবং তার চারিদিকের জীবনে বিভিন্ন কর্মের জন্য দায়িত্ব বহন করতে পারে।

শিশু ও কান্ডজ্ঞানহীনদের ক্ষেত্রে তাদের ত্রুটি বিচ্যুতির সুযোগ গ্রহণ করা অথবা বুদ্ধিবৃত্তিক সাবালকত্ব অর্জন করে অথবা মানসিক ভারসাম্য ফিরে পেয়ে নিজেরা নিজেদের দায়িত্ব বহনে সক্ষম হওয়া পর্যন্ত তাদের সকল বিষয়ের জন্য দায়িত্বশীল অভিভাবকদের কর্তব্যকে অবমূল্যায়ন করা ভুল। মানুষের উপাসনার স্বাধীনতার অধিকার এবং সে স্বাধীনতার ব্যবহারে তার দায়িত্বের ভিত্তিতে আমরা দেখতে পাই প্রথম যুগের মুসলমানদের সেনাবাহিনী মান ও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে যুলুমবাজ শক্তিকে বাধা দিয়েছে, মানুষের উপাসনার স্বাধীনতার অধিকারকে রক্ষা করেছে, তাকে তার দায়িত্ব পালনে সক্ষম করে তুলেছে এবং আগ্রাসন প্রতিরোধ করেছে।

ইসলামী দর্শনানুযায়ী উপাসনার স্বাধীনতা অর্থ হচ্ছে মানুষের কোনো আদর্শকে বেছে নেয়া এবং তার অনুসরণ করার ব্যাপারে স্বাধীন, সেটা ইসলাম হোক বা ভিন্ন আদর্শ। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার মানুষের একান্ত নিজস্ব এবং সে এ জন্যে দায়ী। ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ এ অধিকার রক্ষার, এ সিদ্ধান্তের প্রতিশ্রদ্ধা প্রদর্শনের এবং এ অধিকার প্রত্যেক দেশে সমুন্নত রাখতে এমনকি ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানার বাইরেও তার নিশ্চয়তা দানের জন্য আইনগতভাবে বাধ্য।

মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা এবং এ ক্ষেত্রে ইসলামী অনুশীলনকে উপলব্ধি করতে হলে আমাদেরকে এ বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধারণা ও মতবাদের মধ্যে পার্থক্য করতে শিখতে হবে। এসব ধারণা বা মতবাদকে সংক্ষেপে তিনটি বহুমাত্রিকতা হিসাবে গণ্য করা যায়। যেমন বিশ্বাসের বহুমাত্রিকতা, ইসলামী চিন্তাধারার বহুমাত্রিকতা এবং সামাজিক আচরণের বহুমাত্রিকতা।

বিশ্বাসের স্বাধীনতা

ইসলাম সকল মানুষের বিশ্বাসের স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। সুতরাং এই স্বাধীনতা ছিল সব ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা এবং যুলুম বা শক্তির বিরুদ্ধে ইসলামের বড় বড় লড়াইগুলোর ভিত্তি। এ ধারণার ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্র স্বয়ং তার অমুসলিম প্রজাদের উপাসনার স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়। এ ধারণা থেকে আমরা প্রিয় নবী (সা) বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ ও শাসকদের কাছে যেসব চিঠিপত্র দিয়েছিলেন তার অর্থ বুঝতে পারি। তিনি এসব পত্রে প্রজাদের উপর যুলুম অত্যাচার বন্ধ করার জন্য তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন যাতে প্রজারা উপাসনার স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে।

তিনি (মুসা) বললেন, সে সময় দূরে নয় যখন তোমাদের প্রভু তোমাদের শত্রুদের ধ্বংস

www.pathagar.com

করবেন এবং তোমাদের পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করবেন, যাতে তোমরা কি রকম কাজ করো তা তিনি দেখবেন (৭ : ১২৯)।

বলুন, হে মানুষ এখন তোমাদের প্রভুর কাছ থেকে তোমাদের কাছে প্রকৃত সত্য পৌঁছে গেছে। এখন যে লোক সত্য সোজা পথ অবলম্বন করবে তা তার নিজের কল্যাণের জন্যই অবলম্বন করবে এবং যে বিপথগামী হবে তার গোমরাহী তারই পক্ষে হবে ক্ষতিকর (১০ : ১০৮)।

(এমনই) হচ্ছে আল্লাহর কুদরতের বিস্ময়কর কীর্তি। যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে সুষ্ঠুভাবে মজবুত করে বানিয়েছেন (২৭ : ৮৮)।

সাবধান সৃষ্টি তাঁরই এবং সার্বভৌমত্বও তারই (৭ : ৫৪)।

মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার প্রকৃতি হচ্ছে এমন বিষয় যা তার সহজাত সাধারণ জ্ঞান সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারে। কুরআনে এরশাদ করা হয়েছে, মানব প্রকৃতির এবং সেই সত্তার শপথ যিনি তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন, পরে ওর পাপ এবং ওর পরহেজগারী তার প্রতি ইলহাম করেছেন। নিঃসন্দেহে কল্যাণ লাভ করলো যে, যে নিজের নফসের পবিত্রতা সাধন করলো এবং ব্যর্থ হলো সে যে তাকে দমন করলো (৯১ : ৭-৮)।

আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিসের মালিক কেবল আল্লাহ যেন আল্লাহ অন্যায়কারীদেরকে তাদের আমলের প্রতিফলন দেন এবং নেক ও ভালো আচরণকারীদেরকে শুভ প্রতিফল দিয়ে ধন্য করেন (৫৩ : ৩১)।

আল্লাহ তো আকাশমন্ডল ও জমিন যথাযথ সৃষ্টি করেছেন এ জন্য যে, প্রত্যেকটি প্রাণীকে যেন তার উপার্জনের প্রতিফল দেয়া যায় এবং লোকদের উপর কোনোরূপ যুলুম করা না হয় (৪৫ : ২২)।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা, স্বাধীন ইচ্ছা ও দায়িত্ব

মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা এবং এর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত দায়িত্বের ধারণা হচ্ছে তৃতীয় মৌলনীতি যার ভিত্তিতে ইসলামী চিন্তাধারা ও পদ্ধতিবিজ্ঞান গঠিত হয়েছে। আমরা স্বাধীন ইচ্ছার ধারণা এবং এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ব্যক্তিগত দায়িত্ব বুঝতে না পারলে জীবনের জন্য ইসলামের বাণীর অর্থ অথবা রাসূল (সা)-এর জীবনী ও জিহাদের অর্থ, অথবা পারসিক ও রোমানদের সঙ্গে প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের সংঘর্ষকে বুঝতে পারবো না। বিভিন্ন কর্ম ইচ্ছার বৈশিষ্ট্যমূলক গুণের ব্যাখ্যা দেয়। এটি কি ভালো বা মন্দ, এটি কি সত্য, ধার্মিকতা ও ইনসাফকে অনুসরণ করে নাকি ইচ্ছা তার নিজের আকাঙ্ক্ষার দ্বারা কলুষিত হয়। সর্বশেষ খলিফা হিসাবে ব্যক্তির ভূমিকার আলোকে কর্মের বিচার করা হবে এবং এ জীবনে ব্যক্তির ইচ্ছা ও কর্মের গুণের প্রতিফলন ও প্রতিনিধিত্ব হবে পরকাল।

www.pathagar.com

মানব প্রকৃতির এবং সেই সত্তার শপথ যিনি তাতে সুবিন্যস্ত করেছেন। পরে ওর পাপ ও ওর পরহেজগারী তার প্রতি ইলহাম করেছেন।

নিঃসন্দেহে কল্যাণ পেল সে, যে তার নিজের নফসের পবিত্রতা বিধান করলো এবং ব্যর্থ হলো সে তাকে দমন করলো (৯১ : ৭ - ১০)।

এ কুরআনকে আমরা সত্যতা সহকারে নাযিল করেছি এবং সত্যের সাথেই এটি নাজিল হয়েছে। (আর হে মুহাম্মদ) তোমাকে আমরা কেবল এ কাজ ছাড়া অন্য কিছুর জন্য পাঠাইনি যে, (যে মেনে নেবে তাকে) সুসংবাদ আর (যে মানবে না) তাকে সাবধান ও হুশিয়ার করে দেবে (১৭ : ১০৫)।

আমরা তাদের কাছে এমন একখানা কিতাব এনে দিয়েছি যাকে আমরা জ্ঞান ও তথ্যে সুবিস্তৃত করেছি এবং যারা ঈমান রাখে এমন সব লোকদের জন্য যা হেদায়াত ও রহমত স্বরূপ (৭ : ৫২)।

এ কুরআনকে আমরাই নাযিল করেছি এবং আমরা নিজেরা এর হেফাযতকারী (১৫:৯)।

যুলুম, অবিচার ও জোরজবরদস্তির দৃষ্টিভঙ্গি ইসলাম সমর্থন করে না অথবা ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিকে উপলব্ধির পথ সহজতর করে না। বরং এর পরিবর্তে এ ধরনের মনোভঙ্গি বা দৃষ্টিভঙ্গি বাণীর বিশুদ্ধতা, বাস্তবতা এবং ইসলামের লক্ষ্যসমূহের বিপরীতে আগ্রাসনের প্রতিনিধিত্ব করে। দীনের ব্যাপারে কোনো জোরজবরদস্তি নেই। প্রকৃত শুদ্ধ ও নির্ভুলতাকে ভুল চিন্তাধারা থেকে ছাঁটাই করে পৃথক করে রাখা হয়েছে (২ : ২৫৬)।

এখন যার ইচ্ছা সে মেনে নেবে আর যার ইচ্ছা অমান্য বা অস্বীকার করবে (১৮ : ২৯)।

তোমার প্রভু যদি ইচ্ছা করতেন সমগ্র মানবসমাজকে একই সমাজভুক্ত করে দিতে পারতেন (১১ : ১১৮)।

তবে তুমি কি লোকদের মুমিন হবার জন্যে জোরজবরদস্তি করবে (১০: ৯৯)।

যে কেহ নেক আমল করবে সে নিজের জন্যেই করবে আর যে অন্যায় করবে সে নিজেই তার পরিণতি ভোগ করবে। শেষ পর্যন্ত সবাইকে যেতে হবে তোমাদের রবের কাছে (৪৫:১৫)।

খোদায়ী ওহীর জ্ঞানের ভিত্তিতে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি অতীতে এবং এখনো তার শক্তিমত্তা এবং বিজয়ী হওয়ার সক্ষমতা নিশ্চিত। রাষ্ট্র যে শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা রাখে তার উপর নির্ভর করে নয় বরং এ জন্য যে ইসলাম বাস্তবতার প্রতিনিধিত্ব করে। সেটিই তা আসল শক্তি যতদিন ইসলামী দৃষ্টকোণ সঠিক পদ্ধতিবিজ্ঞান ও কাঠামোর অনুসরণ অব্যাহত রাখবে ততদিন তাকে কোনো সংঘর্ষ ও বৈপরীত্যকে ভয় করতে হবে না কারণ ইসলামী ফিতরাতের শক্তি সব সময়ই উম্মাহকে পরিচালনা করবে।

www.pathagar.com

ইসলামের সুরক্ষার একটি মাত্র পথই আছে, তা হচ্ছে তাকে জানা, বুঝা এবং উত্তম রূপে ব্যাখ্যা করা এবং ইসলামী পদ্ধতির কাঠামো যে নির্ভরযোগ্য তা নিশ্চিত করা। আদর্শিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতা সমৃদ্ধ ইসলামী রাষ্ট্রকে অথবা ইসলামী নীতিমালা, লক্ষ্য ও পদ্ধতিকে ভয় করার কোনো কারণ নেই। বাস্তবিকই, ইসলামের আদর্শিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতাকে ইসলামের দর্শন ও ইসলামী ব্যবস্থার ভয় করার কিছু নেই।

ইসলামী সমাজে চিন্তার স্বাধীনতা হচ্ছে গন্তব্য অভিমুখে প্রবহমান একটি গভীর নদীর মতো। এটি বিস্তার লাভ করে সত্যের অবস্থানের আপেক্ষিকতার ভিত্তিতে। মুসলিম চিন্তাধারায় সহিষ্ণুতা স্থান পেয়েছে, যা চিন্তা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা এবং বিরোধী বুদ্ধিবৃত্তিক ও আদর্শিক অবস্থানের সংখ্যাধিক্যের দায়িত্ব গ্রহণ করে। উম্মাহর অভ্যন্তরে বিরোধী মতামতসমূহ তার ভিত্তিগুলোকে ধ্বংস করে দেবে এমন কোনো আশঙ্কা নেই। বরং ইসলাম ভারসাম্যের জন্য স্থান করে দেয় এবং স্থিতিশীলতা ও প্রবৃদ্ধি উপহার দেয়। কারণ ইসলামী চিন্তাধারা দিকনির্দেশনা, মূল্যবোধ, ধারণা, মতবাদ এবং ওহীর নীতিমালার ভিত্তিতে গঠিত অন্তরদৃষ্টির (vision) কারণে মজবুত থাকবে। যে উম্মাহ তার মূলনীতির ব্যাপারে একমত তার কাছ থেকে ক্রমোন্নতি ও সৃজনশীলতা অবশ্যই বেরিয়ে আসবে।

জনগণকে তাদের স্বাধীনতার অধিকার বিশেষ করে বিশ্বাসের স্বাধীনতাকে ভোগ করার ও অনুশীলনে সক্ষম করে তুলতে হলে সাংস্কৃতিক পরিপক্কতা একটি প্রয়োজনীয় শর্ত। কারণ আদিম সাংস্কৃতিক পরিবেশ অথবা কোনো এক ধরনের বেদুইনবাদের সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা, বর্বরতা অথবা মানসিক দিক থেকে যে অপরিপক্ক সে দায়িত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষম। অবশ্যই এ অবস্থা তাকে স্বাধীনতার অধিকার ভোগ করার ক্ষেত্রে অযোগ্য করে তুলবে। এর দ্বারা এ বুঝায় যে, সে পরিপক্ক না হওয়া পর্যন্ত তাকে লালন করতে হবে অথবা সে সময় পর্যন্ত তাকে স্বাধীনতার অধিকার দেয়া উচিত নয় অথবা তাকে এর দায়িত্বভার গ্রহণ করতে দেয়া উচিত নয়। শুরুতে মরুভূমির আদিম ও পৌত্তলিক গোত্রগুলোর সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলাম এটিই করতে চেয়েছে। প্রত্যেকটি সম্ভাব্য উপায়ে ইসলাম তাদেরকে আদিম আচার অনুষ্ঠান ও ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে মুক্তিলাভের জন্য সাহায্য-সহায়তা দিয়েছে, তখন পর্যন্ত তারা যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতায় নিমজ্জিত তা থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছে এবং মুসলমান জাতি ও তাদের মিত্রদের প্রতি পৌত্তলিক আরবদের বৈরিতা অবসান করতে চেয়েছে। মানুষের প্রতি মুসলিমদের দায়িত্বানুভূতি তাদের বাধ্য করেছিল এসব বর্বর গোত্রগুলোকে ইসলামী সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার ছায়াতলে আশ্রয় দিয়ে তাদের বর্বর সামাজিক আচরণবিধি ও পৌত্তলিক কল্পকাহিনীর হাত থেকে উদ্ধার করতে। সুতরাং ইসলাম এসব গোত্র সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করলো যে, তাদের বিষয়টি মানুষের ইচ্ছার এবং উপাসনার স্বাধীনতার বিষয় নয়

www.pathagar.com

বরং তা হচ্ছে তাদেরকে ইসলামী ব্যবস্থার অধীনে নিয়ে এসে তখনো পর্যন্ত যে বর্বরতার মধ্যে তারা অবস্থান করছিল তা থেকে তাদের অব্যাহতি দেয়ার বিষয়।

তাদের মধ্যে সেই লোকেরা যাদের সাথে তুমি সন্ধি চুক্তি করেছ পরে তারা প্রত্যেকটি সুযোগেই সেটি ভঙ্গ করে এবং আল্লাহকে একবিন্দু ভয় করে না (৮ : ৫৬)।

কোনো ঈমানদার ব্যক্তির ব্যাপারে এরা না নিকট আত্মীয়তার কোনো খেয়াল করে আর না কোনো চুক্তির দায়িত্ব পালন করে। অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি সব সময় তাদের পক্ষ থেকেই হয়েছে (৯ : ১০)।

হে ঈমানদার ব্যক্তিগণ, মুশরিক লোকেরা নাপাক। অতএব, এ বছরের পরে তারা যেন মসজিদে হারামের কাছেও না আসতে পারে (৯ : ২৮)।

আর মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমরা সকলে মিলে লড়াই করো যেমন করে তারা সকলে মিলে তোমাদের সাথে লড়াই করেছে, আর জেনে রাখো আল্লাহ মুত্তাকী লোকদের সঙ্গেই আছেন (৯ : ৩৬)।

হে ঈমানদার লোকেরা এ কাফেরদের সাথে লড়াই করো, যেন শেষ পর্যন্ত ফেতনা খতম হয়ে যায় এবং দীন পুরোপুরিভাবে আল্লাহরই জন্য হয়ে যায়। পরে যদি তারা ফেতনা থেকে বিরত থাকে তবে তাদের আমল আল্লাহ দেখছেন (৮ : ১৪)।

এ মরুচারী লোকেরা বলে আমরা ঈমান এনেছি। তাদের বলো তোমরা ঈমান আনোনি বরং বলো যে আমরা অনুগত হয়েছি। ঈমান এখনো তোমাদের দিলে প্রবেশ করেনি। তোমরা যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ করো, তাহলে তিনি তোমাদের আমলসমূহের প্রতিফল দানে কোনোরূপ কমতি করবেন না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড়ই ক্ষমাদানকারী ও দয়াবান (৪৯ : ১৪)।

আদিম পৌত্তলিক মরুচারী আরবদের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে কল্যাণ কামনা এবং ইচ্ছার স্বাধীনতার অধিকার অর্জনের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা। যোগ্য ব্যক্তিদের ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কিত ইসলামের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পেছনে সরে আসার প্রশ্ন নয়। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সুস্পষ্ট। ইসলাম আহলে কিতাবদের (ইহুদী ও খৃস্টান) শত্রুতা ও আগ্রাসী চক্রান্ত সত্ত্বেও তাদের উপাসনার স্বাধীনতার অধিকার প্রদান করেছে এবং তা রক্ষা করেছে। ইসলাম ধর্মগ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত এ অধিকারটি যারা অন্যান্য সভ্যতার অনুসারী তাদেরকেও দিয়েছিল। এ অধিকার ভোগকারী ছিলেন পারসিক ও ম্যাজিয়ানরা (magians)। অথচ তারা ছিলেন পৌত্তলিক এবং অগ্নি উপাসক। সুতরাং এটি সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত যে, উপাসনার স্বাধীনতা একটি মৌলিক ইসলামী ধারণা। এ বিষয়টি সঠিকভাবে উপলব্ধি করা না গেলে ইসলামী সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা, পদ্ধতি প্রণয়ন ও প্রয়োগ কখনো সঠিক হবে না।

www.pathagar.com

চিন্তার স্বাধীনতা

মানবীয় চিন্তাধারায় স্বাধীনতার বহুমাত্রিকতা উপাসনার স্বাধীনতা থেকেই উদ্ভূত হয় এবং তাকে পরিপূর্ণ করে। চিন্তাধারার স্বাধীনতা মানুষের নৈতিক স্বাধীনতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত, তবে এটি আদর্শিক অঙ্গীকারের কাঠামোর অভ্যন্তর থেকেই বেরিয়ে আসে। একটি ইসলামী সমাজে প্রতিটি মানুষ সচেতন নৈতিক প্রত্যয় অনুযায়ী কাজ করার আদর্শিক অথবা বুদ্ধিবৃত্তিক বাছাই করার এবং এসব প্রত্যয় ও বাছাইয়ের ভিত্তিতে কাজ করার ব্যাপারে স্বাধীন। কোনো বিষয়ে যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে যদি কেউ দৃঢ় প্রত্যয়ী না হয় অথবা তার প্রকৃতির বিরুদ্ধে বলে যা সে স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে গ্রহণ করেনি অথচ তাকে যদি সে কাজ করতে বাধ্য করা হয়, তাহলে তা হবে ইসলামের দৃষ্টিতে অগ্রহণযোগ্য। সুতরাং ইসলামী পদ্ধতিবিজ্ঞান ও চিন্তাধারা অনুযায়ী চূড়ান্ত ও শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার ব্যক্তির এবং তাকে (পুরুষ বা স্ত্রীলোক) শুধু জিজ্ঞাসা করা হবে। এ পছন্দ বা বাছাইয়ের পরিণাম বা ফলাফলই তাকে এ পৃথিবীতে ও পরজগতে বহন করতে হবে। তোমার হৃদয়ের সাথে পরামর্শ করো... এমনকি যদিও মানুষ বারবার তোমাকে তাদের আইন সম্মত মতামত জানিয়ে দিয়ে থাকে (আহমদ)।

যে গোমরাহী হয় তার এ গোমরাহ খারাপ পরিণাম তারই উপর পড়বে। কোনো বোঝা বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না (১৭ : ১৫)।

অস্তিত্বের উদ্দেশ্য উপলব্ধি এবং খলিফার দায়িত্ব পালন করার জন্য চিন্তার স্বাধীনতা এবং বুদ্ধিবৃত্তির প্রত্যয় হচ্ছে মৌলিক প্রয়োজন। ন্যায়নীতি বিরুদ্ধ এবং চিন্তা ও প্রত্যয়ের অপব্যবহার জীবনের অর্থ ও দায়িত্বকে অস্বীকার করে এবং এটি ইসলামী পদ্ধতিবিজ্ঞান মোটেই মেনে নেয় না। উপাসনা ও চিন্তাধারার স্বাধীনতার অধিকারের প্রতি অঙ্গীকারের ভিত্তিতেই কেবল ইসলামী চিন্তাধারা নির্মাণ করা যায়। ইসলামী সমাজের অভিধানে আমরা সে সমাজকে চিহ্নিত করতে পারি যেখানে সৃজনশীলতার জন্য স্বাধীনতা আছে। তবে উপসংহারে, সে সমাজের অগ্রগতি, নীতিসমূহ এবং সৃজনশীলতা শুধু অস্তিত্বের উদ্দেশ্যের সাথেই সম্পর্কিত থাকে, সে উদ্দেশ্য হচ্ছে সংস্কারের যা বিগড়ে দেয়ার নয়। অনুরূপভাবে সামাজিক আচার-আচরণ ও উপাসনা চিন্তার অধিকারের উপর ভিত্তিশীল। এটি কোনো তাত্ত্বিক বা বিমূর্ত বিষয় নয় বরং একটি বাস্তব বিষয়।

মানবীয় আচার-আচরণ ও কাজের একটি যৌথ বা সামষ্টিক প্রকৃতি রয়েছে অর্থাৎ সেগুলো এ শর্তে সম্পাদান করতে হবে যে, তারা সম্পদের উপর পরস্পর ক্রিয়াশীল হবে এবং সমাজের পরিপূরক হবে। সামাজিক আচরণের সামষ্টিক বহুমাত্রিকতা থেকে ব্যক্তির ইচ্ছা দাবিয়ে রাখা বুঝায় না। এর পরিবর্তে এ কথা বুঝতে হবে যে, সমাজে কাজের স্বাধীনতাকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

www.pathagar.com

ব্যক্তির উপাসনা ও চিন্তার অধিকার সমাজের বিশ্বাস ও কর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। অনুরূপভাবে (ঈমান ও আমল) সমাজের বিধিবিধান, আইন ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্দেশ্য হবে সমাজ যেসব লক্ষ্যের ব্যাপারে একমত হয়েছে সেগুলো হাসিল করা। ব্যক্তিকে এসব সীমারেখার ভিতরে অবস্থান করে তার সক্ষমতাকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে তৎপরতার চালিয়ে যাবার সুযোগ করে দেয়া, তাকে নিজ কাজের মাধ্যমে তার ইচ্ছার অভিব্যক্তি, চিন্তা ও প্রত্যয়ের ধরন প্রকাশে সাহায্য করা। সংখ্যাগরিষ্ঠদের দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে সমাজের বিধিবিধান ও সামাজিক পদ্ধতি। এমনকি ব্যক্তির যদি এমন কোনো বিশ্বাস থাকে যা তার দৃঢ় প্রত্যয়ে থেকে উৎসারিত তারপরও সে জনগণের প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনো কাজ করতে পারে না। কারণ সমাজের বিধিবিধানকে গ্রাহ্য না করে চিন্তাধারা ও প্রত্যয়ের স্বাধীনতার ভিত্তিতে ব্যক্তির আচার-আচরণ সে স্বাধীনতাকে সমাজের সর্বত্র বিভ্রান্তি ছড়ানোর একটি উপায়ে পরিণত করবে। এ পরিস্থিতিতে সকল স্বাধীনতাই তাদের অধিকার হারাবে এবং মানব অস্তিত্বের সব অর্থই হারিয়ে যাবে। কোনো কাজ জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ঐক্যমতে নির্ধারিত লক্ষ্য ও বিধিবিধানের অনুগামী কি না তার উপর সে কাজের বৈধতা নির্ভর করে। অপরদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সিদ্ধান্তের বৈধতা হচ্ছে মানব অস্তিত্বের মৌলিক লক্ষ্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে ইসলামী মতবাদ অনুযায়ী পৃথিবীতে খলিফা হওয়া। কারণ বিধিবিধানকে লঙ্ঘন করলে খিলাফতের দায়িত্ব বৈধতা হারিয়ে ফেলে। যা হোক বিধিবিধানগুলো ব্যক্তির বিশ্বাস ও চিন্তাধারার অধিকার সংরক্ষণের জন্য তৈরি না হয়ে থাকলে সেগুলো তাদের বৈধতা হারিয়ে ফেলবে। মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরে মুসলমানদের আচার-আচরণ ও জনগণের জন্য আইন প্রণয়ন ব্যবস্থা ইসলাম এবং তার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, নীতিবোধের প্রতি অঙ্গীকারের কাছে বৈধতা লাভ করে। মুসলিম সমাজের আইন প্রণেতারা তাদের প্রস্তাবিত বিধিবিধানে ইসলামের লক্ষ্যসমূহ ও মূল্যবোধকে অবজ্ঞা করতে পারে না। কারণ সেসব আইনকানুন মানুষের মধ্যেকার অনন্ত সম্ভাবনার বিকাশ ঘটাতে চায় যাতে পৃথিবীতে খলিফা হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে। একইভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানেরা ইসলামের প্রতি তাদের অঙ্গীকার ভিত্তিতে মুসলিম ব্যবস্থায় আইনের যে সংজ্ঞা দিয়েছে একজন মুসলিমের কার্যকলাপ ও আচরণ তা অবহেলা করতে পারে না।

ইসলামী ব্যবস্থার অন্যতম মৌলনীতির বাইরের জিনিসগুলোকে ওহীর সুস্পষ্ট কালামের দ্বারা বিশেষভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে অথবা যা সমাজের মূল স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবে এমন বিষয় ক্ষমা ব্যতীত অবশিষ্ট সব কিছুই বৈধ (হালাল)।

এ নীতির আলোকে আমরা সৎ কাজের আদেশ দান এবং অসৎ কাজে নিষেধ করা (আল আমর বিল মারুফ ওয়া আল নাহি আনিল মুনকার)– এ ইসলামী মতবাদটি বুঝতে পারি। চিন্তা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা হিসাবে এ মতবাদকে উপদেশ, পরামর্শ, পথ-নির্দেশ ও

www.pathagar.com

নেতৃত্বের প্রতীকরূপে গণ্য করা যেতে পারে। এ মতবাদ সামাজিক আচরণরীতি হিসাবে জিহাদ, কর্মশক্তির প্রয়োগ, ত্যাগ এবং সমাজ ধ্বংস হয়ে যাওয়া এবং নতুন সমাজ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্য এবং সংস্কার সাধনের স্বপ্ন হারিয়ে ফেলার হাত থেকে রক্ষার প্রতীক।

তাওয়াক্কুল নীতি

তাওয়াক্কুল অর্থ জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর উপর আস্থা এবং আল্লাহর দেয়া তকদীর (কাজা ও কদর) মেনে নেয়া। তাওয়াক্কুল বলতে বোঝায়, একজন বিশ্বাসীর অন্তরে আল্লাহর শক্তি, প্রজ্ঞা ও ইনসাফের উপর বিশ্বাস স্থাপন। সে বিশ্বাস করে যে, সকল বিষয়ের উপর আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।

মুমিনের তাওয়াক্কুল এ বিশ্বাস থেকে উৎসারিত হয় যে, অদৃশ্য জগত এবং অদৃশ্য জগতের নির্ধারিত সত্য এসব কিছুই দুনিয়া ও বেহেশতের মালিক আল্লাহ নিয়ন্ত্রণ করে, এ সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান শুধু তাঁরই আছে। মুসলমানের তাওয়াক্কুল সম্পর্কিত উপলব্ধি একটি স্বাভাবিক ও সূক্ষ্ম উপলব্ধি। এটি তার মনস্তাত্ত্বিক শক্তি ও সক্রিয়তার অন্যতম উৎস। এ উৎস থেকেই আসে ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, দৃঢ় সংকল্প, সন্তোষ ও সুখ।
(তাদের বলো) এ কাজের সব ইখতিয়ার আল্লাহর হাতে (৩ : ১৫৪)।
সাবধান, সৃষ্টি তাঁরই এবং সার্বভৌমত্বও তাঁরই (৭ : ৫৪)।
তোমরা সঠিক জ্ঞানের কম অংশই পেয়েছ (১৭ : ৮৫)।

তাঁর জ্ঞাত বিষয়সমূহের মধ্য থেকে কোনো জিনিসই তাদের জ্ঞানসীমার আয়ত্বাধীন হতে পারে না। অবশ্য কোনো বিষয়ের জ্ঞান তিনি নিজেই যদি কাউকে জানাতে চান, হে আমাদের রব তুমি তোমার রহমত ও জ্ঞান দ্বারা সবকিছুই গ্রাস (২ : ২৫৫) করে রেখেছো (৪০ : ৭)।

আল্লাহর নির্ধারিত তকদীরে মুসলমানের বিশ্বাস এবং তার চিন্তাধারার পদ্ধতি হচ্ছে যে, পরিণামে সব কিছু কল্যাণের জন্যই হবে, কারণ একজন মুসলিম যখন সুখে থাকে তখন সে আল্লাহকে ধন্যবাদ দেয় এবং দুঃখ, কষ্ট ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সে হয় ধৈর্যশীল। একইভাবে এ জীবনে যদি তার সৌভাগ্য লাভ ঘটে, সে সন্তুষ্ট হবে এবং দুর্ভাগ্য তার উপর আপতিত হলে সে হবে ধৈর্যশীল ও আল্লাহর উপর আস্থাবান। আখেরাতের জীবনে সে তার পুরস্কার পাবে। খোদায়ী তকদীরে মুসলিমের বিশ্বাস হচ্ছে যে, একজন মুসলমানের প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত সফল হবে এ জীবনে বস্তুগতভাবে তার সব কর্মকান্ড যত সফল বা ব্যর্থ হোক না কেন। তাদের বিশ্বাস, শেষ পর্যন্ত সত্যই বিজয়ী হবে, সত্যের জন্যে উম্মাহর জিহাদ পরিণামে জয়যুক্ত হবে যখন সব মানুষই আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে তখন মিথ্যা ব্যর্থ হবে এবং তার অনুসারীরা সত্য ও অসত্যের সংগ্রামে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হবে।

www.pathagar.com

আমরা তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষার সম্মুখীন করবো যেন আমরা তোমাদের অবস্থা যাচাই করতে পারি এবং তোমাদের মধ্যে মুজাহিদ ও নিজস্থানে অবিচল কে তা জানতে পারি (৪৭ : ৩১)।

আমরা ভালো ও মন্দ অবস্থায় ফেলে তোমাদের সবাইকে পরীক্ষা করছি। শেষ পর্যন্ত তোমাদের সবাইকে আমাদের কাছেই ফিরে আসতে হবে। (২১ : ৩৫)।

আর যারা আমাদের পথে চেষ্টা-সাধনা করবে তাদের অবশ্যই আমরা আমাদের পথ দেখাব। (২৯ : ৬৯)।

আল্লাহর পথে জিহাদ কর, যেমন জিহাদ করা উচিত (আন্তরিকতার সাথে সুশৃঙ্খলভাবে)। (২২ : ৭৮)

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা যদি আল্লাহর সাহায্য করো, তাহলে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের ভিত্তি সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন। (৪৭ : ৭)।

আমি তো সংশোধন করতে চাই, যতখানি আমার সাধ্যে কুলায়, আর যা কিছু আমি করতে চাই, তার সব কিছুই আল্লাহর তাওফিকের ওপর নির্ভরশীল। তাঁরই উপর আমার ভরসা এবং আমি সব ব্যাপারে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করি। (১১ : ৮৮)

আমলকারী লোকদের জন্য এটি কতই না উত্তম প্রতিদান সেসব লোকের জন্যে যারা সবর করে আর নিজেদের খোদার ওপর ভরসা করে। (২৯ : ৫৮-৫৯)।

আর যা কিছু আল্লাহর নিকট আছে তা যেমন উত্তম, উৎকৃষ্ট, তেমন স্থায়ীও। আর তা সে লোকদের জন্য যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের খোদার উপর নির্ভরতা রাখে। (৪২:৩৬)

আর সব ব্যাপারেই তারই দিকে ফিরে যায়। অতএব, তুমি তাঁরই বন্দেগী কর এবং তাঁরই উপর ভরসা রাখো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে। (১১ : ১২৩)

এখানে পার্থক্য করা দরকার। তাওয়াক্কুল আর তাওয়াকুল (অদৃষ্টবাদী আত্মসমর্পণ) একই বিষয় নয়। খোদায়ী তকদির যা আল্লাহ ছাড়া কখনো কেউ জানতে পারে না, বুঝতে পারে না অথবা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না তা বিশ্বাস করা ও মেনে নেয়া হচ্ছে একজন মুসলিমের জন্য তাওয়াক্কুল। অপরদিকে তাওয়াকুলের অর্থের মধ্যে রয়েছে জড়তা, অক্ষমতা এবং সাধারণ অযোগ্যতার উপাদান কেননা আল্লাহ মানবজাতির জন্য যে আইন বিধান ও আদর্শ দিয়েছেন সে অনুযায়ী চেষ্টা সাধনা চালিয়ে যেতে অস্বীকৃতিই হচ্ছে তাওয়াকুল। তাওয়াকুল ধারণার মধ্যে অদৃষ্টবাদ দৃঢ়ভাবে অবস্থান করছে। এটি একই সাথে আল্লাহর নির্দেশের প্রতি অবাধ্যতার এবং ফিতরাত বা মনের প্রকৃতির অবজ্ঞা করা বুঝায়। জানতে চেষ্টা করা, সঠিক উপায়টি ব্যবহার করা এবং প্রাকৃতিক আইন অনুসরণে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় তা আল্লাহর উপর আস্থা অথবা তাওয়াক্কুল

www.pathagar.com

থেকে আসে না। বরং সঠিক উপায় খুঁজে বের করে ব্যবহার করাই হচ্ছে এ জীবনে মানুষের দায়িত্বের সারকথা। কিন্তু তাওয়াক্কুল এ ধরনের বিশ্বাসের বিচ্যুতি। এ কারণেই যখন একজন বেদুইন তাওয়াকুলকে তাওয়াক্কুলের সাথে গুলিয়ে ফেলে রাসূল (সা)-এর কাছে এ বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তখন প্রিয়নবী (সা) বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে বললেন, "যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করো, তারপর আল্লাহর উপর তুমি নির্ভর করো।"

একই নীতি অনুসরণ করে ওমর ইবনে আল-খাত্তাব (রা) তাদের প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন যখন তারা একটি প্লেগ আক্রান্ত দেশে প্রবেশে ওমর (রা)-এর অস্বীকৃতি জানানোকে আল্লাহর তকদির থেকে পলায়ন বলে ধারণা করেছিলেন। তাদের ধারণা ছিল যে, সঠিক উপায় অন্বেষণে অথবা আল্লাহ বিশ্বের উপর যে প্রাকৃতিক আইন চাপিয়ে দিয়েছেন সে অনুযায়ী কাজ করতে ব্যর্থ হওয়াই হচ্ছে সত্যিকার তাওয়াক্কুল এবং আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতা। ওমর (রা) সুস্পষ্টভাবে জানালেন, "আমি আল্লাহর এক তকদির থেকে অপর এক তকদিরের দিকে পালিয়ে যাচ্ছি।"

কেউ যদি সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়, সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তকদির এবং কেউ যদি সে সংক্রামক রোগ থেকে নিজেকে বাঁচাতে চায় সেটিও হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি তকদির। সব কিছুই আল্লাহর ইচ্ছায় ঘটে এবং প্রাকৃতিক আইনের সাথে সংগতি রেখে যথোপযুক্ত উপায় ব্যবহারের প্রচেষ্টা চালানো ও আল্লাহর তকদির থেকেই উদ্ভূত হয়। এটি তাকে মান্য করার একটি পথ। নিশ্চিতভাবেই বলা যায় এর দ্বারা কুফর বুঝায় না অথবা কোনো ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করছে না তাও বুঝায় না।

'তাওয়াক্কুল' ও 'তাওয়াকুল'-এর অর্থের মধ্যে এ সুস্পষ্ট পার্থক্যের পর এবং মানুষের ফিতরাতের প্রেরণার আলোকে এবং মানুষের প্রতি পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা হওয়ার, পৃথিবীকে পরিচালনা করার এবং তাকে পালন করার জন্য আল্লাহর নির্দেশ থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, 'তাওয়াকুল একটি অস্বাভাবিক ধারণা। ইসলাম নিশ্চিতভাবেই তা শিখায় না। অপর দিকে তাওয়াক্কুলের অর্থের সাতে এর কোনো সম্পর্ক নেই। অথবা প্রথম যুগের মুসলমানের ঈমানের সাথে এর কোনো মিল নেই। বাস্তবিকই এটি রাসূল (সা) ও তাঁর সাহাবীদের জীবনের প্রতিটি দিক, তাঁদের জিহাদ, প্রাকৃতিক আইনের সাথে সংগতি, তাঁদের কৃত কর্মকান্ড, তাঁদের পরিকল্পনা এবং তাঁদের চিন্তার পদ্ধতি এসবেরই বিরোধী।

মানব প্রকৃতির কার্যকারণ সম্বন্ধ

আমরা উপরিউক্ত বিষয়গুলো উপলব্ধি করতে পারলে মুসলিম জীবন ও চিন্তাধারার একটি মৌলিক ধারণাও বুঝতে সক্ষম হবো। ফিতরাত এবং আকিদা একথা বুঝিয়ে দেয় যে,

www.pathagar.com

আল্লাহ বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, একে আইন বিধান ও মানদন্ডের অধীন করেছেন, তারপর এ বিশ্বকে মানুষের কাছে সোপর্দ করেছেন, একে লালন করা, এর উপর প্রভুত্ব করা এবং একে সভ্য করা ও সংস্কার করার জন্য। মানুষকে তার দায়িত্ব পালনে এবং প্রাকৃতিক আইনের সাথে মিল রেখে সঠিক মাধ্যম বা উপায় ব্যবহার করে তার ইচ্ছা ব্যক্ত করার সামর্থ্য দিয়েছেন। সুতরাং সঠিক উপায় অবলম্বন না করা এবং সেগুলোকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ না করা পর্যন্ত মুসলিম মন ও ফিতরাতের পক্ষে তাদের দায়িত্ব পালন এবং গোটা সৃষ্টিকে পরিচালনা করা এবং অধীনে নিয়ে আসার জন্যে আর কোনো উপায় বা পথ নেই।

যিনি জমিন ও আসমানসমূহের বাদশাহীর মালিক, যিনি কাকেও পুত্র বানিয়ে নেননি, যার সাথে বাদশাহীতে কেউ শরিক নেই, যিনি সব জিনিসই পয়দা করেছেন এবং পরে তার একটি তকদির নির্দিষ্ট করেছেন। (২৫ : ২)।

(হে নবী) তোমার মহান শ্রেষ্ঠ খোদার নামের তসবিহ করো যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং ভারসাম্য স্থাপন করেছেন, যিনি তকদির নির্দিষ্ট করেছেন, পরে পথ দেখিয়েছেন। (৮৭:১৩)।

এমনই আল্লাহর কুদরতের বিস্ময়কর কীর্তি, যিনি প্রতিটি জিনিসকেই সুষ্ঠুভাবে মজবুত করে বানিয়েছেন। তোমরা কি করছ তা তিনি ভালোভাবেই জানেন। (২৭ : ৮৮)

প্রতিষ্ঠিত আকাশমন্ডল ও জমিন যথাযথ সৃষ্টি করেছেন, এ জন্যে যে প্রতিটি প্রাণীকে যেন তার উপার্জনের প্রতিফল দেয়া যায়। তবে এ কথা ঠিক যে, তাদের উপর কোনো যুলুম করা যাবে না। (৪৫ : ২২)

তোমাদের আগেও বহুযুগ অতীত হয়েছে। পৃথিবীতে ঘুরে ফিরে দেখ আল্লাহর (আদেশ ও বিধান) অমান্যকারীদের পরিণতি কি হয়েছে। (৩ : ১৩৭)

আমরা তাকে জমিনে আধিপত্য দান করেছিলাম এবং তাকে সব রকমের উপায় উপাদানও দান করেছিলাম। (১৮ : ৮৪)

তোমরা আল্লাহর নিয়মনীতিতে কোনো পরিবর্তন পাবে না। আর আল্লাহর বিধানকে তার জন্য নির্দিষ্ট পথ থেকে কোনো শক্তি ফিরাতে পারে না। (৩৫ : ৪৩)

এ যে কোনো বোঝা বহনকারী অন্য কোনো লোকের বোঝা বহন করবে না এবং এ যে, মানুষের জন্যে কিছুই নেই, কিন্তু শুধুই তাই, যার জন্যে সে চেষ্টা করেছে এবং এ যে তার চেষ্টা-প্রচেষ্টা খুব শিগগিরই দেখা হবে এবং তার পূর্ণ প্রতিফল তাকে দেয়া হবে। (৫৩ : ৩৮-৪১)

তিনি জমিন ও আকাশমন্ডলের সব জিনিসকেই তোমাদের জন্য অধীন ও নিয়ন্ত্রিত করেছেন। সব কিছুই তাঁর নিজের নিকট থেকে, এতে বড়ই নিদর্শন রয়েছে সব লোকের জন্য যারা চিন্তাভাবনা ও গবেষণা করতে অভ্যস্ত। (৪৫ : ১৩)

www.pathagar.com

.....যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে দেন উত্তম পুরস্কার। (৫৩ : ৩১)

তিনিই মৃত্যু ও জীবন উদ্ভাবন করেছেন, যেন তোমাদের পরখ করে দেখতে পারেন যে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? (৬৭ : ২)

জমিনে তোমাদেরকে খলিফা বানাবেন, তারপর তোমরা কি রকম কাজ কর তা তিনি দেখবেন। (৭ : ১২৯)

আমরা এ আসমান ও জমিন এবং এদের মধ্যে আর যা কিছু আছে খেলার ছলে সৃষ্টি করিনি। (২১ : ১৬)

জীবনের অর্থের এ উপলব্ধি মানুষের সামনে এ কথা সুস্পষ্ট করে দেয় যে, আল্লাহ সমগ্র সৃষ্টির জন্য যে প্রকৃতির আইন নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তা মানুষ যেভাবে ব্যবহার করে তার উপর তাদের এ জীবনের দায়িত্ব নির্ভর করে। মানুষ কী উপায়ে এসব আইনকে ব্যবহার করে তাকে কেন্দ্র করেই মানুষের ভূমিকা আবর্তিত হয়। তারপর বাস্তব উদ্দেশ্যের জন্যে উদ্ভাবনী পন্থায় সৃষ্টিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ উন্নত হয় এবং সমৃদ্ধ হয়।

মানুষ কার্যকারণ সম্বন্ধ বা হেতুবাদের নীতিকে যথাযথভাবে উপলব্ধি না করা পর্যন্ত তাদের কাজের জন্য কীভাবে দায়ী তা কখনো বুঝতে পারবে না। যখন তাদের মন নতুন কিছু আর সৃষ্টি করতে পারে না তখন তাদের কর্মকান্ড হবে প্রায় মৃত এবং ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করা এবং উপলব্ধি করার ক্ষমতা হ্রাস পাবে। এ থেকে রাসূল (সা)-এর পদ্ধতিবিজ্ঞান, জিহাদ, ইজতিহাদ, সংগঠন, চিন্তা এবং প্রাকৃতিক আইনের জন্যে শ্রদ্ধার সাফল্যের কারণ বুঝতে পারা যায়।

প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে মুসলমানদের শক্তি, সামর্থ্য, সক্ষমতা এবং সৃজনশীলতার ভিত্তি আমরা খুঁজে পাই বিশ্বাসে এবং প্রাকৃতিক আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সঠিক উপায় ও পন্থা আবিষ্কার ও ব্যবহারের গভীর প্রত্যয়ে। যখন মুসলমানরা শক্তি, সক্ষমতা ও সৃজনশীলতার রীতিনীতি প্রয়োগ করে একমাত্র তখনই তারা সত্যিকারের বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুত সাহায্য, দুর্দশায় ত্রাণ এবং সাফল্য লাভের উপযুক্ত হয়ে ওঠে।

প্রাথমিক যুগের মুসলিম প্রজন্ম এসব উপলব্ধি করেছিল এবং এর ফলে তারা সফল হয়েছিল। আজকের যুগের মুসলমানদের যদি সাফল্য ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের কোনো ধারণা থাকে, তারা তা করবে তখনই যদি তারা তাদের রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, শৈল্পিক, সামাজিক, প্রযুক্তিগত লক্ষ্য বা অন্য কিছু হাসিলের জন্য সঠিক উপায় অন্বেষণ করে।

মুসলমানেরা তাদের ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে সন্তুষ্টচিত্তে বসবাস করে যদি পরিতৃপ্ত থাকে তাহলে আল্লাহ তাদের জন্য যা কিছুর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা তিনি পূরণ করবেন তা বাস্তব সম্মতভাবে আশা করতে পারে না। তারা যদি শুধু ধর্মতত্ত্বের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে

www.pathagar.com

আলোচনার বাইরে ভিন্ন কিছু নিয়ে চিন্তাভাবনা না করে তা অব্যাহতভাবে পশ্চাৎপদতায় নিমজ্জিত থাকবে। খাঁটি মুসলিমের জন্যে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা বিশ্বজাহানের প্রাকৃতিক শৃঙ্খলার সাথে মিল রেখে কাজ না করে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের ফিতরাতের চাহিদাকে উপলব্ধি না করে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের আদর্শ থেকে পথ নির্দেশনা না দেয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তারা বিশ্বের সাথে দায়িত্বশীল আচরণ করার জন্যে আল্লাহর নির্ধারিত পদ্ধতি বিজ্ঞান গ্রহণ না করে, তারা ভিন্ন কোনো উপায়ে সত্যিকার অর্থে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারবে না। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং আল্লাহ অপেক্ষা সত্যবাদী আর কে হতে পারে। (৮ : ১২২)

ইসলামী পদ্ধতিবিজ্ঞান : উপায় ও প্রয়োগ

ইসলামী চিন্তাধারার পদ্ধতিবিজ্ঞান যেসব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় তা নিয়ে এখন আলোচনা করা যাক। অনগ্রসরতার প্রভাব, বুদ্ধিজীবী নেতৃত্বের বিচ্ছিন্নতা, পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতার নিরিখে ধর্মীয় ধারণার উপলব্ধির কারণে যেসব ক্ষেত্রে ইসলামী চিন্তাধারা ও পদ্ধতিবিজ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করা যেত, সেসব ক্ষেত্র থেকে তাকে বিশ্বাসীদের ব্যক্তিগত ও আধ্যাত্মিক বিষয়সমূহে পুরোপুরি ঠেলে দিয়ে নির্বাসন দেয়া হয়েছে। সাদামাটাভাবে বলতে হয় এ অনন্য চিন্তাধারা ও পদ্ধতিবিজ্ঞানের পরিধি ও সুযোগ বৃহত্তর ও সম্ভাবনাশীল।

এটি সুস্পষ্ট যে, ইসলাম বিশ্বাসীদের সব প্রচেষ্টাকে খলিফা হিসাবে তাদের ভূমিকা পালনের দিকে পরিচালনা করে। মুসলমানদের উপলব্ধি করতে হবে যে, দৃশ্যমান জগতের সব কিছু তাদের বৈধ কর্মক্ষেত্র। সেখানে তারা তাদের শক্তি ও সামর্থ্য, তাদের যা প্রয়োজন তারা ব্যবহার করতে পারে এবং তারা অদৃশ্য জগত থেকে অবতীর্ণ ওহী ও আল্লাহর জ্ঞানের ব্যাখ্যা অনুযায়ী মানুষের অস্তিত্বের উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত পথ নির্দেশ, নীতিমালা, মূল্যবোধ এবং প্রাকৃতিক আইনের ভিত্তিতেই শক্তি ও সামর্থ্য কাজে লাগায়। সুতরাং এ বোধ থেকে আমরা বলতে পারি ইসলামী চিন্তার পদ্ধতিবিজ্ঞান একটি সর্বাত্মক পদ্ধতিবিজ্ঞান এবং তা সংস্কার ও উন্নয়নের সকল পর্যায়ে মুসলমানদের কর্মতৎপরতাকে পরিচালনা করে।

যেহেতু ইসলামী চিন্তাধারার পদ্ধতি প্রয়োগের পরিধি ব্যাপক এবং এটি তার বৈশিষ্ট্য, সে কারণ উপায়ের (means) ব্যাপকতাও তার অনন্য বৈশিষ্ট্য। জীবনের সকল দিক ও বিভাগই মুসলমানদের জন্য প্রয়োগ ক্ষেত্র। এতে তারা উপলব্ধি করতে, জ্ঞান অন্বেষণ করতে এবং তাদের লক্ষ্যের দিকে সব কিছু দিয়ে এবং সব উপায় দিয়ে জীবনের বিভিন্ন বিষয় পরিচালনা করতে বাধ্য হয়। জ্ঞান অর্জন ও উপলব্ধিবোধের কোনো সুষ্ঠু মাধ্যমকে মুসলমানরা অবহেলা করে না, সেগুলো বস্তুগত শব্দার্থ বিদ্যা, শিল্পজনোচিত, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষামূলক যুক্তি সংক্রান্ত, গুণীয় মাত্রিক, তাত্ত্বিক অথবা বিশ্লেষণাত্মক যাই হোক না কেন। কিন্তু যে উপায় বা মাধ্যম মানুষের জীবন, উদ্দেশ্য প্রকৃতি বিরোধী, যে

www.pathagar.com

উপায় বা মাধ্যম মানুষকে অর্থহীন অথবা অসৎ বৃত্তি বা পেশার দিকে পরিচালিত করে, তাকে বিপথগামী করে তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করতে হবে। মুসলিম মন মানসকে অবশ্যই নিজেকে ছোটখাট বিতর্কে জড়িয়ে পড়া থেকে সরিয়ে নিতে হবে এবং লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে সৃজনশীল উপায়ে বিভিন্ন উপায় বা পন্থা গ্রহণের জন্যে নিজেদের নিয়োজিত করতে হবে। ইসলামী চিন্তাধারার পদ্ধতিবিজ্ঞান প্রকৃতি ও পরিধির দিক থেকে ব্যাপক ও সর্বাত্মক, তা উপলব্ধির পর আমরা বুঝতে পারি যে ইসলামী জ্ঞান, চিন্তা ও সংস্কৃতির কাঠামো অবশ্যই ব্যক্তি, সমাজ, উম্মাহর পর্যায়ে দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতার ভিত্তিতে এবং মানব সভ্যতার ভিত্তিতে গঠিত হতে হবে। সুতরাং যে জ্ঞান আমরা অন্বেষণ করবো বা কাজে লাগাবো তা হবে নীতি, লক্ষ্য ও কাঠামোর দিক থেকে সুষ্ঠু ও নিখুঁত। এসব বৈশিষ্ট্যহীন জ্ঞান ইসলামী শিক্ষা ও নীতির আলোকে বিচার করা হলে বাজে বলে পরিগণিত হবে। মুসলমানদের জ্ঞান, চিন্তাধারা অথবা বিজ্ঞান মুসলিম মন, মানসকে সম্ভাব্য সর্বোত্তম উপলব্ধি ও তৎপরতার উপায় বা মাধ্যম উপহার দিতে না পারলে সেটা চিন্তা, জ্ঞান অথবা জীবনের জন্য খাঁটি ইসলামী কাঠামো বা পদ্ধতিবিজ্ঞান নয়। পরিধি ও প্রয়োগের দিক থেকে একটি ব্যাপক পদ্ধতিবিজ্ঞান ছাড়া মুসলমানরা কখনো তাদের উপর অর্পিত আস্থা পূরণ করতে পারবে না, বাণী প্রচার করতে পারবে না অথবা আল্লাহর খলিফা হিসেবে নিজেদের মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে পারবে না।

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানবতার কল্যাণের জন্যে তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে তোমরা মানুষকে ভালো কাজের নির্দেশ দেবে, খারাপ কাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস করবে (৩: ১১০)।

প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হলেও এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপনে তাদের অভিজ্ঞতা কম থাকলেও তারা ইসলামী পদ্ধতিবিজ্ঞানের চর্চা করেছিল সফলভাবে। ইসলামী পদ্ধতিবিজ্ঞানের এ সাফল্যের আলোকে বিভিন্ন নীতি কীভাবে বাস্তবায়ন করা যাবে তা ভালোভাবে উপলব্ধি করতে হলে সে পদ্ধতি এবং নব প্রবর্তিত ইজতিহাদ অধ্যয়ন করা ছাড়া আমাদের সামনে আর কোনো বিকল্প নেই। প্রাথমিক যুগের মুসলমানরা এবং তাদের ঘনিষ্ঠ অনুসারীরা তারা তাদের অনুপ্রেরণার উৎস যেখান থেকে পদ্ধতিবিজ্ঞানের নীতিগুলো পেয়েছিল সে ওহীর বাণীগুলোকে আমাদের জন্য সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। এগুলো পালাক্রমে, ব্যাপক কেতাবী অনুসন্ধান ও অধ্যয়নের বিষয়বস্তুতে পরিণত হলো। যাই হোক, পণ্ডিত ও চিন্তাবিদগণের সঙ্গে উম্মাহর রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতিকূল সম্পর্ক বিরাজমান থাকার কারণে জীবনের বাস্তবক্ষেত্রের প্রতি অনুরূপ গুরুত্ব সহকারে মনোযোগ দেয়া হয়নি। এভাবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলো এবং সাধারণভাবে সমাজের বিভিন্ন জিজ্ঞাসার জন্য ইজতিহাদ খুব কমই প্রয়োগ করা হয়। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ শাস্ত্রগুলো প্রণয়ন করা হয়নি। অপর কথায় জীবন ও সমাজের বাস্তবতা উপলব্ধি করে সেগুলো সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

www.pathagar.com

গ্রহণের কাঙ্ক্ষিত সমন্বিত পদ্ধতিবিজ্ঞান কখনো গড়ে তোলা হয়নি। বাস্তবে, প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের বিভিন্ন সূত্র ও কৌশল নিয়ন্ত্রণকারী পদ্ধতিবিজ্ঞানের জন্য অত্যাবশ্যকীয় নীতিমালা তৈরি করা ছাড়া ইসলামী চিন্তাধারা খুব বেশি দূর অগ্রসর হয়নি। এগুলোর মধ্যে রয়েছে পদ্ধতিবিজ্ঞানের দ্বিতীয় পর্যায়ের উৎস যা আগে আলোচিত হয়েছে, দ্বিতীয় পর্যায়ের উৎসের মধ্যে ছিল মাসলাহা, দাফ আল দারার উরফ, ইসতিহসান এবং ইসতিসাব। সুতরাং ইসলামী চিন্তাধারা ও পদ্ধতিবিজ্ঞানকে উম্মাহর কাজে লাগানোর জন্যে, আমাদের অবশ্যই আগেকার যুগের পদ্ধতিবিজ্ঞানকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং তারপর উৎস, উপায় বা মাধ্যম এবং অধ্যয়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে।

শরিয়তের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও নির্দেশনামা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করার জন্য ইসলামী চিন্তাধারাকে অবশ্যই একটি পদ্ধতিগত সমীক্ষা চালিয়ে যেতে হবে যাতে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজনীতি, অর্থনীতি, মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞান, কলা ও প্রযুক্তি ইসলামী অধ্যয়নের জন্য ভূমিকা হিসেবে কাজ করতে পারে। তারপর এসব সাধারণ পরিচিতির পর প্রত্যেক ক্ষেত্রের জন্য বিশেষ পদ্ধতিবিজ্ঞান সৃষ্টি করা যেতে পারে। এভাবে ইসলামী চিন্তাধারা সমাজ বিজ্ঞানে অবদান রাখার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে। ইসলামী ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের পঠন পাঠন ওহীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পারে না অথবা সামাজিক ও প্রযুক্তিগত অধ্যয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। এসব কিছুই মানব জীবন ও তার কর্মকান্ডের ভিন্ন ভিন্ন দিক বা ক্ষেত্র। এসব কিছুই এমন সব ক্ষেত্রের প্রতিনিধিত্ব করে যেখানে ইসলামকে কিছুটা প্রয়োগ করা যেতে পারে। সুতরাং মুসলমানদের দায়িত্ব হচ্ছে পদ্ধতিগত ও শিক্ষা সংক্রান্ত নীতিগুলোর বিকাশ সাধন করা যা অনুসরণ করে ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের সুপ্রতিষ্ঠা করা হয়।

ইসলামের লক্ষ্য, মূল্যবোধ ও মতবাদের মৌলিক সূত্রগুলো প্রতিষ্ঠা করতে হলে মুসলিম চিন্তাবিদদের সর্বপ্রথম মূল ওহী, কুরআন এবং সুন্নাহর শ্রেণী ভাগ করতে হবে। তারপর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ইতিহাসখ্যাত বুদ্ধিবৃত্তিক সাহিত্যেরও শ্রেণী বিভাগ করতে হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ের এ কাজে এসব সাহিত্যকে ছেঁকে ফেলতে হবে, বিশ্লেষণ করতে হবে। এরপর স্থিরভাবে নির্ধারণ করতে হবে এর মধ্যে কোনটিতে একপেশে ভাব বা পক্ষপাতপূর্ণ আসক্তি রয়েছে। রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ অথবা কোনোটিতে মিথ (Myth), পৌরণিক কাহিনী এবং ইহুদীদের প্রভাব রয়েছে। উল্লেখ্য, উত্তরাধিকার সূত্রে সাহিত্যকর্মের পরবর্তী লেখাগুলোতে এসব পৌরাণিক কাহিনী, রূপকথা ও ইহুদীদের কেচ্ছা কাহিনী চুপিসারে ঢুকে পড়েছিল। এ ধরনের শ্রেণী বিভাজন জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় করা যেতে পারে এটি করতে হবে একটি আধুনিক ইসলামী পরিপ্রেক্ষিতের নির্দেশ অনুসারে। এ শ্রেণী বিভাজন প্রয়োজনীয়, যাতে করে মুসলিম ছাত্র, গবেষক এবং বিশেষজ্ঞগণ কালামে ওহী এবং বুদ্ধিবৃত্তিক উত্তরাধিকার সহজেই উপলব্ধি করতে পারে

www.pathagar.com

এবং সেগুলো থেকে লক্ষ্য, মূল্যবোধ ও নীতির ব্যাপক ধারণা লাভ করতে সক্ষম হয়। তারপর এসবের আলোকে মুসলিম বিজ্ঞজনেরা জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৃজনশীলভাবে কাজ করতে সক্ষম হবে।

আজকের মুসলিম বিশ্বের পরিস্থিতি যন্ত্রণা ও বিভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ, এটা সুস্পষ্ট। সমসাময়িক ইসলামী চিন্তাধারা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান তার চাহিদা ও চ্যালেঞ্জের কোনো জবাব দেয় না। অপর পক্ষে এগুলো সাধারণ মুসলমান জনগোষ্ঠীর শুধু বিভ্রান্তিই বাড়ায় বলে মনে হয়। এমনকি পরিস্থিতিতে জ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে অনুপম ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার জন্যে প্রয়োজনীয় সূত্র রচনা করে বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্কার কাজ শুরু করা ছাড়া ইসলামী চিন্তাধারার জন্যে আর কোনো বিকল্প নেই। সুন্নাহর মূল পাঠগুলোকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা প্রয়োজন। যেসব হাদিস ধরন ও সারমর্মের দিক থেকে নির্ভরযোগ্য সেগুলোর শ্রেণী ভাগ করতে হবে এবং এ কাজ এমনভাবে করতে হবে যাতে গবেষকরা বিষয় বা মূল শব্দ অনুসারে এ বিষয়ে সহজে কাজ করতে পারেন। তারপর তা হাদিসের মূল পাঠসমূহকে একটি পদ্ধতি-বিজ্ঞানের ভিত্তিতে শ্রেণীভাগ ও নিয়ন্ত্রণ করা এবং হাদিসের খবরগুলোকে সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা ছাড়াও রাসূল (সা) এবং প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের সময়কালের উপর ইতিহাসভিত্তিক সমীক্ষা হওয়া প্রয়োজন। এ সমীক্ষা বা অধ্যয়ন এমনভাবে করতে হবে যা গবেষকদের সেসব হাদিস কোন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে নাযিল হয়েছিল তা এবং প্রাথমিক যুগের মুসলমানেরা সে পরিস্থিতিতে যেসব প্রচেষ্টা চালিয়েছিল তা আরো ভালো উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে।

শেষ কথা

আজকের দিনে পাশ্চাত্যের পণ্ডিত সমাজ এবং তাদের অনুসারী ধর্মনিরপেক্ষ মুসলিমরা ইসলামকে অন্যসব ধর্মের মতো একই পাল্লায় ওজন করে। তাদের চিন্তাধারা অনুযায়ী অন্যসব ধর্মের মতো ইসলামকেও আধুনিক সমাজ ও তাকে নিয়ন্ত্রণকারী নীতিমালার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখার অনুমতি দেয়া যায় না। তাদের বিবেচনায় ইসলাম এবং সাধারণভাবে ধর্ম অতীতকালের বিভিন্ন আদর্শ ও ধর্ম ধারণার চেয়ে বড়জোর একটু বেশি কিছু হবে অথবা এগুলো পৌরাণিক কল্পকাহিনী, বর্তমান যুগে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাদের মতে এ ধরনের চিন্তাধারা জাদুঘরের বিষয় অথবা বেশির পক্ষে এগুলো মানুষের ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার জগতে আবদ্ধ থাকা উচিত। এসব কিছুর পরও এ ধরনের চিন্তাধারা ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্মের ব্যাপারে যথার্থ হয় কারণ এসব ধর্মের মৌলিক শিক্ষা ও বিশ্বাসকে বিকৃত করা হয়েছে এবং প্রায়ই এসব ধর্মের শিক্ষা ও আদর্শের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে কিছু অবিশ্বাস্য বিষয় বা বিষয়বস্তু। কিন্তু ইসলামের ক্ষেত্রে এটা মোটেই সত্য নয়। আমাদের জন্য এটা উপলব্ধি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, ইসলামের

www.pathagar.com

অনুসারীরা আজকের দিনে যে পদ্ধতিতে ইসলামকে অন্যদের সামনে তুলে ধরে তা তার জন্য যথেষ্ট ও পর্যাপ্ত নয়। এ কাজ করা যেতে পারে একমাত্র উপযুক্ত গভীর পাণ্ডিত্যের মাধ্যমে। এটি এমন পাণ্ডিত্য যা চিন্তাধারাকে কাজে এবং জীবন্ত বাস্তবতায় রূপান্তরিত করে এবং যা সমসাময়িক সমাজের সব মহলের স্বীকৃতি এবং সম্মান দাবি করে।

হে ঈমানদার লোকেরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন রাসূল তোমাদেরকে ডাকেন সেই জিনিসের দিকে যা তোমাদেরকে জীবন দান করবে (২:২৪)।

আমরা তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছি যা প্রত্যেকটি বিষয়েই সুস্পষ্ট বর্ণনা দানকারী এবং হেদায়াত, রহমত ও সুসংবাদ সেসব লোকের জন্য যারা মস্তক অনবত করেছে (১৬ : ৮৯)।

খানিকটা ভেবেই দেখ না, যে লোক উল্টা দিকে মুখ করে চলছে সে অধিক সত্যপথ প্রাপ্ত না কি যে লোক মাথা উঁচু করে সোজাসুজি এক সমতল সড়কের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে (৬৭ : ২২)?

তিনিই নিজের রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দীন সহকারে পাঠিয়েছেন, যেন তাকে অন্য সব দীনের উপর বিজয়ী করে দেয় (৬১ : ৯)।

আর সে ব্যক্তির কথার চেয়ে ভালো কথা আর কার হবে যে আল্লার দিকে ডাকলো, ভালো কাজ করলো এবং বললো 'আমি মুসলমান' (৪১ : ৩৩)।

www.pathagar.com

অধ্যায় চার

ইসলামী সভ্যতাবিষয়ক বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ

এ অধ্যায়ে আমরা ইসলামী সভ্যতার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠার জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, পদক্ষেপ ও স্তরগুলো আলোচনা করবো। আমরা যখন এখানে বিভিন্ন বিজ্ঞান সম্বন্ধে কথা বলি তখন আমরা সব মানবীয় জ্ঞান ও শিক্ষার কথা বলি। এর মধ্যে রয়েছে ঐসব বিজ্ঞান যেগুলোর সাথে মানব সমাজের সম্পর্ক রয়েছে অর্থাৎ সমাজ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বিজ্ঞান, প্রকৃতি বিজ্ঞান ও ফলিত বিজ্ঞান।

এর আগে এ পুস্তকে উল্লেখ করা হয় যে, সনাতন ইসলামী উসূলে ফিকহ শাস্ত্রে জীবনের বিভিন্ন দিক থেকে গভীর অনুসন্ধানের ভিত্তি মজবুত রয়েছে। প্রাথমিক যুগের এসব ভিত্তির মধ্যে সমাজ সম্পর্কে তাত্ত্বিক অনুসন্ধানের পূর্বাভাসও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে প্রাচীন উসূলে ফিকহ অধ্যয়নে ইজতিহাদ সম্পর্কিত সাধারণ নীতিগুলোকে কখনো গুরুত্বের সাথে বিকাশের সুযোগ দেয়া হয়নি। শরিয়তের দৃষ্টিভঙ্গিতে মানব জাতির বিভিন্ন বিষয় ও শর্তাবলী সম্পর্কে যৌক্তিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রেও এটি সত্য ছিল। প্রাথমিক ইঙ্গিত বা প্রতিশ্রুতিগুলোর কোনটি পদ্ধতিবিজ্ঞানের ভিত্তি হিসাবে বাস্তবায়িত হয়নি অথবা স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাস্ত্র হিসাবে গড়ে ওঠেনি; যে সব শাস্ত্র জীবনের বিভিন্ন বিষয় অনুসন্ধানে যুক্তিকে ব্যবহার করতে পারত, বিশেষ করে সমাজ বিদ্যার ক্ষেত্রে। তাহলে এটা স্পষ্ট যে, প্রাচীন ফিক্‌হ শাস্ত্রের আইন সংক্রান্ত রুলিং বা রায়ের সংকলনের উপর নির্ভর করার পেছনে কোনো যুক্তি নেই, অথবা বিভিন্ন সমাধান ও বিকল্পের বুদ্ধিবৃত্তিক ও তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসাবে এমনকি তার সাধারণ নীতিগুলোর উপর নির্ভর করার পক্ষে কোনো যুক্তি নেই। কারণ, যে শিক্ষা মুসলিম মনকে কোনো কিছুর সূচনা বা নবায়ন করার সামর্থ্য বা ক্ষমতা দেয়নি অথবা মুসলিম মনকে সে যৌক্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক হাতিয়ার উপহার দেয়নি যা দিয়ে সমাজ জীবনের বাস্তবতা ও দায়িত্বের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করা যায়। সমাজ বিজ্ঞান, সাহিত্য, কলা, দর্শন এবং প্রকৃতি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জন্য ইসলামী পদ্ধতিবিজ্ঞানে নতুন ভিত্তি খুঁজে পাওয়ার জন্য পূর্বোল্লিখিত প্রয়োজনের উপর গুরুত্বারোপ করার জন্য এ বিষয়টি বিকৃত করা হলো। এ পথে ওহী থেকে প্রাপ্ত বিজ্ঞান এসব বিজ্ঞানের পরিপূরক হবে এবং মানব জাতিকে একদিকে ওহী

www.pathagar.com

নির্দেশিত জ্ঞান দান করবে, অপরদিকে তাদের জ্ঞান, মনন এবং প্রাকৃতিক আইন উপহার দেবে। এ অধ্যয়নে আমরা ইসলামী চিন্তাধারার সমাজ বিজ্ঞানের জন্য উপাদানের বাস্তব উৎসের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার পথে কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণের প্রচেষ্টা চালাবো। এছাড়া আমরা এসব বিজ্ঞানের ইসলামীকরণের জন্যে একটি প্রাথমিক কাজের পরিকল্পনার বিষয়বস্তুর গবেষণা করব।

ইসলামী মূল পাঠগুলোর শ্রেণী বিভাজন

কালামে ওহী সহজে অধিগত করা ছাড়া জ্ঞানের ইসলামীকরণ অথবা সমাজ বিজ্ঞানের ইসলামীকরণ অকল্পনীয় বা ধারণাতীত। এ ধরনের অধিগত করার ক্ষমতা সঠিক ও সহজ হওয়া প্রয়োজন যাতে যে কোনো মুসলিম পণ্ডিত এটি কাজে লাগাতে পারে। ইতোপূর্বে এটিও ব্যাখ্যা করা হয়েছিল কালামে ওহীর উপলব্ধির জন্য। বিভিন্ন বিষয়ের পুনর্বিন্যাসই শুধু প্রয়োজন নয় সাথে সাথে সেগুলোকে সকল দুর্বোধ্যতা বা অস্পষ্টতা থেকে মুক্ত করতে হবে।

কিন্তু ওহীর মূল পাঠের শ্রেণী বিভাজন বিশেষ করে সুন্নাহর পাঠকেও বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে সেগুলোকে সংশ্লিষ্ট পদ্ধতিবিজ্ঞান হিসেবে নতুনভাবে উপস্থাপন করতে হবে। যাতে মুসলিম পণ্ডিত ও শিক্ষিত সম্প্রদায় সুন্নাহ অধ্যয়নের পরিভাষাগত ও তাত্ত্বিক সূক্ষ্মতার যে ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা এড়িয়ে যেতে পারে। একমাত্র এ পথেই পণ্ডিত ও একাধিক বিষয়ে পারঙ্গম ব্যক্তিরা সুন্নাহর মূল পাঠে যে বিষয় সম্পদ রয়েছে তা থেকে উপকৃত হতে পারবে।

মূল পাঠের সঠিক উপলব্ধি ও যথাযথ প্রয়োগের জন্য সেগুলোর শব্দার্থ সংক্রান্ত ও ইতিহাস নির্ভর অধ্যয়ন শুরু করতে হবে যাতে প্রত্যেকটির মূল পাঠ তার নিজ নিজ বর্ণনার বিষয়ে স্থাপন করা যায়। একমাত্র এ পথেই একজন ছাত্র বা গবেষক মূল পাঠের উচ্চতর উদ্দেশ্যে, মূল পাঠের অন্তর্নিহিত নীতি এবং মৌলিক ধারণা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারবে। ওহী নাজিলের সময় ও স্থানের বিরাজমান পরিস্থিতির প্রভাব অপসৃত না হওয়া পর্যন্ত অথবা সুন্নাহর ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে উচ্চারিত কথা ছাড়া ওহীর অর্থাৎ আল-কুরআন ও সুন্নাহের সঠিক ব্যাখ্যা অসম্ভব। এ ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতির ফলে আল-কুরআন ও সুন্নাহর মূল পাঠগুলো দ্ব্যর্থহীন তাৎপর্যের জীবন্ত উপস্থাপনা হতে পারে। সমভাবে এটি গুরুত্বপূর্ণ যে, একাডেমির মূল কাজটি সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে। যাতে কুরআন ও সুন্নাহর টীকা বা ব্যাখ্যাকে কেউ কুরআনের আয়াত ও রাসূলুল্লাহর পবিত্র সুন্নাহ বলে ভুল না করে। যেন কেউ পুরোপুরি নিশ্চিতরূপে প্রামাণ্য নয় এমন সব বিষয়কে অভ্যান্তরূপে প্রামাণ্য বিষয়ের সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে না ফেলে। এভাবে প্রতিষ্ঠিত প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতিবিজ্ঞানের সাহায্যে প্রতিটি আয়াত বা মূল পাঠের (text) অর্থ ও বর্ণনা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। অধিকন্তু, কালামে ওহীর যে সব মূল পাঠের

www.pathagar.com

সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা সম্ভব নয় সেগুলো রাসূলুল্লাহ (সা) এর জীবন চরিত্র, ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস এবং ইসলামের সাধারণ নীতি ও উচ্চতর লক্ষ্যের বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে উপলব্ধির জন্য ছেড়ে দিতে হবে।

অধিকন্তু, এটি অত্যাবশ্যক যে সুশৃঙ্খল রীতিতে সংকলিত ও প্রামাণ্য এসব মূল পাঠগুলো নির্ভরযোগ্য বিদ্যাপীঠ, গবেষণা প্রতিষ্ঠান অথবা যোগ্য ও বিশ্বস্ত পণ্ডিতদের কাছে থেকেই আসতে হবে। পণ্ডিত ও গবেষকদের জন্য এসব মূলপাঠ অধ্যয়ন ও সংকলনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে তারপর সেগুলো গঠনমূলক ভঙ্গিতে বিচার এবং সমালোচনা করাও প্রয়োজন। সমভাবে মুসলিম পণ্ডিত সমাজে এ কাজ যাতে সম্পন্ন হয় তা নিশ্চিত করাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ পথেই তারা ইসলামী চিন্তাধারার বিরাট খেদমত করতে পারবে। এটিও অত্যাবশ্যক যে, ওহীর মূল পাঠগুলোকে সংগ্রহ ও শ্রেণী বিভাজনের জন্য আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। প্রাচীন সাহিত্যের প্রধান রচনাগুলোর বিষয়বস্তুসমূহের সূচিপত্র তৈরির জন্য আরেকটি প্রকল্প হাতে নিতে হবে। এর ফলে মুসলমানরা তাদের পূর্বপুরুষের সাহিত্যকর্ম ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত হতে পারবে এবং তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রমের ফল থেকে উপকৃত হতে পারবে। বর্তমানে 'ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট' এ বিষয়টিকে একটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয় হিসেবে বিবেচনা করছে এবং বিষয়টিকে এগিয়ে নেয়ার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। আশা করা যায় এ দায়িত্ব ও কর্মভারের সফল পরিসমাপ্তির জন্য সকল মুসলিম ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন এবং একাডেমিক বিশেষজ্ঞগণ একসাথে কাজ করবেন।

একটি ব্যাপক সভ্যতামুখী দৃষ্টিভঙ্গি

সমাজ বিজ্ঞানে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কাঁধে নেয়ার প্রস্তুতি পর্বে মুসলমানদের উপলব্ধি করা উচিত যে, তারা একেবারে সহায়সম্বলহীনভাবে এ কাজ শুরু করছে না বরং বলা যায় অপরপক্ষে মুসলমানরা সভ্যতার ইতিহাসে মূল্যবান অবদান রেখেছেন। তা সত্ত্বেও যেহেতু অন্যান্য জাতি বা সম্প্রদায় এ ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতিসাধন করেছে, সেহেতু মুসলমানরা আধুনিক বিশ্বের সভ্যতায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করার জন্য যে দৌড় প্রতিযোগিতা চলছে তাকে ইসলামের প্রতি চ্যালেঞ্জ হিসাবে গণ্য করতে শুরু করেছে।

এ চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর থেকে মুসলমানরা এ ক্ষেত্রে অন্যরা কি করছে সে সম্পর্কে জানতে শুরু করেছে। অধিকন্তু, তারা যা কিছু হারিয়েছে তা ফিরে পাওয়ার জন্যে অন্যদের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এ ক্ষেত্রে তেমন বড় কিছু অর্জিত হয়নি এবং এ জন্য এতে তাদের অর্থব্যয় ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

এটি সুস্পষ্ট যে, ভিন্ন সম্প্রদায়সমূহের বিজ্ঞান ও সাহিত্য অনুবাদে বৃহত্তর প্রচেষ্টা অথবা ভিন্ন সম্প্রদায়ের বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ধিত হারে ছাত্র প্রেরণের দ্বারা এ দুর্ভাগ্যজনক

www.pathagar.com

পরিস্থিতির পরিবর্তন করা যাবে না। অধিকন্তু, এ দুঃখজনক পরিস্থিতির পেছনের কারণগুলো খুঁজে পাওয়া যাবে মুসলমানদের অনুকরণপ্রিয়তার মানসিকতার মধ্যে, শুধু তার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণের পদ্ধতিবিজ্ঞানের মধ্যে এবং তার ধর্মীয় উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং মনস্তাত্ত্বিক আত্মসম্মানবোধ হারিয়ে ফেলার মধ্যে। এটিও লক্ষ্য করার বিষয় যে, ইসলামী ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার মধ্যে সুষ্ঠু সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন মুসলিম মন ও মুসলিম সম্পর্কে ব্যাপক পড়াশোনার ব্যবস্থা। এসব অধ্যয়ন কেন্দ্রীভূত হওয়া উচিত সমসাময়িক চিন্তাধারা ও সভ্যতা, তাদের ইতিহাস, মূল্যবোধ, উদ্দেশ্য এবং তাদের পরিপূরক সম্পর্ক ও সম্বন্ধের উপর। এ পথেই আমাদের বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের পশ্চিমা চিন্তাধারার সমুদ্রে নিমজ্জিত হতে বা মিশে যাওয়ার হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারেন। এভাবেই তারা সে চিন্তাধারার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে স্বাধীনভাবে চিন্তাভাবনা করতে পারবেন বা সে পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের অবস্থান নির্ণয় করতে পারবেন। এর ফলশ্রুতিতে ইসলামী চিন্তাধারা নিজের ভিত্তি বা বৈশিষ্ট্যসমূহ বিসর্জন না দিয়ে অন্যান্য জাতির অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হতে পারবে।

অন্যদের চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া আর তাদের চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির মধ্যে যা কিছু সত্যিকারভাবে কল্যাণকর তা বাছাই করে গ্রহণ করা এ দু'য়ের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা উপলব্ধি করাও গুরুত্বপূর্ণ। মনোযোগ সহকারে সযত্নে যখন কোনো কিছু বাছাই করা হয় তখন ঈমান, পরিচিতি, অভীলিপ্সা এবং নীতির প্রশ্নে কোনো দরকষাকষি করা যায় না এবং তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা যায় না। বরং তখন বিষয়টি হচ্ছে সবচেয়ে কল্যাণকর উপায় বা মাধ্যমটিকে বেছে নিয়ে উম্মাহর জন্য সবচেয়ে লাভজনকভাবে ব্যবহার করা। অপর থেকে এভাবে গ্রহণ করাকে গভীর ভাবনাচিন্তার ফসল ও সুশৃঙ্খল বিরাট সাফল্য অর্জন বলে আখ্যায়িত করা যায়। বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে পারস্পরিক চিন্তাধারার সফল বিনিময়ের ভিত্তিও এটিই। রাসূল (সা) আহলে কিতাবদের সঙ্গে ব্যবহারকালে এ কৌশল কাজে লাগিয়েছিলেন। তিনি তাঁর সাহাবাদের এবং মুসলিম সমাজকে একই পদ্ধতি অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। পাশ্চাত্য জগৎ তার স্বর্ণযুগে ইসলাম ও ইসলামী সভ্যতার মোকাবিলায় এ পদ্ধতি ব্যবহার করে। মুসলিম জগৎ থেকে তারা যা কিছু ধার করেছিল তা তাদের পৃথক পরিচিতি, বিশ্বাস অথবা মৌলিক জ্ঞানকে পরিবর্তন করেনি। এর সম্পূর্ণ বিপরীতে পাশ্চাত্য জগৎ ধর্মীয় বা মতবাদ সব ধরনের ইসলামী প্রভাবের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে এবং এ উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য সব ধরনের প্রচারণা ও সেন্সরশিপকে ব্যবহার করেছে। উদাহরণ স্বরূপ প্রায়ই তারা ইসলামের নবী এবং বিশিষ্ট মুসলিম ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও মনগড়া অপপ্রচার চালিয়েছে।

এ কারণে পরস্পর বিরোধী যে কোনো ধরনের সাংস্কৃতিক বিনিময়ের জন্য সমসাময়িক সমাজ সম্পর্কে সুষ্ঠু ও ব্যাপক উপলব্ধি ও জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। বাস্তবিকই এ ধরনের

www.pathagar.com

উপলব্ধি ও জ্ঞান থাকলে অন্যের জ্ঞান ও প্রযুক্তি থেকে উপকৃত হওয়া সম্ভব হয়। অথচ এ কারণে কোনো ব্যক্তিকে তার মূল্যবোধ, নীতি, পরিচিতি এবং বিশ্বাসকে বিসর্জন দিতে হয় না। সুতরাং পারস্পরিক আদান-প্রদান বা বিনিময়কে অনুকরণপ্রিয়তার সাথে যাতে গুলিয়ে ফেলা না হয়, সেদিকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। একে অপর থেকে ধার নেয়া বা বিনিময় করার কাজটি দু'পক্ষের সমতার ভিত্তিতে হতে হবে– একজন নেতা, অপরপক্ষ তার অনুসারী, এ ভিত্তিতে নয়।

International Institute of Islamic Thought এ মিশন নিয়ে এগিয়ে চলেছে। শুধু অনুবাদ নয় বরং মুসলমানদেরকে পাশ্চাত্যের সমাজ বিজ্ঞান এবং সভ্যতা সম্পর্কে ব্যাপক অধ্যয়নের ব্যবস্থা করে ইনস্টিটিউট মুসলিম মন যাতে পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পারে সে লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার সূচনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, ঐতিহাসিক অগ্রগতি ও সাফল্য এবং শক্তি দুর্বলতা সম্পর্কে একটি ব্যাপক রচনা প্রকাশ করার জন্য ইনস্টিটিউট আশা রাখে। এ ধরনের একটি পুস্তক সমসাময়িক ইসলামী চিন্তাধারায় দীর্ঘদিন ধরে বিরাজমান শূন্যতা পূরণ করবে। প্রকৃতপক্ষে এ গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পকে সফল করে তোলার জন্য ইনস্টিটিউট মুসলিম পণ্ডিত ও চিন্তাবিদদের সহযোগিতাকে স্বাগত জানায়।

সমাজ বিজ্ঞানের সূত্রসমূহ

সমাজ বিজ্ঞান ও কলার উদ্দেশ্য হচ্ছে তিনটি ক্ষেত্রে সুশৃঙ্খল অনুসন্ধান করা :

১. প্রাণী ও মহাবিশ্বের প্রকৃতি ও সম্পর্ক

২. সমাজের বাস্তবতা, সম্ভাবনা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

৩. সমাজ জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতি, ধারণা, নীতি ও বিকল্পসমূহ।

এসব কিছু করার পর ইসলাম সুস্পষ্টভাবে যে ওহীর কথা বলেছে তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যর সাথে সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র ও বিষয়ের সম্পর্ক কি?

এ সম্পর্ক সৃষ্টি করার উপায় হচ্ছে সমাজ বিজ্ঞানের সূত্রগুলোর পাশাপাশি ইসলামের মূলনীতির সূত্রগুলোর শ্রেণীভাগ করা, যাতে তাদের কাঠামোর রূপরেখার সংজ্ঞা নির্ণয় করা যায় এবং তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট করো তোলা যায়। তা করা না হলে এর যে অধ্যয়ন বা পঠন পাঠন হবে তার মধ্যে পরিসংখ্যান এবং বিশ্লেষণ ছাড়া আর বেশি কিছু থাকবে না। এসব কিছুই ইসলাম ও ওহী ছাড়া ভিন্ন উৎস থেকে তাদের অনুপ্রেরণা লাভ করবে।

সমাজ বিজ্ঞানীর জন্যে দু'ধরনের ইসলামী সূত্র রয়েছে। প্রথমে রয়েছে সাধারণ সূত্র, ইসলামের সাধারণ নীতির সঙ্গে এগুলো সংশ্লিষ্ট। এ সূত্রগুলো ইসলামী পদ্ধতি এবং ইসলামী ব্যক্তিত্বের জীবনে প্রধান প্রধান মূল্যবোধ ও অগ্রাধিকারসমূহের সংজ্ঞা নির্দেশ করে। দ্বিতীয় সূত্রগুলো অতি গুরুত্বপূর্ণ, একাডেমিক কাজ এর মধ্যে রয়েছে।

www.pathagar.com

১. সমাজ বিজ্ঞানসমূহ, প্রত্যেক বিজ্ঞান ও শিক্ষার সূত্র ও ভিত্তি;
২. প্রত্যেক শিক্ষার প্রকৃতি, বাস্তবতা, সম্ভাবনা, শক্তি ও সম্পর্ক;
৩. প্রত্যেক শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, মূল্যবোধ, প্রশিক্ষণ এবং ইসলামী পদ্ধতি বিজ্ঞানের নির্দেশনা;
৪. বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সমাজের উপর প্রভাব বিস্তারকারী লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং অনৈসলামী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পৃথকভাবে সে জ্ঞানের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরার জন্য জ্ঞানের বৈশিষ্টসমূহ ও প্রধান প্রধান বিষয়গুলি।

৫. যদিও এ সব সূত্রগুলো কালামে ওহী থেকে খুঁজে বের করা যাবে তা সত্ত্বেও এগুলো হবে ইজতিহাদের মাধ্যমে প্রাপ্তসূত্র এবং এভাবে এসব সূত্র যৌক্তিক অনুসন্ধানে স্থলাভিষিক্ত হবে এবং বিভিন্ন সভ্যতার চ্যালেঞ্জের প্রতি ইসলামের জবাব হিসেবে কাজ করবে। এভাবে এগুলো অবাধ ও সৃজনশীল ইসলামী চিন্তাধারার উদাহরণের প্রতীক হয়ে উঠবে। অবাধ ও সৃজনশীল ইসলামী চিন্তাধারা আলোচনা-সমালোচনা ও সংশোধনের জন্য উন্মুক্ত। এটি নিঃসন্দেহ যে, ইসলামী অবদান ক্রমান্বয়ে জোরদার হওয়ার সাথে সাথে এসব সূত্রগুলো পাকাপোক্ত হবে এবং জ্ঞানের প্রধান স্রোতধারায় মিশে যাবে। এ পদ্ধতিতে সমাজ বিজ্ঞানে এবং জ্ঞানের সকল শাখায় ইসলামী অবদান বাড়বে। অনুরূপভাবে এসব বিষয়ের ইসলামী ব্যবহার তার দৃষ্টিভঙ্গি ও অবদান অনুসারে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। এটি উপলব্ধি করা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, মুসলমানদেরকে ইসলামী চিন্তাধারায় অবশ্যই সভ্যতার অনুকূল ও পদ্ধতিগত প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে হবে এবং এভাবে ইসলামী চিন্তাধারাকে তার খুঁটিনাটি বিষয় ও তাত্ত্বিক বেড়াজাল থেকে এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সংগ্রামের ফলে সৃষ্ট প্রভাব থেকে মুক্ত করতে হবে। মুসলমানদেরকে অবশ্যই তাদের চিন্তাধারার জন্য একটি নিখুঁত ও সর্বাত্মক পদ্ধতিবিজ্ঞান সৃষ্টি করতে হবে যাতে তারা পুনরায় ইজতিহাদের দরজা খুলতে পারে এবং তাকলিদের সৃষ্ট মানসিকতা কাটিয়ে উঠতে পারে। মুসলিম জাতি এসব উদ্যোগ বা কাজে সফল হতে না পারলে উম্মাহর বর্তমান শোচনীয় অবস্থার কোনো পরিবর্তন হবে না। অধিকন্তু পূর্বের মতোই সমসাময়িক যুগের ইসলামী আন্দোলন ও সংস্থাসমূহের পচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

সমসাময়িক যুগে মরুভূমির দেশগুলোতে যেসব ইসলামী আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে অধ্যয়নের ফলে এটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, প্রাথমিক স্তরে তাদের সাফল্যের কারণ ছিল, তারা এমন এক পরিবেশে আন্দোলন শুরু করেছিলেন, যার সঙ্গে রাসূল (সা) সময়কালের বহুলাংশে সাদৃশ্য ছিল। এটি স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, যেসব ইসলামী আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য দীন অনুকরণ ও খুঁটিনাটি ব্যাপারে মনোযোগ নিবদ্ধকরণ এবং যেসব আন্দোলন ইসলাম, তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সভ্যতার বুনিয়াদগুলোর শুধু

www.pathagar.com

ইতিহাসগত ও বর্ণনামূলক উপলব্ধি সুদূর মরুভূমির বাইরে সেগুলো কখনো বেগবান হবে না, এমনকি ওসব আন্দোলনের মধ্যে কয়েকটি স্থানীয় বা জাতীয় পর্যায়ে ক্ষমতায় যেতে সফল হলেও সামগ্রিকভাবে আন্দোলনসমূহের ব্যর্থতা অনিবার্য ছিল। কারণ আধুনিক সমাজের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তারা সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ছিল। এভাবে তারা সামরিক বা রাজনৈতিক ক্ষতি স্বীকারের আগেই চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির রণক্ষেত্রে পরাজিত হয়েছিল।

এভাবেই একের পর এক ইসলামী আন্দোলন আবির্ভূত হয়েছে। প্রতিটি আন্দোলনই কালক্রমে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এ কারণে যে, তারা সংস্কৃতি ও মননের দিক থেকে ছিল অযোগ্য। ফলে তারা মুসলিম সমাজে কোনো ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা করতে পারেনি। সমাজকে নবরূপ দান বা এর সংস্কার করতে পারেনি এমনকি মুসলিম সমাজের অস্তিত্বের প্রতি হুমকি সৃষ্টিকারী বিভিন্ন অপশক্তির হাত থেকে তাকে রক্ষাও করতে পারেনি। সম্ভবত তাদের নেতাদের (অর্থাৎ লিবিয়ার আল-সানৌসী, সুদানের আল-মাহদী, ভারতের শাহ ওয়ালী উল্লাহ এবং আরবের মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব) সম্পর্কে গবেষণা করলে এ বিশ্লেষণের উপর আরো আলোকপাত করা যাবে।

আধুনিক মুসলিম বিশ্বে ইসলামী আন্দোলনকে সফল হতে হলে তাকে প্রথমে ইসলামী চিন্তাধারার পদ্ধতি-বিজ্ঞান এবং সাধারণভাবে সভ্যতার প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গির সংস্কারের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। একমাত্র এ পথেই উম্মাহর উদ্যোগ প্রচেষ্টা এবং জিহাদ আবেগময় ও ভাবাবেগপূর্ণ আবেদনকে ছাপিয়ে উঠতে পারবে। কারণ, এসব আবেদন আধুনিক চ্যালেঞ্জসমূহের মোকাবিলা করা, উম্মাহর পরিচিতি ও ব্যক্তিত্বকে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত করা অথবা ইসলামী ধাঁচের দৃষ্টিভঙ্গি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুনরায় ঢেলে সাজানোর জন্য প্রয়োজনীয় চিন্তাধারা ও সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আনার জন্য কিছুই করে না।

পদ্ধতিবিজ্ঞানে পরিবর্তন সাধন করা না হলে, কোনো গঠনমূলক প্রচেষ্টা চালানো যাবে না এবং কোনো উদ্যোগই কিছু বয়ে আনবে না। আসলে এসব প্রচেষ্টাকে মূল্যবান সম্পদ নিঃশেষিত করার প্রতীক বলা যেতে পারে। অপরদিকে উম্মাহ এবং বিশ্বের অন্যান্য জাতির মধ্যকার ব্যবধান আরো বাড়তে থাকে। উম্মাহ দেখতে থাকে তার ভূখন্ড ক্রমাগত অন্যের দখলে চলে যাচ্ছে, সম্পদ বিনষ্ট হচ্ছে, তার প্রতি আনুগত্য হারিয়ে যাচ্ছে এবং তার উপর ক্রমবর্ধমান হারে দুর্যোগ নেমে আসছে। যতদিন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার সম্মুখের সমস্যাগুলোর প্রতি সম্যকভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ না করে ততদিন তার অবস্থার কোনো পরিবর্তন হবেনা।

মুসলিম চিন্তাধারা এবং পদ্ধতিবিজ্ঞান সংস্কারের গুরুত্ব এখন সবার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত। একই সাথে এটিই উপলব্ধি করা গুরুত্বপূর্ণ যে, আমাদের ধর্মের মূল্যবান সম্পদ, আমাদের ইতিহাস, আমাদের দেশ ও রাজ্যসমূহ আমাদের কাছে থাকা সত্ত্বেও

www.pathagar.com

যতদিন পর্যন্ত আমাদের চিন্তাধারা, আমাদের মনস্তাত্ত্বিক গঠন এবং আমাদের সংস্কৃতি বিকৃত ও পঙ্গু অবস্থায় থাকে ততদিন আমাদের কষ্ট ও দুর্দশা বাড়তে থাকবে এবং আমাদের আরো বুঝতে হবে যে, সময় আমাদের পক্ষে নয়।

সমালোচনার শানিত দৃষ্টিতে আমাদেরকে নিজেদের দিকে তাকাতে হবে এবং নিজেদের ত্রুটি বিচ্যুতির সম্মুখীন হতে হবে। এটা আমাদের দায়িত্ব। এটা সহজ নয় বরং তিক্ত ও বেদনাদায়ক কাজ। সে যা হোক, আমরা যদি নিজেদের কাছে সৎ থাকতে চাই, আবেগ প্রবণতা কাটিয়ে উঠতে চাই, আমাদের সামর্থ্য, সাংস্কৃতিক গুণাবলী ও নিজেদের সম্পর্কে ফুলানো ফাঁপানো ধারণা একপাশে সরিয়ে রাখতে চাই, তাহলে এমন উদ্যোগ গ্রহণের কোনো বিকল্প নেই। শুধু এটা যদি আমরা করি তাহলে আমরা অতীতের শিক্ষা থেকে উপকৃত হতে পারবো এবং ভবিষ্যতের জন্য সেগুলো কাজে লাগাতে পারবো।

ইসলামী পদ্ধতিবিজ্ঞান সম্পর্কে আমাদের কর্মসূচি সম্প্রসারিত করতে হবে। এখন আমরা যদি সভ্যতার সমসাময়িক প্রেক্ষিত থেকে ইসলামী প্রেক্ষিতকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে পারি, এমন কিছু সূত্র নিয়ে আলোচনা করতে পারি, তাহলে সেটাই হবে সঠিক কাজ। বাস্তবিকই এসব সূত্রের ভিত্তিতে আমরা আশা করতে পারি যে, এক সময় উম্মাহ মানব জাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অবদান রাখতে পারবে। মানব প্রকৃতি সম্পর্কিত ইসলামী ধারণা এবং ফিতরাত ইসলামী প্রেক্ষিতের অন্তর্ভুক্ত থাকায় এটি পূর্ণাঙ্গ হয়েছে। এ প্রেক্ষিত সমাজ বিজ্ঞান ও কলাশাস্ত্র (Arts) অধ্যয়ন, গবেষণা, বিশ্লেষণের জন্য একটি সঠিক ও অনন্য ভিত্তি প্রদান করা ছাড়াও মানবতার জন্য ইতিবাচক অবদান রাখার প্রতিশ্রুতি দেয়। এসব সূত্র আলোচনাকালে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর আলোচনা কেন্দ্রীভূত রাখবো।

ইসলামে মানব অস্তিত্বের বহুমাত্রিকতা একটি সামষ্টিক এককত্ব ও একটি ব্যাপক ভিত্তিক বহুত্ব,

অস্তিত্বের উদ্দেশ্য এবং মহাবিশ্বে শৃঙ্খলার পেছনে যুক্তি,

সত্যের নিরপেক্ষতা এবং মানব প্রকৃতি ও সামাজিক সম্পর্কের বাস্তবতা।

ইসলামে মানব অস্তিত্বের বহুমাত্রিকতা একটি সামষ্টিক এককত্ব ও একটি ব্যাপক ভিত্তিক বহুত্ব ঃ

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মানব অস্তিত্ব একটি একীভূত মানবিক এককত্বের আওতায় অস্তিত্বের বহুমাত্রিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। এটি আচার-আচরণ, মানব প্রকৃতি এবং বিশেষভাবে মুসলিম সত্ত্বার অধ্যয়নে সুদূরপ্রসারী ফলাফল বয়ে আনবে।

বিভিন্ন ধর্ম ও আদর্শগুলো মানব অস্তিত্বের মাত্র একটি দিকে সীমাবদ্ধ। এভাবে জীবনের অন্য সব দিকগুলোকে অবহেলা করা হয়। সুতরাং এসব ধর্ম ও আদর্শগুলোর সাফল্য ও কৃতিত্ব সত্ত্বেও তাদের অনুসারীরা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে বিভ্রান্ত থাকে এবং অন্ধত্বের

www.pathagar.com

শিকার হয়। ব্যক্তি পর্যায়ে পাশ্চাত্য বস্তুবাদ ইন্দ্রিয় আনন্দ ও আকাঙ্ক্ষার উপর তার মনোযোগ নিবদ্ধ রাখে। তারপর দৈহিক আরাম-আয়েশ ও কামনা-বাসনার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সভ্যতার এত কিছু অর্জন সত্ত্বেও ব্যক্তি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাধির শিকার হয়েছে এবং এসব ব্যাধির নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে সমাজের ওপর এবং এ ব্যাধি ক্রমেই বাড়ছে এবং জটিল আকার ধারণ করছে।

একইভাবে বস্তুবাদী, সমূহবাদী, মার্কসবাদী, প্রায় পুরোপুরিভাবে বস্তুতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াদির ওপর তাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত রেখেছে। এভাবে উৎপাদন ও মানুষকে বস্তুগত প্রয়োজন থেকে মুক্তি দেয়াকে মার্কসবাদ তার সর্বোচ্চ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। তথাপি এসব কিছু সত্ত্বেও মার্কসবাদী ব্যবস্থার অধীনে একজন ব্যক্তি মানুষ অনেকটা পাশ্চাত্যের ব্যক্তি মানুষের মতোই সমভাবে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাধির শিকারে পরিণত হতে পারে। এভাবে উভয় মতাদর্শই ব্যক্তি ও সমাজকে সামগ্রিকভাবে কল্যাণ ও নিরাপত্তাবোধ উপহার দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

দূর প্রাচ্যের ধর্মগুলো মানুষের আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা এবং প্রয়োজনকে খুব কমই গুরুত্ব দেয়। ধর্মগুলো খ্রিস্টান ধর্মের সংযম ও আত্মকৃচ্ছ মতবাদের তুলনায় অনেক বেশি কঠোর হলেও তাদের অনুসারীদের ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক জীবনের অনগ্রসরতার ও হতাশার সমস্যাসমূহ সমাধানে তারাও ব্যর্থ হয়েছে। এসব ধর্মে তাদের বিশ্বাসের কমতি ছিল বলেই সমগ্র জনগোষ্ঠী চীনের জনগণের মতো বস্তুবাদী মতাদর্শ ও সমূহবাদে তাদের মুক্তি খুঁজে পেতে চেয়েছিল। এভাবে যে কোনো ব্যক্তি এসব ধর্ম সম্বন্ধে চিন্তা করতে বসলে তার কাছে ধর্মগুলোর ত্রুটি-বিচ্যুতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। জনগণ যদি এসব ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তা থেকে পালাতে শুরু করে এবং তার অন্তঃসারশূন্যতা থেকে ফিরে যায় তাহলে আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না।

কিন্তু কালামে ওহীর সুস্পষ্ট উচ্চারণে আমরা যে ইসলামকে পেয়েছি তা মানুষের প্রকৃতি, অস্তিত্ব এবং চাহিদা সম্পর্কে পৃথকভাবে ভূমিকা রেখেছে। ইসলাম স্বীকার করে যে, মানুষের স্বাভাবিক কামনা-বাসনা, আশা ও আকুল আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। বাস্তবিকই ইসলাম এগুলোকে মানুষের প্রতি অনুগ্রহ বলেই বিবেচনা করে। সুতরাং এগুলোকে সঠিক ও গঠনমূলকভাবে ব্যবহার করা হলে তা সুখ ও সন্তোষ বয়ে আনতে পারবে এবং জীবন ও শক্তিকে সৌন্দর্য ও নবরূপ দান করতে পারবে। ইসলাম একথাও স্বীকার করেছে মানুষের দৈহিক ও অর্থনৈতিক চাহিদা আছে এবং এগুলোকে সে বেঁচে থাকার, কার্যকর করার এবং উদ্ভাবনের উপায় হিসাবে এবং সত্য ও সুবিচারপূর্ণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উপায় হিসাবে এবং সমাজের সকলের কল্যাণ সাধনের উপায় হিসেবে বিবেচনা করে। এমনিভাবে ইসলাম মানুষকে শুধু বস্তুর পর্যায়ে নামিয়ে দিতে অস্বীকার করে। কারণ, মানুষ শুধু আত্মার সক্রিয় রূপ এ কথা ইসলাম মানে না। বরং ইসলাম মানুষকে দেখে বস্তু ও চেতনা

www.pathagar.com

এবং দেহ ও আত্মা হিসেবে। ইসলামে মানুষের একটি পার্থিব অস্তিত্ব আছে, আছে একটি বেহেশতি লক্ষ্য। এভাবে মানবজীবনে প্রতিটি কাজ অথবা বস্তুগত সাফল্যকে ইসলামী পরিপ্রেক্ষিত থেকে একটি আধ্যাত্মিক লক্ষ্য হাসিলের বাহ্যিক রূপ বা বাস্তব অভিব্যক্তি হিসেবে দেখা হয়। ইসলামে আধ্যাত্মিক অর্জনকে লক্ষ্য করেই মানব অস্তিত্বকে অর্থবহ করা যায়।

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের রয়েছে বস্তুগত অস্তিত্ব। তার আছে কামনা, বাসনা ও আকাঙ্ক্ষা এবং অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য তার রয়েছে কাজের প্রয়োজন। মানুষ আবার একটি আত্মা বা রুহও বটে যার আছে উচ্চতর আধ্যাত্মিক লক্ষ্য, উদ্দেশ্য যা তাকে শুভ, মঙ্গল ও সংস্কারের পথে কর্মদ্যোগে নিয়োজিত রাখে। এ কারণে ইসলাম নির্দেশিত প্রত্যেক প্রকারের ইবাদত, আল্লাহর জিকির বা স্মরণ এবং মোরাকাবা বা ধ্যান বাস্তবে খুব সহজেই করা যায়। এ ছাড়াও এসব ইবাদত বন্দেগী যারা করেন তারা আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত কল্যাণও লাভ করেন। উদাহরণ স্বরূপ, অযু থেকে পরিচ্ছন্নতা, সালাত বা নামাজ থেকে শৃঙ্খলা, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, সওম বা রোজা থেকে, জাকাত থেকে বদান্যতা ও সহৃদয়তা এবং হজ্জ থেকে সাম্যতা আমরা লাভ করি। প্রতিটি ক্ষেত্রেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে ভালো কাজ করা, আমানতকে সম্মান করা। খেলাফতের দায়িত্ব বহনের জন্য এবং সংস্কার ও সভ্যতার মাধ্যমে পৃথিবীতে সৎকাজ করার জন্য আত্মাকে তৈরি করা। কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নিয়ে একটু ভাবুন ঃ

'আল্লাহ সুবিচার, ইনসাফ, অনুগ্রহ ও আত্মীয়স্বজনকে দানের নির্দেশ দিচ্ছেন এবং সব অন্যায়, পাপ, নির্লজ্জতা ও জুলুম অত্যাচার করতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের নসিহত করেছেন যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারো।' (১৬ : ৯০)

'তুমি কি সে ব্যক্তিকে দেখেছ যে পরকালের শুভ প্রতিফল ও শাস্তিকে অবিশ্বাস করে? এতো সে লোক যে ইয়াতীমকে ধাক্কা দেয়, আর মিসকীণদের খাবার দিতে উৎসাহিত করে না।' (১৭ : ১-৩)

'যে কেহ নেক আমল করবে সে নিজের জন্যই করবে আর যে অন্যায় করবে সে নিজেই তার পরিণতি ভোগ করবে। শেষ পর্যন্ত সবাইকে যেতে হবে নিজেদের রবের নিকটে।' (৪৫ : ১৫)

'তিনিই মৃত্যু ও জীবন উদ্ভাবন করেছেন যিনি তোমাদেরকে পরখকরে দেখতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে আমলের দিক দিয়ে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে?' (৬৭ : ২)

'উপরন্তু যে লোক বিন্দু পরিমাণও নেক আমল করে থাকবে সে তা দেখতে পারবে এবং যে লোক বিন্দু পরিমাণে বদ আমল করবে সেও তা দেখতে পাবে।' (৯৯ : ৭-৮)
প্রিয় নবী (সা) বলেন,

www.pathagar.com

'একটি সদয় বাক্য সদকা'
'তোমাদের যৌন তৃপ্তিতে সদকা রয়েছে'

'এক ব্যক্তিকে একটি বিড়ালের সঙ্গে নিষ্ঠুর আচরণের জন্যে দোযখের শাস্তি দেয়া হয়। অপরদিকে গরমের দিনে একটি কুকুরকে পানি পান করানোর জন্য অপর একজনকে আল্লাহ্ ধন্যবাদ দেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন।'

মানুষ সম্পর্কে ইসলামের ধারণা হচ্ছে একজন মানুষ হোক সে পুরুষ বা মহিলা, তার অস্তিত্বের দিকগুলো, তার বিভিন্ন প্রয়োজন বা চাহিদা এবং ব্যক্তিত্ব বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে একই সাথে সে একক এবং পূর্ণাঙ্গ অস্তিত্ব হিসেবেই বিদ্যমান থাকে এবং তার অস্তিত্বে থাকে বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক দিক, যেগুলো কখনো এক সাথে মিলে যায় আবার তা পৃথকও করা যায়। এসব দিকের কোনো একটিকে অবজ্ঞা করা হলে বা অপব্যবহার করা হলে এ বিশ্বে একজন মানুষের জীবনের কোনো সুখ বা ভারসাম্য আসতে পারে না।

এ বিশ্বের মানুষের এ রকম দাসত্বপূর্ণ ও সীমিত জীবন ধারণ সম্পূর্ণ নতুন মাত্রা ধারণ করে। এ জীবনের পরে আসছে আরেক জীবন এবং মৃত্যু, মানুষের অস্তিত্বের সমাপ্তি। একটি উদ্দেশ্য পূরণের জন্য মানুষকে জীবন দান করা হয় এবং জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মানুষ তাদের স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগ করতে পারে। এ ব্যাপারে সে স্বাধীন। তারপর এ জীবনের পর যে অনন্ত জীবন আসবে তা হবে এ পৃথিবীতে মানুষ যে ধরনের জীবন যাপন করতো তারই পরিণাম। অন্য কথায় পরকালে মানুষের অবস্থান সে এ পৃথিবীতে যে ধরনের জীবনযাপন করতো তার উপর নির্ভরশীল হবে। মানব জীবন সম্পর্কে একমাত্র এ ধারণাতেই তার গঠন, গন্তব্যস্থল ও ফিতরাতের বাস্তবতার প্রতিফলন দেখা যায়। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি তার দুনিয়ার জীবনে তার দৈহিক চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণের চেয়ে বেশি কিছু অর্জন করতে না পারে, সে কখনো মনস্তত্ত্ব ও আবেগ অনুভূতির মধ্যে স্থিতিশীলতা অথবা নিরাপত্তা পাবে না। অপর পক্ষে সে হবে এমন এক প্রাণীর মতো যে জীবনে টিকে থাকার জন্য যে কোনো নৈতিক বিচ্যুতিকে অবলম্বন করবে। কারণ অবস্থা যাই হোক না কেন এ জীবন শেষ হয়ে যাবে। এ ধরনের প্রাণী জানে না কোথা থেকে সে এসেছে কেন সে এসেছে? সে কোথায় যাচ্ছে? কীভাবে যাচ্ছে? সে জানে সে এসেছে এবং চলে যাচ্ছে। সে যা হোক, তার সীমিত উপলব্ধি দিয়ে সে নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করতে পারে না যে, সে কোন লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হবে অথবা কোন উদ্দেশ্য সামনে রেখে তাকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল। ব্যক্তিমানুষ এ পৃথিবীতে বিভিন্ন পার্থিব বিপর্যয়, পরিবর্তন ও পরীক্ষার সম্মুখীন হলে জীবনে কখনো সত্যিকারের সুখের সন্ধান পাবে না যতক্ষণ বা যতদিন সে বুঝতে না পারে যে এ জীবনের আরেকটি মাত্রা রয়েছে, এটি সব কিছুকে সংশোধন করছে এবং সঠিক করে দেবে। অন্যথা, এটি কোন ধরনের জীবন হবে? একটি প্রাণীর জীবন সুস্পষ্টভাবে বলা যায় আরো ভালো হবে,

www.pathagar.com

কারণ মোটের উপর তার কোনো বোধশক্তি নেই। সুতরাং সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা তাদের ভাগ্যে না জুটলে তারা এর অভাব অনুভব করবে না।

সুতরাং পরকালীন জীবন সম্পর্কে ইসলামী মতবাদ ব্যক্তি মানুষের মানসিক ভারসাম্য রক্ষা ও সুখের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। একটি সঠিক মুসলিম জীবন তার এককত্ব, ব্যাপকতা এবং পরকালীন জীবনে বিশ্বাসের দরুন সুখ, সন্তোষ ও নিরাপত্তার দিকে পরিচালিত হয়। এ পথে তার যে উদ্যোগ ও কর্মপ্রচেষ্টা তা কখনো বৃথা যেতে দেয়া হবে না। তার ধৈর্য, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং আল্লাহর ইনসাফ ও প্রজ্ঞায় আস্থা কোনো কিছুই নিরর্থক হয় না। একজন মুসলিম নারী বা পুরুষের জীবনের এগুলোই হচ্ছে সম্বল। এভাবে একজন মুসলিম আল্লাহর দানের প্রশংসা করে এবং তুষ্ট থাকে, কারণ তার জাগতিক জীবনে চালচলন সংক্রান্ত বিষয় এবং উচ্চতর নৈতিক বিষয়সমূহ (sublime) দুটিই অন্তর্ভুক্ত থাকে।

ব্যক্তি মুসলিমের পরকালীন জীবন সম্পর্কিত উপলব্ধি সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে মুসলিম ব্যক্তিত্ব এবং সামগ্রিকভাবে সমাজ কী সংকট ও ভ্রান্তির সম্মুখীন হয় তা কল্পনা করা মোটেই সম্ভব নয়। নিশ্চিতভাবেই পরকালীন জীবনের বিষয়টি কোনো গৌণ বিষয় নয়। অপরদিকে এর বৈশিষ্ট্য এমন যে, এটি মুসলিম সমাজ এবং ব্যক্তি জীবনের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

একীভূত একক হিসেবে মানুষ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের বিভিন্ন দিকের মধ্যে কোনো সংঘর্ষ বা বৈপরীত্য থাকে না। বরং দু'টিই হচ্ছে একটি একক সত্তা ও তার প্রয়োজনের বহিঃপ্রকাশ এবং দু'টি বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উভয় দিক থেকেই বিভিন্ন ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত। একইভাবে ব্যক্তি ছাড়া আধ্যাত্মিক জীবন অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না বা টিকে থাকতে পারে না। সুতরাং মানবজীবন এ দু'টি মাত্রার সমন্বয়ে গঠিত। কাজেই মানব জীবন সম্পর্কিত ইসলামী ধারণা কোনো সংঘর্ষের ধারণা নয়। এ যুক্তির আরেকটি ফল হচ্ছে এ যে, ইসলাম সব ধরনের জুলুম, স্বৈরাচার, বে-ইনসাফি ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে।

ইসলাম কীভাবে দুর্নীতির মোকাবিলা করে তা লক্ষ্য করার বিষয়। আল্লাহর হুকুম হিসেবে যা দ্ব্যর্থহীনভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তা মতামত বা ব্যাখ্যা বা ইজতিহাদ-এর চেয়ে বেশি কিছু নয়। তাকে সুস্পষ্টভাবে পৃথক করার মাধ্যমে ইসলাম দুর্নীতির মোকাবিলা করে। ব্যাখ্যার উপযোগী বিষয়গুলো চূড়ান্তভাবে উম্মাহর বিবেচনার জন্য পেশ করা হয় অথবা আরো সুনির্দিষ্টভাবে এ বিষয়সমূহ উম্মাহর রাজনৈতিক ও আইন প্রণয়নজনিত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ভার যাদের ওপর ন্যস্ত রয়েছে তাদের কাছে পেশ করা হয়। (আহল আল হাল ওয়া আল-আকদ) সুতরাং এসব বিষয়ে শুমারি প্রক্রিয়ায় উম্মাহর স্বীকৃতি ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ সঠিক হতে পারে না।

www.pathagar.com

অস্তিত্বের উদ্দেশ্য এবং বিশ্বে নিয়ম শৃঙ্খলার কারণ

আমরা এর আগে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সব ধরনের গবেষণা ও একাডেমিক কর্মকান্ডে নির্দেশনাদানকারী ইসলামী পদ্ধতিবিজ্ঞানের একটি উপাদান ও মৌলিক ধারণা হিসেবে অস্তিত্বের উদ্দেশ্যসহ দৃষ্টিভঙ্গির বিষয় আলোচনা করেছি। বাস্তবে এ উপাদানই প্রতারণা, অজ্ঞতা এবং অনিচ্ছাকৃত বিচ্যুতি থেকে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিচালিত প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণাকে রক্ষা করে। এভাবে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে একাডেমিক গবেষণার কাজ হাতে নেয়া হলে এবং তার সাথে ফিতরাত থেকে উৎসারিত অন্তর্দৃষ্টি শামিল হলে এ কর্মকান্ড একটি বিশ্বজনীন কল্যাণ ব্যবস্থা, সংস্কার ও সভ্যতার গোড়াপত্তনে সহায়ক হবে। আর এ ব্যবস্থা এমন হবে যাতে দুর্নীতি, পদস্খলন বা বিচ্যুতি, বিকৃতি, কুসংস্কার অথবা কুফরের কোনো স্থান থাকবে না।

'হে আমার প্রভু! তুমি এসব কিছুই বৃথা সৃষ্টি করোনি।' (৩ : ১৯১)

সত্যের নিরপেক্ষতা এবং মানব প্রকৃতির বাস্তবতা ও সামাজিক সম্পর্ক

ইসলামী চিন্তাধারা, আল্লাহ এবং তার এককত্বের বিশ্বাস থেকে উৎসারিত দৃষ্টিভঙ্গি ও ধারণার সমন্বয়ে গঠিত। জ্ঞানের ক্ষেত্রে যখন আলোকপাত করা হয় তখন তাতে অন্তর্নিহিত থাকে একটি খাঁটি মৌলিক ধারণা। এ সাধারণ ও মৌলিক ধারণা হচ্ছে সভ্যতা ও বাস্তবতা, ন্যায় ও অন্যায়, ভালো ও মন্দ বাস্তবে নিরপেক্ষ বাস্তবতা। এগুলোকে অবশ্যই আল্লাহ মানুষের মধ্যে যে প্রকৃতি দিয়েছেন এবং মানুষের পথ নির্দেশনা দেয়ার জন্য যে ওহী পাঠিয়েছেন এ দু'টোর আলোকে বুঝতে হবে। এ অবস্থায় বিন্দু থেকে বলা যায় মুসলিম মন বিজ্ঞানমনস্ক। পূর্ব নির্ধারিত ধারণার ওপর নির্ভর না করে সে তার নিজ শর্তানুযায়ী এবং নিজস্ব উদ্দেশ্যের অনুকূল রীতিবিধানের ভিত্তিতে জ্ঞান অন্বেষণ করে। এ কারণে একটি মুসলিম মনের সাধনা বিনষ্ট হবে না বা বিপথগামী হবে না।

'আর সত্য যদি কখনো এ লোকদের খায়েশের পিছনে চলতো তাহলে জমিন ও আসমান এবং তার অধিবাসীদের ব্যবস্থাপনা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত।' (২৩ : ৭১)

'এবং সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক গোমরাহ আর কে হতে পারে যে ব্যক্তি আল্লাহর হেদায়াত ব্যতীত শুধু নিজের লালসা-বাসনার অনুসরণ করে চলে।' (২৮ : ৫০)

'তাহলে তুমি কি কখনো সে ব্যক্তির অবস্থা চিন্তা করে দেখেছ যে লোক স্বীয় নফসের খায়েশকে নিজের খোদা বানিয়ে নিয়েছে?' (৪৫ : ২৩)

সমসাময়িক যুগের বস্তুবাদী মনকে জটিল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অধ্যয়নকালে বৈষয়কি হতে বাধ্য করা হলে সে একই মনকে সমাজবিজ্ঞান, সাহিত্য-দর্শন ও ইতিহাস অধ্যয়নে বেপরোয়াভাবে ছেড়ে দেয়া হবে, তখন তা বিকৃত স্বভাব বিশিষ্ট শয়তানে রূপান্তরিত

www.pathagar.com

হবে। তারপর বৈজ্ঞানিক গবেষণার নামে নীতিভ্রষ্টতার সকল পথকে যুক্তিযুক্ত করে মানুষ উপস্থাপন করে। এ কারণে আমরা দেখতে পাই, সমাজবিজ্ঞানে অন্তহীনভাবে একটির পর একটি গোষ্ঠী সৃষ্টি হচ্ছে, এদের প্রত্যেকের রয়েছে নিজস্ব মতবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণী। অন্তর্বর্তী সমাজে বিরাজ করে বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি এবং সব সমস্যায় সে জড়িত হয়ে পড়ে, তা থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো উপায় সে পায় না।

বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজ বিজ্ঞান অধ্যয়নকালে ওহীর উপাদানকে পুরোপুরি অবজ্ঞা করা হয়। এটিকে তার একটি প্রধান দুর্বলতা হিসেবে চিহ্নিত না করে সমাজ বিজ্ঞানের বস্তুবাদী পাণ্ডিত্য দাবি করে যে, তাদের পাণ্ডিত্য ও অধ্যয়নের ক্ষেত্র জটিল এবং তা অবিশেষজ্ঞদের বোধগম্য হবার নয়। যাই হোক, মানবীয় যুক্তির উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল সমাজ বিজ্ঞান অবশ্যই বিপথে চালিত হবে। কারণ, মানুষের মন মানবীয় অভিজ্ঞতার লক্ষ্যবস্তু সম্পর্কিত পুরোপুরি সত্য অনুধাবন অথবা মানবীয় অভিজ্ঞতার উচ্চতর লক্ষ্য উপলব্ধিতে অক্ষম বা অসমর্থ। ধর্ম ও নবুয়তের ধারণাকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করার ফলে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ওহীকে পাশ্চাত্য অবজ্ঞা করেছে এবং এর উপর আস্থা স্থাপন করতে পারেনি। পশ্চিমা চিন্তাবিদদের মধ্যে মাত্র একটি গ্রুপের অনুসারীদের চিন্তাধারায় ফিতরাতের প্রতিফলন দেখা যায়। সত্যনিষ্ঠ ও বস্তুগত উপায়ে ফিতরাতের ধারণাকে উপলব্ধির এ প্রচেষ্টাকে চালিয়েছে প্রাকৃতিক নিয়মের অনুসারী চিন্তাবিদগণ (School of Natural Law) কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মপন্থির চিন্তাধারা নিয়ে তারা এগুতে পারেনি। কারণ, সত্য ও অবিকৃত ওহীর সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। পাশ্চাত্যের মানুষের কাছে প্রত্যাদেশ থেকে প্রাপ্ত উৎসগুলো এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যাতে কুসংস্কার ও অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাস প্রবল হয়ে ওঠে। সামাজিক অবিচারের কথা উল্লেখ না করা হলেও বলা যায় এ কারণেই পশ্চিমে ধর্ম সম্পর্কিত ধারণা মারাত্মকভাবে বিকৃত হয়ে পড়ে।

ইসলামী প্রেক্ষাপট থেকে সমাজ বিজ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণায়, জীবন, মহাবিশ্ব, প্রকৃতি এবং সব কিছু সম্পর্কে নিশ্চিত ও বস্তুনিষ্ঠভাবে অনুসন্ধান থাকা উচিত। এ কাজ করতে গিয়ে তাকে ওহীর শিক্ষা, উদ্দেশ্য ও মূল্যবোধের আলোকে অগ্রসর হতে হবে। একমাত্র এ পথে অগ্রসর হলেই সে তার পথ হারাবে না অথবা নিজস্ব ঝোঁক-প্রবণতার শিকার হবে না। আগের আলোচনার আলোকে এ কথা বলা যায়, আমাদের জন্য এটি মোটেই কোনো আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে, জটিল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে পাশ্চাত্যের পণ্ডিত সমাজ যা কিছু অর্জন করেছে সমাজ বিজ্ঞানে সে তুলনায় তেমন কিছু অর্জন করতে পারেনি এবং এটাও কোনো বিস্ময়কর ব্যাপার নয় যে, প্রযুক্তিতে পাশ্চাত্যের সাফল্যের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তি পর্যায়ে তার ব্যর্থতাও রয়েছে। আসল বিষয় হচ্ছে, একটি জীবন্ত ও গতিশীল ধারণা ও ফিতরাত মহাবিশ্বের প্রাকৃতিক

www.pathagar.com

আইনসমূহ এবং ন্যায় অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী মূল্যবোধের দ্বারা এর মধ্যকার সম্পর্কগুলো নিয়ন্ত্রিত হয়। এটি এমন এক ধারণা যা রুগ্ন মনের কুতর্ককে প্রত্যাখ্যান করে কারণ, এ কুতর্ক জ্ঞান ও অবাধ গবেষণার নামে সমাজের শোভনতার সর্বাপেক্ষা মৌলিক মাফকাঠিকে তুচ্ছ করে। এ ধরনের মনের অধিকারী যারা তারা সবচাইতে বিরক্তিকর বিকৃতিগুলোর পক্ষে কথা বলতে ইতস্তত করে না এবং এসব বিকৃতিকে তারা এমনভাবে উপস্থাপন করে যাতে মনে হয় এগুলোই রীতি বা নিয়ম, ব্যতিক্রম নয়। এ ধরনের চিন্তা এবং অন্ধ পদ্ধতি-বিজ্ঞানের পরিণাম হচ্ছে বিকৃতি বা ন্যায়ভ্রষ্টতা, দুর্নীতি এবং পথভ্রষ্টতা যা সমাজ কাঠামোকে ছিন্নভিন্ন করে এবং পারিবারিক কাঠামোকে ধ্বংস করে। পাশ্চাত্য সমাজে এটিকে চলার অনুমতি দেয়া হলে সে ওহী থেকে (খ্রিস্টান ধর্মের মাধ্যমে) এবং ইসলামী সভ্যতা (প্রধানত ক্রুসেডের সময়ে) থেকে অর্জিত সকল মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলবে।

ইসলামী ভাবাদর্শে উজ্জীবিত সমাজ বিজ্ঞানের সাথে অনৈসলামী আদর্শ অনুসারী সমাজ বিজ্ঞানের পার্থক্য সৃষ্টিকারী উপাদানগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে এ যে, ইসলামী সমাজ বিজ্ঞানকে অবশ্যই সব সময় তার লক্ষ্যে এবং উচ্চতর উদ্দেশ্য সম্পর্কে মনোযোগী হতে হবে। সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত না হবার জন্যে এটিই একমাত্র রক্ষাকবচ, নতুবা একাডেমিক স্বাধীনতার নামে এটি নৈতিক বিচ্যুতির সৃষ্টি করবে এবং যা কিছু অন্যায়, শোষণমূলক এবং দাম্ভিকতাপূর্ণ তা-ই টিকে থাকবে।

www.pathagar.com

অধ্যায় পাঁচ

সমাজ বিজ্ঞানের সূত্রসমূহ

জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পর্কে ইসলামী প্রেক্ষিতের কোন সাধারণ পদ্ধতিবিজ্ঞান ও সূত্র থাকলে বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্র এবং বিষয়ের উপযোগী সুনির্দিষ্ট সূত্র ও পদ্ধতিবিজ্ঞান রয়েছে। সমসাময়িক যুগের মুসলিম পণ্ডিতদের দায়িত্ব হচ্ছে এসব সূত্রগুলো আসলে কী তা নির্ধারণ করা, যাতে প্রয়োজনে কোন বিভ্রান্তি ছাড়া এগুলো ব্যবহার করা যায়।

আমি মনে করি এসব সূত্র নতুন ইসলামী সমাজ বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত। ইসলামী সমাজবিজ্ঞানকে প্রতি সূত্র গুচ্ছের পিছনের কারণগুলোর ব্যাখ্যা ও সুস্পষ্ট করণের দিকে মনোযোগ দিতে হবে এবং সেগুলো সত্যিকার ইসলামী পরিপ্রেক্ষিতের কতটুকু প্রতিনিধিত্ব করে, উম্মাহর প্রয়োজনের প্রতি কতটুকু সাড়া দেয় এবং বাস্তবে কি ফল হয় সে দিকেও ইসলামী সমাজ বিজ্ঞানকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

অধ্যয়নের কতগুলো ক্ষেত্র রয়েছে, যেগুলো আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। এসব গবেষণা ক্ষেত্রগুলো কাজে লাগানোর জন্য ইসলামী পরিপ্রেক্ষিতের সার্বিক কাঠামোর মধ্যে অবস্থান করে উপায়ের ধরন ও পদ্ধতিবিজ্ঞান নির্ধারণ করতে হবে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে কুরআন ও সুন্নাহ বিধৃত ওহীর মূল পাঠ এবং সে উপায়ে এগুলো সংরক্ষণ করা হয়েছে, সেগুলোকে গবেষণার সাথে যুক্ত করা হয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে, মাকাসিদ অথবা শরিয়তের উচ্চতর লক্ষ্যসমূহ, মানব প্রকৃতি ও সমাজ সম্পর্কে উপলব্ধি, সমাজের সাথে আচার-আচরণের পদ্ধতি এবং তার আদর্শ বাস্তবায়নে সহায়তা দান, সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, সামাজিক নীতিসমূহ, সমাজ প্রতিষ্ঠা ও এর উন্নয়ন এবং সমাজের কল্যাণের জন্য ইসলামী আদর্শের বাস্তবায়ন।

এখানে যে সব ক্ষেত্রের কথা বলা হয়েছে তার প্রতিটিকে স্বাভাবিকভাবে বিভিন্ন বিষয় ও শিক্ষায় বিভক্ত করা যেতে পারে। বর্তমানে জ্ঞানের ইসলামিকরণের প্রাথমিক পর্যায়ে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সমসাময়িককালে পাশ্চাত্যের পরিভাষায় মানুষের আচার-আচরণ বিশ্লেষণ ও এর কার্যকরণ নীতি সম্পর্কিত বিজ্ঞান (Behavioural Science)

www.pathagar.com

যার মধ্যে মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও নৃবিদ্যা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, এর গুরুত্ব নির্ধারণ করতে হবে। এসব বিজ্ঞানের ইসলামিকরণের পথে এগিয়ে যাওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ আজকের যুগের পণ্ডিত ও চিন্তাবিদদের আলোচ্যসূচিতে মানব প্রকৃতি, সমাজ প্রকৃতি, মানুষের অর্থ এবং মানুষের প্রকৃতি, গঠন ও চাহিদা, মৌলিক ধারণাসমূহ অধ্যয়নের জন্য বিজ্ঞানই হচ্ছে প্রকৃত ক্ষেত্র। অধিকন্তু, এসব বিজ্ঞানই তাদের সূত্র ও তত্ত্বের মাধ্যমে অন্যান্য মানবিক বিজ্ঞান, কলা, দর্শন, ইতিহাসের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

এতে কোন সন্দেহ নেই শিক্ষা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, প্রশাসন, যোগাযোগ এবং এসব বিজ্ঞানের প্রতিটির দর্শন মানুষের আচার-আচরণ সম্পর্কিত বিজ্ঞানের সূত্রাবলী, এর গবেষণার ফলাফল এবং মানব প্রকৃতি ও তার আচার ব্যবহারের ধরন বা রীতিকে কেন্দ্র করে যেসব মতবাদ সৃষ্টি হয়েছে তার ভিত্তিতে রচিত। এরপর এসব সূত্রের বিকল্প রূপে কোন ইসলামী সূত্র তৈরি করা না হলে বিভিন্ন বিজ্ঞান ও তার শাখা-প্রশাখার বাস্তব ইসলামিকরণ সম্ভব হবে না।

জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ইসলামিকরণের সব প্রচেষ্টা একটি মাত্র পূর্বশর্তের ওপর নির্ভরশীল। তা হলো, মানবীয় সম্পর্কের ফিতরাত ও গতি বিজ্ঞান সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি। যেহেতু এ ধরনের উপলব্ধি একমাত্র আচার-আচরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান বা এর মাধ্যমেই পাওয়া যেতে পারে, সেহেতু আচার-আচরণ সম্পর্কিত বিজ্ঞানের ইসলামিকরণ যুক্তিযুক্তভাবে সমাজ বিজ্ঞানের অপরাপর শাখার ইসলামিকরণের পথে প্রথম পদক্ষেপ হবে। অনুরূপভাবে শিক্ষা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতির মত বিষয়ে ইসলামিকরণ অগ্রাধিকার ভিত্তিক কাজ বলে গণ্য হলে এর ইসলামিকরণ ওসব ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের পথে স্পষ্টভাবে একধাপ অগ্রগতি বলে ধরে নেয়া যাবে। এ উদ্যোগ যাতে সাফল্যমন্ডিত হয় সে উদ্দেশ্যে প্রথমে গ্রাজুয়েট ও পোস্টগ্রাজুয়েট কর্মসূচি হাতে নিতে হবে, গবেষণা কেন্দ্র এবং এসব বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যাতে পণ্ডিতবর্গ ও চিন্তাবিদরা একসাথে এসব বিষয়ে সুষ্ঠু ইসলামী পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্টি করতে পারেন।

ইসলামিকরণ ও শিক্ষাবিজ্ঞান

মুসলিমরা নিজেদের সমস্যাবলী সমাধানে শ্রান্ত-ক্লান্ত হওয়ার পর নিজেদের দুর্বলতা ও পশ্চাৎপদতা দূরীকরণের কাজে নিজেদের নিয়োজিতকরণে ব্যর্থতার পর এবং প্রকৃতিবিজ্ঞান, সামাজিকবিজ্ঞান, আইনবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রভাব বিস্তারের সকল আশা হারানোর পর শিক্ষাবিজ্ঞান, প্রশাসনবিজ্ঞান ও অর্থনীতিবিজ্ঞানের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে। সবশেষে তারা প্রচার মাধ্যম ও গণসংযোগ মাধ্যমের দিকেও ফিরে এসেছে।

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির আশ্রয় নিয়ে নিজেদের পশ্চিমাকরণ বা আধুনিকায়নে তারা ব্যর্থ হয়েছে। এ ব্যর্থতার তিক্ততার মাঝে উম্মাহর অভ্যন্তরের

www.pathagar.com

জনগণের ইসলামের দিকে ফিরে আসার জন্য এক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। মুসলমানদের মনোযোগ নিবদ্ধ হয় ইসলামী আসালা মতবাদ (সনাতন ইসলামী নীতির নতুন রূপে প্রয়োগ) এবং উম্মাহর জীবন ও সমাজপদ্ধতিতে ইসলামী রীতিনীতি গ্রহণের প্রতি। আশা ছিল, এর ফলে তারা তাদের সমস্যা থেকে মুক্তি পাবে এবং তারা তাদের গঠনমূলক জীবনীশক্তি ও সামর্থ পুনরুদ্ধার করতে পারবে। অর্থনীতি ও যোগাযোগের ন্যায় কয়েকটি প্রধান প্রায়োগিক সমাজবিজ্ঞানের বিষয়ে ইসলামিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষাদান, বিভাগ ও গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এ মনোভঙ্গির গুরুত্বপূর্ণ অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়।

এ সব প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে সুযুক্তিপূর্ণ। এখানে এটি লক্ষ্য করা প্রয়োজন, এ দু'টি নির্দিষ্ট ক্ষেত্র অর্থনীতি ও যোগাযোগ সামর্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং যদিও এ দু'টি ক্ষেত্রে ইসলামিকরণ অত্যাবশ্যক ছিল কিন্তু বাস্তব ব্যাপার হলো যে, মুসলমানদের শিক্ষাগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তিসমূহ ইসলামী রঙে রঙিন না হলে এসব ক্ষেত্রে ইসলামিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ মুসলিম সমাজের জন্য কোন মুল্যবান বিষয় হবে না। স্পষ্টভাবে বলতে গেলে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসহ মুসলিম সমাজকে সুশৃঙ্খল করা না গেলে এ ধরনের পরিবর্তন খুব কমই কাজে লাগবে। এ কাজে মুসলিম পণ্ডিতদের তাদের সংস্কারের শক্তিকে সর্বপ্রথম শিক্ষা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রতি নিয়োজিত করা প্রয়োজন। এ মনোযোগ দেয়ার বিষয়টি বড়জোর সেমিনার, সম্মেলন অনুষ্ঠান, পাঠক্রম উন্নয়ন, অধ্যয়ন ও গবেষণা কেন্দ্র এবং একাডেমিক বিভাগ খোলা পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারে।

এ পর্যায়ে এটি লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, সাম্প্রতিককালে ইসলামী ব্যক্তিত্বের যে দিকটি স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয় তা হলো সে যা দাবি করে এবং বাস্তবে সে যা করে বা তার যা করার ক্ষমতা রয়েছে তার মধ্যে অসঙ্গতি। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের কালজয়ী বাণীর বাহক হচ্ছে মুসলিম উম্মাহ, এটি বাস্তব সত্য হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম উম্মাহ ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করেনি এমনকি তার দৈনন্দিন জীবনে, তার প্রতিষ্ঠানগুলোতে অথবা তার বাস্তব জীবনাচারে ইসলাম প্রতিফলিত হয়নি। সম্ভবত কোনো পৌরাণিক কাহিনীর ন্যায় সঙ্গীতের উপজীব্য হয়ে থাকা ছাড়া উম্মাহর জীবনে ইসলামের উপস্থিতি নেই বললেই চলে। এমনকি ব্যক্তি পর্যায়ে যেখানে মূল্যবোধ, চরিত্র ও ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ইসলামের প্রকাশ ঘটানো যেতে পারে, সে ক্ষেত্রে দেখা যায় ইসলামকে অসম্পূর্ণ ও অগোছালোভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। ফলে অন্যরা ইসলামকে একটি কাঙ্ক্ষিত বিষয় হিসেবে অথবা নিজেদের জন্য জীবন ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনার যোগ্য আদর্শ হিসেবে যাতে দেখতে পারে সে উদ্দেশ্যে তাদের অনুপ্রাণিত করার শক্তি মুসলমানরা হারিয়ে ফেলেছে।

www.pathagar.com

বর্তমান শতাব্দীতে ইসলামী শিক্ষা বিষয়ক চিন্তাধারা এবং এ সম্পর্কে ভাষা জ্ঞানের সঙ্গে যদি কেউ পরিচিত থাকে তাহলে তিনি সহজেই বুঝতে পারবেন যে, বিষয়টি সম্পর্কে একাডেমিক দিক থেকে গভীর অধ্যয়ন ছাড়া সমস্যাসমূহের কোনো সমাধান করা যাবে না। এলোমেলো পর্যবেক্ষণ যতই অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হোক না কেন, তার দ্বারা কখনো কোন কিছু অর্জন করা যাবে না। ইসলামী শিক্ষার মহৎ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইসলামী চিন্তাবিদদের অসংখ্য মতামত ও মন্তব্য থাকা সত্ত্বেও আচার-আচরণ সম্পর্কিত বিজ্ঞানে একটি সমন্বিত একাডেমিক উদ্যোগের অনুপস্থিতি লক্ষ্যণীয় এবং পালাক্রমে মানবজাতি তার প্রকৃতি এবং যে উপায়ে সে গড়ে উঠেছে সে সম্পর্কে অধ্যয়নের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে।

যে পদ্ধতিতে ইসলামী মূল্যবোধ, নীতি এবং ইসলামী আদর্শের মূলনীতিসমূহ ছাত্রদেরমনে সঞ্চারিত করা হয় তা তাদের মানসিকতা ও মানসিক বিকাশের স্তর উপযোগী নয়। বাস্তব কথা এ যে, কুরআন এবং নবী (সা) পৌত্তলিক আরব ও কুরাইশদের সম্বোধন করার জন্যে যে পদ্ধতি ব্যবহার করতেন তাই মুসলমানদের শিক্ষা পদ্ধতিকে ও মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবান্বিত করেছে। এভাবে আজকের দিনেও মুসলিম শিক্ষকরা এ পদ্ধতি ব্যবহার করেন, অবশ্য তারা যাদের জন্য এটি করেছেন তাদের অবস্থা সম্পর্কে তারা মোটেই চিন্তা করেন না। এ কারণে মুসলিমগণ কঠোরতম পদ্ধতি প্রয়োগ করে শিক্ষাদান ও সন্তানদের লালন পালন করে থাকেন। তাদের মনে করা হয় আরবগোত্রের পরিণত বয়সের লোকদের মতো, যাদের ঔদ্ধত্যের পরিণাম এবং সত্যকে অব্যাহতভাবে প্রত্যাখানের ফলাফল সম্পর্কে শিক্ষিত করতে রাসূল (সা) চেষ্টা করেছিলেন।

যখন একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষকে ঈমানের বিষয়গুলোর মত বিষয় শিখানো হয়, তখন যুক্তিগ্রাহ্যভাবেই তা তাদের সামনে পেশ করা হয়। কিন্তু শিশুদের সামনে বিষয়গুলো এমনভাবে উপস্থাপন করা উচিত যা তাদের উৎসাহিত করে ও তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক হয়। এ শিক্ষা সারাজীবন তাদের সাথী হয়। এ কারণে আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে জাহিলিয়ার যুগে যারা শ্রেষ্ঠ ছিলো ইসলামের যুগে তারা শ্রেষ্ঠ হবে যদ্দিন পর্যন্ত ইসলাম সম্পর্কে তোমরা তোমাদের জ্ঞান বাড়াতে থাকবে'। অন্য কথায় শৈশবে মজবুত ও সুন্দর চরিত্র গঠন করবে, বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তারা এ চরিত্র বজায় রাখতে পারবে। তারপর পূর্ণ বয়স্ক হবার পর তাদের জ্ঞান ও উপলব্ধি এবং ঈমান তাদের মহান ও সঠিক লক্ষ্য অর্জনে তাদের শক্তি ও সামর্থ্যকে নিয়োজিত করতে সাহায্য করবে। একটি শিশুর শিক্ষামূলক আলোচনা তার মৌলিক চরিত্র গঠনের জন্য একটি প্রক্রিয়া। বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষের জন্য এ ধরনের আলোচনাকে বড়জোর সাধারণ জ্ঞানের উপদেশ ও যুক্তিপূর্ণ পরামর্শ বলা যেতে পারে। সবচেয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমাদের

www.pathagar.com

চিন্তা-ভাবনা করা উচিত তা হলো, শিশুদের আবেগ ও মানসিকতা বিকাশের সময়কালে বিভিন্ন স্তরে আমরা কিভাবে কোন পদ্ধতিতে আমাদের শিশুদের শিক্ষাদান করবো। তাদের শিক্ষাদানের পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে আমাদের চিন্তাভাবনা করা প্রয়োজন এবং আমাদের উপলব্ধি করা উচিত যে, পরিণত বয়সের লোকদের শিক্ষাদানের জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতির সঙ্গে শিশুদের শিক্ষাদানের পার্থক্য কোথায়।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ক্রমশঃ বেড়ে ওঠা শিশুদের এমনভাবে শিক্ষাদান করা উচিত যা তাদের মধ্যে মজবুত চরিত্রের বীজ বপন করবে, তাদের স্বাধীনতা ও স্ব-নির্ভরতার চেতনা বৃদ্ধি করবে এবং গর্বের সাথে ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জীবনের লক্ষ্য অর্জনে তাদের উৎসাহিত করবে। এ পথে তাদের চরিত্রে সে সবগুণ সৃষ্টি হবে যা মানবজাতির জন্য উম্মাহর মিশনকে সফল করে তুলতে সহায়ক হবে।

এটিও সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ যে, তাদের কর্কশভাবে এবং শাসনের সুরে শিক্ষাদান করা উচিত নয়। এতে তাদের চরিত্রে উপর্যুক্ত গুণাবলী সৃষ্টি বাধাগ্রস্ত হবে এবং আল্লাহর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হবে বা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অন্য কথায়, ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষার মাধ্যমে যদি শিশুদের মনে ধর্মের জন্য ভালাবাসা বৃদ্ধি করতে হয়, ধর্ম নিয়ে যদি তাদের গর্ব করতে হয় এবং এ ক্ষেত্রে যদি কোন অবদান রাখার আকাঙ্ক্ষা হয় তাহলে তাদের ধর্মীয় শিক্ষা দান করতে হবে। শৈশবে যে ব্যক্তি এ ধরনের ভালোবাসা ও গর্বের অধিকারী হয়, সে ধৈর্য, প্রেরণা এবং ত্যাগের শক্তি-সামর্থ্য নিয়ে বড় হয়ে ওঠে। অপরদিকে যে ধর্মকে ভয় করে এবং তার শিক্ষা সম্পর্কে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে বেড়ে ওঠে তার মধ্যে আবেগ ও মনস্তত্ত্বের দিক থেকে ধর্মীয় শিক্ষাকে প্রতিহত করার মনোভাব সৃষ্টি হয়। পূর্ণ পরিণত বয়সেও এটা তার মধ্যে থেকে যায়। এ ধরনের মানুষ ধর্মের বিধান পালন করার বাইরে আর কোন কর্তব্য পালন করতে শেখে না। এভাবে কুড়েমি, ঢিলেমি আস্থা স্থাপনের অযোগ্যতা এবং অবসাদগ্রস্ত, দুর্বল দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকাংশ মুসলমানের মধ্যে ঠিক এ ধরনের চরিত্রই সৃষ্টি হয়েছে।

আমাদের ধর্ম যখন আমাদের বিবেচনায় আসে, তখন আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, আল্লাহর কাছে মুসলমানদের একটি বিশেষ স্থান আছে এবং আমরা এটাও জানি যে, যাই ঘটুক না কেন, মুসলমানরা পরিণামে জান্নাতের পুরস্কারে ভূষিত হবে। নবী (সা) বলেছেন, যে কেহ ঘোষণা করে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে, যদিও সে ব্যভিচার করে বা চুরি করে।

মুসলিম শিশুরা বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের কাজের জন্য দায়ী নয়। সুতরাং তাদের উন্নতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে কোন প্রচেষ্টা চালানোর প্রয়োজন নেই অথবা এমন কোন দায়িত্ব তাদের কাঁধে চাপানো উচিত নয় যা বহন করতে তারা সক্ষম নয়। এসব কিছুর মাঝে রাসূল (সা)-এর দৃষ্টান্ত আমাদের মনে রাখা দরকার। শিশুদের সাথে প্রিয়নবী

www.pathagar.com

(সা)-এর ব্যবহার ছিল সবরকম ভালবাসায় পরিপূর্ণ এবং উৎসাহব্যঞ্জক। উদাহরণ স্বরূপ, চাচাত ভাই ইবনে আব্বাসের প্রতি তার মায়া মমতা ছিল সুবিদিত। হাদিস সাহিত্যে এমন সব ঘটনা রয়েছে যাতে দেখা যায় বিশ্বনবী (সা) তাঁর দৌহিত্রদের বাহুতে ধারণ করে জুমার খুতবা দিচ্ছেন অথবা মসজিদে ইমাম হিসেবে তিনি যখন সিজদায় যেতেন তখন তাঁর দৌহিত্রকে তাঁর পিঠের ওপর উপবিষ্ট অবস্থায় দেখা যেত, আনাস ইবনে মালিক (যিনি তখন ছোট ছিলেন)-এর প্রতি তাঁর দয়া এবং সে বেদুইনের প্রতি তাঁর বিরক্তির কথা, যখন নবী (সা)-এর কাছে সে স্বীকার করলো যে, সে কখনো তার ছোট ছেলেমেয়েদের চুমো খায়নি, এসব কিছু আমরা হাদিসে দেখতে পাই।

এটি নিশ্চিত যে, সঠিক সময়ে এবং সঠিক পদ্ধতিতে একটি দাবি মুসলিম যুব সমাজের কাছে পৌঁছানো হলে তা তাদের বৃদ্ধি ও বিকাশের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। আবু বকর, উমর, খলিফা ইবন ওলিদ, সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাছ, আবু ওবায়দা, আমির ইবন আল জাররাহ এবং তাঁদের মত আরো অনেক পূর্ণবয়স্ক সাহাবা ইসলাম গ্রহণের পর তাদের বেলায় এ রকমই ঘটেছিল। সুতরাং ইসলামী শিক্ষার সঠিক সূচনা হলো ভৎর্সনা বা ভীতিপ্রদর্শন নয় বরং যত্ন এবং ভালোবাসা। আল্লাহকে ভালাবাসার শিক্ষা দিয়ে এ শিক্ষা শুরু হবে। এরপর শিক্ষার্থীকে আল্লাহর নবী (সা)'র সৎকর্ম, সত্য, ইনসাফ, খেলাফত, সংস্কার ও জিহাদকে ভালোবাসার শিক্ষা দেয়া হবে এবং তার মনে চিরস্থায়ীভাবে আল্লাহর সাক্ষাৎ এবং তাঁর দিদার লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করা হবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে সম্ভবত অন্য যে কোন ক্ষেত্রের তুলনায় আমরা বেশি লক্ষ্য করি যে, সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে একাডেমিক গবেষণা এবং যুক্তিগ্রাহ্য চিন্তাধারার ক্ষেত্রে যে সব প্রচেষ্টা চালানো হয় ওহীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তার পরিপূরক। এভাবেই ফিতরাত ও সম্পর্ক বিষয়ে একাডেমিক গবেষণা ইসলামের লক্ষ্য অর্জন এবং উচ্চতর আদর্শ হাসিলের একটি কার্যকর মাধ্যম। গত কয়েক শতাব্দীতে ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয় যে, সৎ উদ্দেশ্য বা নেক নিয়তই যথেষ্ট নয়। বরং যে কল্যাণ আমরা আশা করি তা বাস্তবে কীভাবে লাভ করা যায়, তা শিখে নেয়াই আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক। এ মুহূর্তে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়ের পরেও শহুরে কোরাইশা পূর্বের মতোই তাদের ছোট ছেলেমেয়েদের বেদুইনের কাছে পাঠিয়ে দিত যাতে বেদুইনরা শিশুদের মরুভূমির আরবদের বৈশিষ্ট্যের আলোকে বড় করে তুলতে পারে। স্পষ্টতঃ শিশুদের এ লালন-পালন শুধু শারীরিক দিক থেকেই ছিল না, এটি মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকেও ছিল। মরুভূমির বিশাল উন্মুক্ত প্রান্তরে শিশুরা বড় হয়ে ওঠে, তাদের মাথার ওপরে থাকে ভারমুক্ত বন্ধনহীন দিগন্ত। ব্যক্তি মানুষের ওপর সমাজের চাপিয়ে দেয়া সকল বিধি নিষেধ, রীতিনীতি থেকে মুক্ত থেকে তারা বেড়ে ওঠে। তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের এ প্রাথমিক পর্যায়ে আত্মনির্ভরশীলতা, স্বাধীনতা এবং বীরত্ব ও সাহসিকতার মত গুণাবলী স্বাভাবিকভাবেই শিশুর মৌলিক চরিত্রে স্থান পাবে।

www.pathagar.com

এভাবে ইসলামের শুরুতে কয়েক শতাব্দী ধরে রাজবংশীয় লোকজন এবং সমাজের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে এ ধারা প্রচলিত ছিল। কারণ তারা জানতো যে, ভবিষ্যতে তাদের যে দায়িত্ব বহন করতে হবে তার জন্যে এটিই হচ্ছে সম্ভাব্য সর্বোত্তম প্রস্তুতি। মরুভূমিতে জীবন বিকাশের প্রাথমিক স্তর পার হয়ে শিশুরা শহরে-বন্দরে ফিরে গিয়ে তাদের শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের কাছে আনুষ্ঠানিক লেখাপড়া শুরু করে। এ পদ্ধতিতে তাদের শিক্ষা জীবন সমাপ্ত হতো।

ইসলামী শিক্ষার যে কোন প্রাথমিক পরিচয়মূলক বইতে শিশু ও যুবকদের সাথে আলাপ, আলোচনা ও কথোপকথনের যে পদ্ধতি আল্লাহর মহান নবী (সা) ব্যবহার করতেন তার অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে। তাদের সাথে আচরণে রাসূল (সা)-এর স্নেহ-মমতা, ভালোবাসার অভিব্যক্তি দেখাতে হবে। তিনি তাদের যেভাবে যত্ন নিতেন এবং আলাপ-আলোচনা ও আচরণে যে ধৈর্যের পরিচয় দিতেন ইসলামী শিক্ষার যে কোন পুস্তকে অবশ্যই তার উল্লেখ থাকতে হবে। বাস্তবিকই নবী (সা) কখনো কোনো শিশুকে আঘাত করেননি বা কোনো যুবকের সাথে আলাপ-আলোচনা বা কথা-বার্তায় কখনো কোনো অসম্মানসূচক, সৌজন্য বিরোধী আচরণ করেননি। ইতিহাসে এ ধরনের কোন তথ্য পাওয়া যায় না। আস্থা ও ভালোবাসার ধারণা শৃঙ্খলার ধারণার সঙ্গে কিছুটা অসামঞ্জস্যশীল– এ ধরনের ভুল বুঝাবুঝির কোনো কারণ নেই। বরং এটি সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত যে, শৃঙ্খলা এমন একটি গুণ যা শিশুরা অভ্যাস, অভ্যস্তকরণ এবং অপরের উদাহরণ থেকে নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করে। অধিকন্তু শৃঙ্খলা শিক্ষাকালে শিশুরা তাদের চরিত্রের ইতিবাচক দিকগুলো থেকে সহায়তা লাভ করে। তাদের চরিত্রের ইতিবাচক দিকগুলো তাদের সাফল্য অর্জনে এবং তাদের সম্মানিত ও প্রিয় ব্যক্তিদের মেনে নিতে শেখায়।

শিশুকে স্নেহ বা ভালোবাসা দেয়া মানে তাকে নষ্ট করা এমনটি মোটেও বুঝানো যাবে না। অনুরূপভাবে এটাও মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, শিশুকে উপদেশ দেয়া বা মৃদু ভৎর্সনা করা আর শিশুকে শৃঙ্খলা শিক্ষা দেয়াকে মোটেই এক করে দেখা যাবে না। শিশুর লালন-পালনের জন্য স্নেহ-মমতা এবং শৃঙ্খলা দু'টিরই প্রয়োজন। আমাদের জন্য স্নেহ-মমতা এবং শৃঙ্খলা দু'টিরই প্রয়োজন আছে। আমরা সফল হলে আমাদের শিশুদের সফলভাবে গড়ে তুলতে পারবো। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, বর্তমান যুগে আমাদের নেতা, পণ্ডিত, জ্ঞানী ও শিক্ষাবিদদের উপলব্ধি করতে হবে যে, তাদের সামনে শিক্ষা ও সংস্কারের যে কাজ রয়েছে তা বিভিন্নভাবে নবী (সা) ইসলামের প্রাথমিক যুগে যে কাজ করেছিলেন সেটা থেকে ভিন্ন। যেসব মানুষের কাছে তিনি তাঁর পয়গাম পৌঁছিয়ে ছিলেন তারা ছিল মজবুত ও দৃঢ়চেতা। তবে সমস্যা ছিল যে, তারা ছিল অহঙ্কারী, উদ্ধত এবং গোত্রীয় মনোভাবাপন্ন। অপরদিকে আজকের যুগে উম্মাহ এবং তার যুবশক্তিকে দুর্বলচিত্ত,

www.pathagar.com

অশ্লীল আমোদ-প্রমোদে মত্ত, উচ্চাকাঙ্ক্ষাহীন এবং আত্মবিশ্বাসহীন আখ্যায়িত করা যেতে পারে।

মিশরে ফেরআউনের আমলে ইসরাইলীরা দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ ছিল। বর্তমানে মিশরে দাসত্বের যুগের ইসরাইলী সন্তানদের সাথে অনেক দিক থেকে মুসলিম উম্মাহর সাদৃশ্য রয়েছে বলা যায়। সে সময়কালে মূসা (আ) চল্লিশ বছর ধরে ইসরাইলীদের নিয়ে সিনাইয়ের ঊষর ও জনমানবহীন প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হয়েছিলেন, সে সময়ের মধ্যে তিনি একটি নতুন সূর্যের চেয়ে দৃঢ়, স্বাধীন (stronger) ও বয়ঃপ্রাপ্ত (came of age) হলেন। তখনই তারা মরুভূমি থেকে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হলো, পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করতে পারলো এবং সেখানে ইসলাম, তাওহীদ ও নবুয়তের সমাজ গঠনে সক্ষম হলো।

এখানে এ কথা উপলব্ধি করা গুরুত্বপূর্ণ যে, একটি জাতির মধ্যে সৃজণীলতা বৃদ্ধি বা প্রতিভার বিকাশের পরিবর্তে কৃত্রিমতা বা ভাসা ভাসা জ্ঞান তখনই স্থান করে নেয় যখন সে জাতির সামষ্টিক মন বা মনন বাস্তবানুগভাবে পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির মোকাবেলা করার শক্তি হারিয়ে ফেলে, ফলে বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের পাশাপাশি নিজেদের অস্তিত্বের স্বাক্ষর রাখতে পারে না। চ্যালেঞ্জ গ্রহণে ইতস্তত করে। ইসরাইলের সন্তান ও তাদের রাব্বি বা ওলামাদের বেলায় ঠিক এমনটি ঘটেছিল। তাদের মধ্যে কোনো গরীব মানুষ চুরি করলে তারা তাকে কঠোরতম শাস্তি দিত, কিন্তু কোনো ধনী একই অপরাধে অভিযুক্ত হলে তাকে ছেড়ে দেয়া হতো। এ কারণে আল্লাহর নবী ঈসা (আ)-এর শিক্ষা ও মিশনের কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল, বনী ইসরাইলকে তাদের মৌল শিক্ষার দিকে ফিরিয়ে আনা, আপন জাতি বা গোত্রের মানুষদের ভালবাসার মাধ্যমে শিক্ষার দিকে তাদের আন্তরিকতা ও সেবার মনোভাব সৃষ্টির দিকে প্রত্যাবর্তন করানো।

এভাবে বলা যায়, উম্মাহর মধ্যে শিক্ষা ও লালনপালনের ক্ষেত্রে সংস্কারের কাজটি যেভাবে করা যাবে, একটি পরিণত ও উন্নত জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ পদ্ধতির অনুরূপ হবে না। অপর পক্ষে এ কাজ হবে একটি রুগ্ন ও দুর্বল জনগোষ্ঠীকে চিকিৎসা সুবিধা দেয়ার মতো যারা তাদের শক্তি, সংকল্প, উদ্ভাবনী দক্ষতা এবং ভালোবাসাকে হারিয়ে ফেলেছে।

মুসলিম শিক্ষাবিদদের তাদের মিশনকে ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে। তাদেরকে সুস্পষ্ট লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতি সম্বলিত একটি সুসংজ্ঞায়িত ইসলামী শিক্ষা তত্ত্ব সৃষ্টির জন্য একযোগে কাজ করতে হবে। বিশেষভাবে তাদেরকে শিক্ষার মনস্তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিকের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতে হবে। এ ক্ষেত্রে তাদেরকে উম্মাহর মনস্তাত্ত্বিক গঠন এবং যেসব দিকে তার সংস্কারের প্রয়োজন আছে তা বিবেচনা করতে হবে। এটিও গুরুত্বপূর্ণ যে, ওহী থেকে আমরা মানুষের বিচিত্র আধ্যাত্মিক, আবেগ সংক্রান্ত বস্তুগত বহুমাত্রিকতার পরিচয় পাই, তার আলোকে মুসলিম মনস্তত্ত্ববিদ ও সমাজ বিজ্ঞানীদের

www.pathagar.com

মনস্তত্ত্ব ও অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞানের ইসলামিকরণের জন্য নতুন করে প্রচেষ্টা চালাতে হবে যাতে মুসলিম শিক্ষকদের মানুষের ফিতরাত সম্পর্কে জ্ঞান ও সচেতনতা দান করা যায়, তাদের বোঝানো যায় কীভাবে মানবীয় ফিতরাতের বিকাশ ঘটে এবং সর্বোত্তম কোনো উপায়ে একে কাজে লাগানো যায়।

ইসলামিকরণ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান

উম্মাহর রাজনীতি, এর অগ্রাধিকারসমূহ, নীতি এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক নেতৃত্ব বাছাই করার পদ্ধতি, উম্মাহর সাধারণ রাজনৈতিক আলোচ্য সূচি সুস্পষ্টকরণ, উম্মাহর রাজনৈতিক পদ্ধতি, বিধিবদ্ধ আইন, উপবিধি, ব্যবস্থা বা পদ্ধতি চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন, ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশাসন, তার শক্তি ও সম্ভাবনার পরিচালনা সম্পর্কিত গবেষণাকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রবিজ্ঞান কাজ করে। আদর্শিক এবং সাংবিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এসব বিষয় বর্তমান যুগে উম্মাহর জন্য অত্যন্ত জরুরি বিষয়।

রাজনীতির অধ্যয়ন ও অনুশীলন এসব উপাদানের সঠিক উপলব্ধির ওপর নির্ভর। এসব উপাদান যেভাবে পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত হয় তা সঠিকভাবে বোঝা প্রয়োজন। রাজনীতির আরো দাবি– সমাধান উপস্থাপন করার যোগ্যতা, পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলার সামর্থ ও সক্ষমতা এবং এসব কিছু এমনভাবে হতে হবে যাতে উম্মাহর কল্যাণ, উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হয়। এভাবে উম্মাহর যেসব ঐতিহাসিক মডেল উপস্থাপিত হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে অধ্যয়ন, যদিও নিশ্চিতভাবেই তা করা হয় না, কারণ উম্মাহ কখনো এগিয়ে গেলে তার যে ধরনের অধ্যায়ন প্রয়োজন সেসব মডেল তার গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। এ অধ্যয়নকালে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকার প্রতি মনোযোগ দেয়া উচিত। এ ধরনের অধ্যয়ন এসব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যে পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল তার পেছনের কারণসমূহের উপর আলোকপাত করতে পারবে এবং সংগঠনের নবায়ন বা নতুন করে সৃষ্টির কাজে সহায়তা দিতে পারবে। বাস্তবিকই উম্মাহ যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের জন্য তার বিশেষ অবস্থা, পরিস্থিতি ও মুল্যবোধ অনুগত রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে না পারবে, সে কখনো উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারবে না। আমাদের যা উপলব্ধি করা প্রয়োজন তা হচ্ছে, উম্মাহর রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং তার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে উম্মাহর সত্যিকার মেজাজ এবং চিন্তাধারার প্রতিফলন থাকতে হবে। অন্যথায় কোনো নেতৃত্ব, সরকারি প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের আকর্ষণ উন্নত হবে অথবা টিকে থাকবে এমন আশা কখনো করা যাবে না।

উম্মাহর রাজনীতিকে আমরা সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে চাইলে আমাদের অবশ্যই এ কথা উপলব্ধি করতে হবে যে, এসব কিছুর জন্য অত্যাবশ্যক বিষয় হলো আমাদের যুব

www.pathagar.com

সমাজকে আমরা কি ধরনের শিক্ষায় শিক্ষিত করি এবং কীভাবে তাদের লালনপালন করি।

এটি নিশ্চিত যে, উম্মাহর পদ্ধতি এবং নেতৃত্ব উভয়ই তার ব্যক্তিত্ব ও চিন্তাধারার প্রতিফলন। অধিকন্তু কোনো পদ্ধতি কখনো বদলানো যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার মনস্তাত্ত্বিক ও আদর্শিক ভিত পরিবর্তন করা না যায়। কাজেই আমরা উম্মাহর বিভিন্ন পদ্ধতি, নেতৃত্ব, প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিবর্তন করতে চাইলে উম্মাহর চিন্তাধারা ও অনুভূতিকে সামনে রেখে আমাদেরকে অবশ্যই ভিত্তিমূল পর্যায়ে কাজ শুরু করতে হবে। সঠিক ইসলামী রাজনীতি হবে সুষ্ঠু ও সঠিক ভাবধারা সৃষ্টিতে সক্ষম একটি উম্মাহর অবদান। এমন একটি উম্মাহর রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই তাদের উপর ন্যস্ত প্রশাসনে তাদের সদস্যদের অংশগ্রহণ এবং উম্মাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে দেয়া সুচিন্তিত পরামর্শের ভিত্তিতে চলতে হবে।

এসব কারণে উম্মাহর রাজনৈতিক চিন্তাধারা পুনর্গঠিত করা একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষা সম্পর্কেও এটি সমভাবে প্রযোজ্য। এটি করা হলেই কেবল উম্মাহর রাজনৈতিক ও শিক্ষা ব্যবস্থায় তার বিশেষ কর্ম ও মনস্তাত্ত্বিক সংবিধানের প্রতিফলন দেখা যাবে বা তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুধাবন করা যাবে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একাডেমিক অধ্যয়ন উম্মাহকে তার সমগ্রতা এবং সামাজিক সংবেদনশীলতা ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে, সমাজ পর্যায়ে কাজ করার ক্ষেত্রে তার প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রাণশক্তির নবায়নে এবং তার রাজনৈতিক নেতৃত্বকে গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী অঙ্গীকারের দিকে পরিচালনার বিষয়ে অবশ্যই সহায়ক হতে হবে। এমনটি ঘটলে উম্মাহর রাজনৈতিক নেতৃত্ব অবশেষে উম্মাহর আস্থা ও সমর্থন লাভ করবে। এটি অত্যাবশ্যক যে, ইসলামী রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও প্রতিষ্ঠানগুলো অবশ্যই উম্মাহকে ব্যর্থতা ও অপমান থেকে মুক্তি দেবে। কারণ এ ব্যর্থতা ও অপমান উম্মাহকে সুস্পষ্ট ও লক্ষণীয়ভাবে দাস মানসিকতায় নিক্ষেপ করেছে। এ দাস মানসিকতা তাদেরকে স্বাধীন ইচ্ছা ও স্বাধীন কর্মতৎপরতা থেকে বঞ্চিত করেছে।

উম্মাহর বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতৃত্বকে অবশ্যই মনস্তাত্ত্বিক ও একাডেমিক সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে যা সত্যবাদিতা, বস্তুনিষ্ঠ চিন্তাধারা এবং নিজের অস্তিত্বের গর্ববোধকে দাসত্বের নিগড়ে, অমুসলিমদের প্রতি অসহিষ্ণুতায়, অদৃষ্টবাদ, তকলিদ এবং সবশেষে দুর্দশা ও অধঃপতনে নিক্ষেপ করেছে। বরং আমাদের অবশ্যই এটি নিশ্চত করতে হবে যে, মানুষ যাতে ইসলামী চিন্তাধারাকে সম্মান ও শালীনতার রক্ষক হিসেবে উপলব্ধি করে এবং তাকে সত্য, সুন্দর, ত্যাগ, খিলাফত ও সংস্কারের প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করে।

উম্মাহর বর্তমান অধপতিত অবস্থা, তার দুর্বলতা, তার পতন, তার দুশমন, আতঙ্ক, শত্রুর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ষড়যন্ত্রের কাছে তার নতি স্বীকার, তার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব– এসব কিছুই

www.pathagar.com

হচ্ছে উম্মাহর দাস মানসিকতার প্রতিফলন। দুর্বল চিন্তাধারা এবং বিকৃত মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা লালনের ফলে এ দাস মনোবৃত্তির সৃষ্টি হয়।

অধিকন্তু, ইসলামী রাজনৈতিক বিষয় অধ্যয়নে ওহীর শব্দাবলী, একাডেমিক অধ্যয়নের ব্যাখ্যা এবং আইন প্রণেতা ও রাজনীতিবিদদের সিদ্ধান্তের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য করতে হবে। চিন্তাবিদ ও পণ্ডিতগণের একাডেমিক অধ্যয়ন ওহীর কালাম থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সামাজিক আইন প্রণয়ন ও রাজনৈতিক সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলে উদ্ভূত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও একাডেমিক অধ্যয়ন এক নয়। বরং এগুলো উম্মাহর জন্য চিন্তাধারার সমৃদ্ধ উৎসের প্রতিনিধিত্ব করে এবং এগুলো এমন মাধ্যম যাতে তার দৃষ্টি, কল্পনাশক্তি স্বচ্ছ হতে পারে।

রাজনৈতিক ও সামাজিক আইন প্রণয়নে পণ্ডিতগণের ভিন্ন ভিন্ন মত এসব বিষয়ে যে কোনো পক্ষের সমর্থকের মতকে খর্ব করে না। কাজেই কোনো একটি মতকে উম্মাহর সামনে যে সমস্যা আছে তা উপলব্ধির জন্য এক ধরনের সাহায্যের চেয়ে বড় কিছু হিসাবে নেয়া উচিত নয়। সুতরাং উম্মাহর গুণী লোকজন যত বেশি মত বা চিন্তাধারা সৃষ্টি করবে, তখন উম্মাহর পক্ষে সামাজিক ও রাজনৈতিক আইন প্রণয়নকে বস্তুনিষ্ঠ ও পরিপক্ক উপায়ে এবং তার প্রত্যয় ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে বিবেচনা করার সম্ভাবনা ততোধিক বেড়ে যাবে। এভাবেই সামাজিক ও রাজনৈতিক আইন প্রণয়ন সম্পর্কিত সিদ্ধান্তসমূহে জনগণ ও উম্মাহর বৃহত্তর স্বার্থের প্রতিফলন দেখা যাবে, যদিও এসব সিদ্ধান্ত সবসময় কিছু নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা দলের মতের সাথে মেলে না। রাষ্ট্র বিজ্ঞানের পণ্ডিতদের সামনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে উম্মাহর মানসিক গঠন ও চিন্তাধারার অপরিবর্তনীয় বিষয়গুলোকে সংজ্ঞায়িত করা। পণ্ডিতদের আরো ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হবে– আইন ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সর্বোত্তম কোন্ উপায়ে এ অপরিবর্তনীয় বিষয়গুলো ব্যবহার করা যাবে এবং উম্মাহর সমগ্র নির্বাহী ও সাংবিধানিক কাঠামো পাল্টিয়ে না দিয়ে সর্বোত্তম কোন্ উপায়ে চ্যালেঞ্জসমূহের মোকাবিলা করা যাবে। এটি এখন স্পষ্ট যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রতিষ্ঠানসমূহ মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক প্রয়োজন মেটাবে না। ইসলামী উম্মাহ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিপরীতে, সত্য ও ইনসাফের সেবাকে তার পবিত্র কর্তব্য জ্ঞান করে। একইভাবে সে ওহী, ফিতরাত এবং যুক্তির মাঝে যে সত্য খুঁজে বেড়ায় তা বৈষয়িক ও বাস্তব। যখন সত্যের নির্দেশনা অনুসরণকে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ইসলামী কল্যাণ অর্জন করার সর্বোত্তম উপায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তখন সত্যে পৌঁছার জন্য পারস্পরিক পরামর্শকে উম্মাহ একটি মৌলিক পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করে। এখানে আমরা দেখতে পাই যে, পশ্চিমা দলীয় পদ্ধতি বাস্তব বা বস্তুনিষ্ঠ সত্যে উপনীত হওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী নয় অথবা পাশ্চাত্যে দলীয় ব্যবস্থার মধ্যে ইসলামী শূরার গতিশীলতা আনয়নের জন্য কোনো পন্থা উদ্ভাবন করা হয়নি। অপরদিকে প্রাচ্যের মার্কসবাদী দেশগুলোতে যে একনায়কত্ববাদ (Totalitarianism) পরিদৃষ্ট হয় তা কাঙ্ক্ষিত ইসলামী ধারণা থেকে

www.pathagar.com

বহুদূরে। বস্তুবাদ ও যুক্তিবাদ সমসাময়িক পশ্চিমা সভ্যতার ভিত্তি। পাশ্চাত্য সভ্যতার কোনো ধর্মীয় দিক যদিও বা পাওয়া যায় তা হচ্ছে তাদের উত্তরাধিকারের (Heritage) অবশিষ্ট ছিটেফোঁটা, যা বিলুপ্ত হবার নয় এবং প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, বহুলভাবে ইসলামী সভ্যতা থেকে তা তারা ধার করেছে।

এ যুক্তিবাদী বস্তুবাদের আলোকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সৃষ্টিগুলো এ পদ্ধতি অনুযায়ী ব্যক্তি ও সমাজের জন্য যা সর্বোত্তম তা অর্জনের জন্য সংসদীয় (অথবা দলীয়) সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতকে সম্ভাব্য সর্বোত্তম ব্যবস্থারূপে বিবেচনা করে। এভাবে গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তসমূহ হয় সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত। এসব সিদ্ধান্ত নেয়া হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের রাজনৈতিক দলের স্বার্থে। অপরদিকে মার্কসবাদের সৃষ্টি হয় একটি সংস্কারমূলক আন্দোলনরূপে। মার্কসাবদ মানব মনে দেবত্ব আরোপ করে তাকে সংগঠিত ধর্মগুলোকে প্রকাশ্যে নিন্দা করতে শেখায় এবং জনসমক্ষে নিজস্ব নাস্তিক্যবাদের প্রচার করে। এভাবে মার্কসবাদ অর্থনীতি ও বৈষয়িক সমৃদ্ধিকে সব মানবিক আকাঙ্ক্ষা ও ইতিহাসের লক্ষ্য বলে মনে করে। ইতিহাসে মানবজাতির বৈষয়িক অগ্রগতি বা উন্নতির তুলনায় ব্যক্তি জীবন অপেক্ষাকৃত গুরুত্বহীন। মার্কসবাদের আদর্শিক ভিত্তিমূলে এ উপলব্ধি নিয়ে যখন দেখা যায় ইউরোপে সমূহবাদ ও একনায়কত্ববাদ দীর্ঘদিন ধরে আধিপত্য বিস্তার করে আছে তখন আমরা আর বিস্মিত হই না।

এখানে এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ওহীকে প্রত্যাখ্যান করে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক পথ নির্দেশনা থেকে পাশ্চাত্য বঞ্চিত হয়েছে এবং এ কারণেই সে বস্তুবাদের ফাঁদে আটকা পড়েছে। মূলতঃ মানবীয় যুক্তি ও উপলব্ধির সীমিত প্রকৃতিই পাশ্চাত্যের সামনে উপস্থাপিত সামাজিক, নৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার আসল কারণ। আরেকটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন যে, মানবজাতির প্রতি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে ইসলামী চিন্তাধারার সাথে পশ্চিমা চিন্তাধারার পার্থক্য রয়েছে। ইসলাম জীবনের বিভিন্ন দিককে স্বীকৃতি দেয় এবং ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় এবং সত্য-মিথ্যার মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীন ইচ্ছার প্রয়োগকে এ জীবনে তার উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করে। এ দৃষ্টিভঙ্গী বা দর্শন ব্যক্তির অস্তিত্ব ও তার ইচ্ছার বাইরে সত্যকে বাস্তব করে তুলেছে। এ কারণে ব্যক্তির জন্য এটি এমন এক বিষয়ে পরিণত হয় যার জন্যে তাকে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এ কারণে ইসলামে শাসন বা আল হুকুম– এর ধারণা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের গণতান্ত্রিক ধারণা এ দু'টি বিষয় এক নয়। বরং ইসলামী শাসন বা আল-হুকুমের ধারণা হচ্ছে উম্মাহর সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পারস্পরিক পরামর্শ বা শূরা এবং সত্যের অনুসন্ধান ও সমস্যা সমাধানে স্বাধীনভাবে মত বিনিময়ের ধারণা। এ প্রক্রিয়ায় শুধু ওহীর শিক্ষা, প্রাকৃতিক আইন এবং উম্মাহর প্রয়োজন ও চাহিদাকে বিবেচনায় নিতে হবে।

সুতরাং শূরার দৃষ্টিভঙ্গি এবং উদ্দেশ্য গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও উদ্দেশ্য থেকে ভিন্ন যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন, সত্য বা হক সম্পর্কে

www.pathagar.com

অস্পষ্টতা থাকলে অথবা যে ক্ষেত্রে কোন সুস্পষ্ট ঐক্যমত বা ইজমা নেই সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া প্রয়োজনীয় বিষয়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে ধরে নেয়া হয় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতই হচ্ছে সঠিক। শূরার প্রতিষ্ঠান এবং তার পদ্ধতিতে ওহীর মূল পাঠের মধ্যে সত্যের অনুসন্ধানে ফিতরাহর প্রেরণায় এবং বিশ্ব প্রকৃতির বিধানে শূরার ধারণা প্রতিফলিত হতে হবে। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এবং এর প্রক্রিয়াসমূহ ক্ষমতাসীন দল বা কোয়ালিশনভুক্ত ব্যক্তিবর্গের স্বার্থ ও মতামতের ভিত্তিতে স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রচেষ্টা চালায়। এর সঙ্গে শূরার অবশ্যই পার্থক্য থাকবে।

দৃষ্টিভঙ্গি ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা পশ্চিমা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান থেকে পৃথক হলে ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠানসমূহে অবশ্যই এ ভিন্নতার প্রতিফলন থাকতে হবে। সুতরাং এটা অত্যাবশ্যক যে, ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে বাছাইয়ের স্বাধীনতা এবং তার আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো যেমন বিশ্বাস, চিন্তাধারা এবং সংগঠিত সামাজিক ব্যবস্থা গ্রহণের স্বাধীনতা থাকতে হবে। একই সাথে এটিও অত্যাবশ্যক যে, এ ব্যবস্থায় উম্মাহর দৃঢ় প্রত্যয় এবং তার আদর্শের প্রতিফলন থাকতে হবে। সে যা হোক, সত্যিকার অর্থে প্রতিনিধিত্বশীল নেতৃত্ব ছাড়া এর কোনটাই সম্ভব হবে না। এ ধরনের নেতারা হবেন নির্বাচিত এবং একই সাথে সমর্থনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের উপদেশ ও পরামর্শ থেকে কল্যাণ লাভের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও গুণাবলীর অধিকারী। এসব ব্যবস্থা বা পদ্ধতিকে বোঝা এবং সেগুলোকে অন্যান্য ব্যবস্থা বা পদ্ধিতির সাথে তুলনা করার প্রচেষ্টায় সর্বাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্বের পেছনে যে সব যুক্তি রয়েছে তা আগের আলোচনার দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা। আমাদেরকে একটি মৌলিক ইসলামী পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো তৈরি করার ব্যাপারেও সাহায্য করা উচিত। মৌলিক ইসলামী ব্যবস্থা বা পদ্ধতি অন্যদের অভিজ্ঞতা থেকে উৎকৃষ্ট হবে, তাদেরকে শুধু নকল করার চেষ্টা মনে করা হবে না। কারণ, তাদের কাছে তখন এটি পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্য উম্মাহর দৃষ্টিভঙ্গি এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থেকে অনেকটা ভিন্ন।

সুতরাং কোন্ ব্যবস্থা বা পদ্ধতিতে রাজনীতি ক্ষেত্রে ইসলামী চেতনার সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটে। কীভাবেই বা এ পদ্ধতি সৃষ্টি করা যাবে? নিঃসন্দেহে ইসলামী পদ্ধতি আদর্শিক এবং সাংবিধানিক শর্তাবলী ও গুণাবলীর দ্বারা পৃথকভাবে চিহ্নিত হবে, এ জন্যে কিছু গ্যারান্টি দিতে হবে। একইভাবে শিক্ষা পদ্ধতিতে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টিতে এবং ইসলামী রাজনৈতিক পদ্ধতি এবং সহায়ক রাজনৈতিক ও আইন প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে কাজ করতে হলে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হবে। যোগ্যতা ও উদারতার ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলগুলোর সংগঠন করতে হবে যাতে এটি নিশ্চিত করা যায় যে, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক পরামর্শ ও অভিজ্ঞতার প্রতিনিধিত্ব করে। এর মাধ্যমে বুঝতে হবে যে, এ ব্যবস্থা বা

www.pathagar.com

পদ্ধতির অভ্যন্তরে বাস্তব চাহিদা এবং জরুরি পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃত্বের কয়েকটি পর্যায়, পরামর্শ পরিষদ ও আইন প্রণয়নকারী সংস্থা রয়েছে। উম্মাহর নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ যাতে গঠনমূলকভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সক্রিয় হতে পারে সে লক্ষ্যে রাজনৈতিক মত প্রকাশের মাধ্যমেও সংগঠনকে যথেষ্ট নমনীয় হতে হবে। এভাবে ইসলামী পদ্ধতির রাজনৈতিক দলগুলোকে সংসদীয় গ্রুপিং-এর মতো মনে হবে। সংসদীয় গ্রুপিংগুলো কোন নিয়ন্ত্রণ মানে না বা পূর্বে নির্ধারিত কোনো দলীয় অবস্থানের কাছে আত্মসমর্পণ করে না। বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের প্রেক্ষিতে গ্রুপ যে কর্মপন্থা গ্রহণ করে তা তাদের বস্তুনিষ্ঠ প্রত্যয়, ধারণা ও উপলব্ধি এবং শূরার মাধ্যমে প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে হয়।

কয়েকটি মুসলিম দেশে সম্প্রতি ক্ষমতাসীন দলগুলো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ পদক্ষেপটি হলো শাসক গোষ্ঠীর নিজ দলের বাইরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গঠনের অনুমতি দান ছাড়াও ইসলামী আন্দোলনসমূহের নেতৃত্ব থেকে কয়েকজন ব্যক্তিত্বকে শাসক দলে শামিল করে নেয়া হয়েছে। এভাবে ধর্মনিষ্ঠ মুসলিম নেতৃবৃন্দ তাদের প্রজ্ঞা এবং রাজনৈতিক বাস্তবতা উপলব্ধির কারণে জনগণের আস্থা ও সম্মান লাভে সক্ষম হয়েছে। সাধারণভাবে পরিচিত বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর সমসাময়িককালের রাজনৈতিক জীবনে যে সব ঘটনা আমরা দেখতে পাই তা থেকে আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি উম্মাহ কীভাবে রাজনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণে এবং তাকে দুর্নীতির হাত থেকে রক্ষায় তার ভূমিকা সম্প্রসারিত করতে পারে। আমরা আরো শিখতে পারি আমরা কীভাবে রাজনৈতিক ফোরাম গড়ে তুলতে পারি এবং রাজনৈতিক সক্রিয়তার বিকাশ ঘটাতে পারি, যাতে রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্য বৃহত্তর পরিসরে স্বাধীনতা নিশ্চিত করা যায়। তাদের সিদ্ধান্ত আরও বস্তুনিষ্ঠ হয় এবং মুসলিম জনসাধারণের স্বার্থেরও উত্তম প্রতিনিধিত্ব করা যায়। এসব কিছু করতে গিয়ে মুসলিম পণ্ডিত ও আইন প্রণেতাদেরকে উম্মাহর স্বার্থ, প্রয়োজন ও মেজাজ রক্ষার উপযোগী বিকল্প হিসেবে চিন্তা করতে উৎসাহিত করা উচিত। যখন এ কাজ সম্পন্ন হবে অনুকরণ ও ভিন্ন ব্যবস্থার অংশ বিশেষ আমদানির আর কোনো প্রয়োজন থাকবে না।

মুসলিম উম্মাহর ক্রমবর্ধমান আকার যেভাবে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গেছে বিভিন্ন দেশে, জনগোষ্ঠিতে, সংস্কৃতিতে এবং ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় তার দিকে লক্ষ্য করলে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে উপলব্ধি করতে পারি যে, তাদের জন্য সবচেয়ে উপযোগী সরকার পদ্ধতি হবে এমন যা মুসলিম দেশগুলোতে শাসনের দায়িত্ব স্থানীয়, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বণ্টন করবে এবং মুসলিম দেশগুলোকে একটি শিথিল ফেডারেশনে শামিল রাখবে। এ ধরনের ব্যবস্থা নেতৃত্বের জন্য বিভিন্ন বিষয়কে সহজ করে তুলবে এবং জনসাধারণকে সরকারি দায়িত্ব পালনে অংশগ্রহণের জন্য উত্তম সুযোগ সৃষ্টি করে দেবে। ইসলামী

www.pathagar.com

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডের ইসলামী সূত্রগুলো এমন হওয়া প্রয়োজন যা খেলাফত সম্পর্কে আমাদের বর্তমান উপলব্ধিকে ছাড়িয়ে যাবে। খেলাফত সম্পর্কে আমাদের বর্তমান উপলব্ধি হচ্ছে– এটি একটি ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান, আমাদের জন্য প্রয়োজন এটির অনুসরণ করা এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুসলমানরা যেভাবে খেলাফত চালিয়েছিল ঠিক সেভাবে খেলাফত ব্যবস্থা চালু করা। এর পরিবর্তে এখন থেকে খেলাফতকে একটি গতিশীল ব্যবস্থা হিসেবে আমাদের বুঝতে হবে, যার লক্ষ্য হবে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে মূল্যবোধ ও নীতি প্রতিষ্ঠা করা এবং নাগরিকদের ধর্মীয় ও পার্থিব স্বার্থের প্রতি মনোনিবেশ করে উচ্চতর লক্ষ্য অর্জন করা। এর ভিত্তিতে বিভিন্ন পদ্ধতি এবং প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে অনুসন্ধান চালিয়ে সেগুলোকে উম্মাহর স্বার্থ হাসিলের জন্য নতুনভাবে ঢেলে সাজানোতে (re-designing) আপত্তির কিছু নেই।

যারা খেলাফত সম্পর্কে অধ্যয়ন করে একে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের কেন্দ্রায়নের ভিত্তিতে একটি জটিল ব্যবস্থা বলে মনে করে তারা সত্যিকারভাবে এ রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বোঝেনি। উম্মাহ তার আধ্যাত্মিক ও পার্থিব আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য যে কোনো পদ্ধতির সরকার নিজের জন্য বেছে নিতে পারে এবং এ ধরনের সরকারকে খেলাফত ব্যবস্থা হিসেবে বুঝতে হবে এবং এভাবেই সে ব্যবস্থা উম্মাহর সমর্থনযোগ্য হবে। ইতিহাসে যে সরকার পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে ছাত্রদের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করা উচিত নয়। কারণ মূল বা আসলকে ছেড়ে দিয়ে আকার আকৃতি আঁকড়ে থাকা হচ্ছে অনভিজ্ঞতার ফল।

ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সূত্রগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে উম্মাহর জীবনে তার সংগঠনে, তার সম্ভাবনা শক্তিতে এবং তার স্বার্থ ও প্রেক্ষিতের পার্থক্য, ইসলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যে ভূমিকা পালন করে সে সম্পর্কিত জ্ঞান। অপরদিকে পশ্চিমা রাজনৈতিক কাঠামো হলো কল্পনা ও বাস্তবতা। এ বিষয়ে তারা মূল্যবোধ ও নীতিকে ঘৃণার চোখে দেখে, কারণ এগুলো বর্তমান পরিস্থিতির ও প্রয়োজনের কোনো প্রতিফলন নয়। সুতরাং পাশ্চাত্যবাসীকে তার নৈরাশ্যবাদের জন্য ক্ষমা করা অযৌক্তিক (কারণ তার সংস্কৃতিতে ওহীর সূত্রগুলোর বিকৃতির কারণে এ নৈরাশ্যবাদ সৃষ্টি হয়েছে)। ইসলাম যে লক্ষ্য, নীতি ও নির্দেশনা নিয়ে এসেছে তা কোনো অনুমান বা কল্পনা নয় বরং এটি সৃষ্টি, ফিতরাত এবং যে সত্যের ওপর আকাশ ও পৃথিবী তৈরি হয়েছে তা থেকে এসেছে।

ইসলাম বিভিন্ন বৈপরিত্যকে (Opposites) চিহ্নিত করে যেমন, ভালো-মন্দ, সত্য ও মিথ্যা, হেদায়েত ও পথভ্রষ্টতা, সততা ও দুর্নীতি ইত্যাদি। তবে ইসলামী সমাজ পৌরাণিক কাহিনীকে বাস্তবতার বিপরীত বিষয় হিসেবে মনে করে। বরং ইসলামী সমাজে মিথ্যা, পথভ্রষ্ঠতা এবং দুর্নীতির বিপরীতে রয়েছে সুষ্ঠু নির্দেশনা, সততা ও ন্যায়পরায়ণতা। ব্যক্তি ও সমাজের উপর এসব পরস্পরবিরোধী পরিবর্তনশীল দোষগুণ কতটুকু প্রভাব বিস্তার করতে পারে তার উপর সমাজের অবস্থা নির্ভর করবে।

www.pathagar.com

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সমসাময়িক ইসলামী চিন্তাধারাকে সেসব বিতর্ক ও পরিবেশ থেকে মুক্ত করতে হবে যা উম্মাহকে তার ইতিহাসের শুরু থেকেই চারিদিক থেকে আক্রমণ করছে এবং যে বিতর্ক ও পরিবেশ পরিস্থিতি ওহীর উৎসগুলোর নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ ব্যাখ্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ বিশেষ ও সীমাবদ্ধ ব্যাখ্যা এমনভাবে করা হয় যাতে এক গ্রুপ বা অপর গ্রুপের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল হয়। বাস্তবিকই এভাবে অনেক আগে থেকে উম্মাহর বিভিন্ন বিষয় পরিচালনায় তাওহীদ ও শূরার উপাদানগুলোকে পৃথক করে ফেলা হয়। পরিবর্তে বিভিন্ন বিজ্ঞমন্ডলী তাদের পৃষ্ঠপোষকদের রাজনৈতিক দাবিকে সত্য প্রমাণিত করার জন্য বিভিন্ন বক্তব্য ও ঐতিহাসিক নজির খুঁজে বের করে। ফলে উম্মাহ ইসলামী মিশনের দায়িত্ব বহনের এবং পৃথিবীতে ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। রাজনৈতিক জীবনের ইসলামিকরণের বাস্তব অর্থ হলো চিন্তা (Idea) ও শিক্ষার ইসলামিকরণ, রাষ্ট্রে ব্যবহৃত Polity-র মৌল বিষয়সমূহ– এর নেতৃত্ব, এর সংগঠন এবং এর ইসলামীকরণ। এ Islamization এর অর্থ হচ্ছে বাস্তববাদী শূরার মাধ্যমে ইসলামের মৌলিক মূল্যবোধ ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের আনুগত্য এবং উম্মাহ ও তার রাজনৈতিক ভিতকে (Polotical base of elite) সে আনুগত্যের মৌলিক বিষয় ও সরাসরি পথ (Forthright ways) সম্পর্কে শিক্ষিত করা।

আমাদের উপলব্ধির জন্য আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সামাজিক ও রাজনৈতিক। এ উপলব্ধিগুলো প্রতিফলিত হয় রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের দ্বারা। আদর্শিকভাবে বলতে গেলে এ ধরনের সিদ্ধান্তগুলো ওহী ও ফিতরাত এবং বাস্তবতাসহ ইসলামের উচ্চতর লক্ষ্য ও আদর্শের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সমন্বয়ের ফল। এ সম্পর্কের ব্যাখ্যা দিয়ে কুরআনের আয়াত নাজিল হয়, "আল্লাহর আনুগত্য করো, নবীর আনুগত্য করো এবং যারা তোমাদের মধ্যে কর্তৃত্বের অধিকারী" (৪ : ৫৯)। যে ধরনের আনুগত্য ও অভিজ্ঞতার বিষয় এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তা শুধু কুরআনের আয়াত সম্পর্কে একাডেমিক অনুসন্ধান ও গবেষণার মাধ্যমে পাওয়া যাবে না বরং কুরআনের আয়াত এবং বাস্তব অবস্থায় প্রতিনিধিত্বকারী উম্মাহর পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত অঙ্গীকারবদ্ধ ইসলামী নেতৃত্বের মধ্যে বাস্তব যোগাযোগ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে পাওয়া যাবে। উল্লেখ্য, এ বাস্তবতার মধ্যে বাস্তব অবস্থার প্রতিফলন থাকবে এবং এর বাস্তবতা এমন হবে যা তার প্রয়োজন তা করার জন্য এবং তার সামনে যে সব চ্যালেঞ্জ রয়েছে তা মোকাবিলার জন্য হিকমতের সাহায্যে এগিয়ে আছে। অন্যথা কুরআন ও সুন্নাহ হয়ে যাবে ধ্বংসাত্মক বিভেদ সৃষ্টিকারী, বিপথে পরিচালনাকারী এবং অবস্তাব চিন্তাধারার অনুকূল কালামে ওহী (নাউজুবিল্লাহ)।

উম্মাহর নিজের জন্য একটি অঙ্গীকারবদ্ধ ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার দৃঢ় সঙ্কল্প ছেড়ে দেয়া কখনোও উচিত হবে না। এ ধরনের নেতৃত্বের মাধ্যমেই উম্মাহ ওহীর শিক্ষা থেকে উপকৃত হতে পারে। চিন্তাধারার সংশোধনে সফল হলে আমরা যে সব মতবাদ, উপায়

www.pathagar.com

ও মাধ্যমের সাহায্যে ইসলামী সামাজিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা আছে তার কাছে পৌঁছাতে পারবো। তারপর সে ভিত্তি থেকে যোগ্য ও অঙ্গীকারবদ্ধ ইসলামী নেতৃত্ব উঠে আসবে। ইসলামী চিন্তাধারা এমন এক ভবিষ্যৎ দেখিয়েছিল যে তখন আল মাওয়ার্দী, ইবনে তাইমিয়া, আল ফারাবী ও ইবনে খলদুনের মত প্রতিভার জন্ম সম্ভব হয়েছিল। নতুন প্রতিভার আবির্ভাব ঘটানো প্রয়োজন যাতে উম্মাহ সভ্যতার ক্ষেত্রে পদ্ধতিবিজ্ঞানের বিকাশ সাধন করতে পারে এবং তাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে পারে।

ইসলামিকরণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

উম্মাহর জীবনের গোড়ার দিকে পশ্চিমের সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক চাপের ফলে শিক্ষিত মুসলমানরা দু'টি বিষয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছিল ঃ প্রথমত, সত্যের বস্তুগত বৈশিষ্ট্য ও বিশ্বজনীন আইন। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তি ও সমাজ এসব সত্য ও বিশ্বজনীন আইনকে ব্যবহার করে তাকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে নেয়। এভাবে শিক্ষিত মুসলমানরা পাশ্চাত্য ও বিজ্ঞানের সব কিছুকে বস্তুগত ও নিরপেক্ষ ধারণা করে গ্রহণ করে। তবে সত্য কথা এ যে, অন্যান্য জাতি ও সভ্যতার মত পাশ্চাত্য সভ্যতাও তার নিজের বিশ্বাস, মনস্তাত্ত্বিক উপাদান এবং ঐতিহাসিক উপাদান দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে। পাশ্চাত্য যখন আবিষ্কার করল যে, তাদের আসমানি কিতাবের উৎসগুলো বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়ে গেছে, তখন আসমানি কিতাবের উৎসগুলোর উপর অনাস্থার সৃষ্টি হলো এবং তা তাদের সভ্যতার উন্নয়ন ও বিকাশের ওপর প্রভাব বিস্তার করল। এভাবে মানবজাতির বস্তুগত প্রয়োজন এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল যে, ব্যক্তি ও তার প্রয়োজন এক ধরনের পবিত্রতা অর্জন করল। এ পথেই তার সব আধ্যাত্মিক বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল। এ কারণে দেখা যায় একদিকে পাশ্চাত্য সমাজে জনগণের বৈষয়িক কল্যাণ ও আরাম আয়েশের প্রচুর সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে, অন্যদিকে পাশ্চাত্য সমাজ মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা ও সামাজিক বিবাদ বিসম্বাদে জর্জরিত হয়ে পড়েছে যা সর্বক্ষণ সমাজকে অস্থিতিশীল রাখছে এবং তাকে ধ্বংসের হুমকি দিচ্ছে। সুতরাং মুসলমানদের জন্য উপলব্ধি করা খুবই প্রয়োজন যে, পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব কিছুই বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বস্তুগত নয়। সমাজ বিজ্ঞানের বিষয়গুলো কীভাবে উপলক্ষ্য সম্পর্কীয় তা উপলব্ধি করা কষ্টকর না হলে বিজ্ঞান বাস্তবিকই যে পৃথক ধরনের তা বুঝতে পারা কষ্টকর হওয়া উচিত নয়। কোন পার্থক্য থেকে থাকলে তা হবে শুধু মাত্রার। বাস্তবিক বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা বিশৃঙ্খলভাবে হয় না। অপরপক্ষে এগুলো মানবীয় লক্ষ্য ও আধ্যাত্মিক বিবেচনা প্রসূত। এগুলো পাশ্চাত্য ধাঁচের মনের সৃষ্টি ও নিজেদের লক্ষ্য অর্জনে সঙ্কল্পবদ্ধ। বিদেশী সভ্যতার সব বিজ্ঞানকে এ প্রেক্ষাপট থেকে দেখা প্রয়োজন।

বিজ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে সত্যিকারভাবে বলতে গেলে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া উপায় নেই। কারণ ইসলামী চিন্তাধারা প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয়, প্রাকৃতিক

www.pathagar.com

আইন, প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্পর্কিত অধ্যয়নে শুধু সীমিত যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অগ্রসর হয় না বরং এর সাথে ওহীর ব্যাপক ও বিশ্বনবীর জ্ঞানকে সমন্বিত করে অগ্রসর হয় যাতে জ্ঞান-বিজ্ঞান সত্যিকার রূপ নিয়ে উপস্থাপিত হয় এবং মানবজাতির পার্থিব ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন উভয়টাই পূরণ হয়।

সাধারণভাবে জ্ঞানের এবং বিশেষভাবে বিজ্ঞানের ইসলামিকরণ বলতে এটি বুঝার কোনো প্রয়োজন নেই যে, বিজ্ঞানের বস্তুগত ও পেশাদারী বিষয়গুলো পৃথক হবে। বরং এর তাৎপর্য হচ্ছে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রচেষ্টায় দিকনির্দেশনা প্রদান করা, যাতে এগুলো সত্যিকার অর্থে মানবজাতির সর্বোত্তম স্বার্থে পরিচালিত হয়। এভাবে ইসলামিকরণের অর্থ হলো সঠিক নির্দেশনা, সঠিক লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং সঠিক দর্শন। এভাবেই ইসলামী জ্ঞান প্রকৃতিগতভাবে সংস্কারমূলক, গঠনমূলক, নৈতিক, সঠিকভাবে পরিচালিত এবং তাওহীদী।

ইসলামিকরণের সামনে চ্যালেঞ্জ হলো যে, তাকে মানবজাতির কাছে এমন এক চিত্র তুলে ধরতে হবে যাতে পৃথিবীর সংস্কার ও গঠনমূলক হিফাজত বা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পরিপূর্ণ করার জন্য বিজ্ঞানকে মানবজাতি ও খেলাফতের সেবায় নিয়োগ করা যায়। এটি বাস্তবিকই বিস্ময়কর যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার ছায়াতলে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ অথবা দ্রুত ক্ষেপণযোগ্য ও অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন মারাত্মক মারণাস্ত্র উৎপাদন ছাড়া মানবজাতির জন্য মহত্তর বা বৃহত্তর কিছু নেই। (এ ধরনের ব্যবস্থাপনায় যাদের কাছে সর্বাধিক পরিমাণ মারণাস্ত্র, ক্ষমতা ও সম্পদ আছে সত্য সব সময় তাদের সাথেই থাকবে।) নিশ্চিতভাবেই বর্তমান পরিস্থিতি মানবজাতির ফিতরাতের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে। বস্তুত মানবজাতি বর্তমানে এমন এক সন্ধিক্ষণে পৌঁছেছে যেখানে তার ভবিষ্যতের জন্য খোদায়ী নির্দেশনা আগের তুলনায় আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেখানে ইসলামের সর্বাত্মক দর্শনের জরুরি প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এবং যেখানে গঠনমূলক ও সংস্কারধর্মী সভ্যতার প্রতিষ্ঠা অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে যাহোক, এটি জীবন্ত এক উদাহরণ।

www.pathagar.com

অধ্যায় ছয়

ইসলাম ও ভবিষ্যৎ

উম্মাহ ও মানবজাতি উভয়ের জন্য সংস্কার সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ–এ বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। সুতরাং তিনটি মৌলিক বিষয়ের প্রতি ইসলামী কর্মী ও নেতাদের মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা চালানো আবশ্যক।

১. উম্মাহর ভবিষ্যৎ অর্থাৎ মুসলিম যুব সমাজের মধ্যে কাজ করা।

২. ইসলামিকরণ এবং জ্ঞান ও স্বজন সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্ট করা এবং নতুন প্রজন্মকে ইসলামের চিরন্তন বাণী মানবজাতির কাছে পৌছিয়ে দেয়ার যোগ্য করে তৈরি করা।

৩. মানবজাতির অগ্রগতি ও চিন্তাধারাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ গতিপথের নির্দেশনা প্রদান করা।

উম্মাহর চরিত্রের ভবিষ্যৎ

এটি স্পষ্ট যে, উম্মাহর বর্তমান চিন্তাধারার সংস্কারের প্রয়োজন আছে। এটিও স্পষ্ট যে, উম্মাহর বর্তমানের মনস্তাত্ত্বিক গঠনও ত্রুটিপূর্ণ। এমনকি উম্মাহ্ এবং পুরো প্রজন্মও নতুন তথ্য ও ভাবধারা গ্রহণে সক্ষম হলে তা হবে কৃত্রিম এবং সত্যিকার চরিত্র গঠনের প্রক্রিয়া থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন। রাসূল (সা) বলেছেন, জাহিলিয়াতে যারা তোমাদের মধ্যে ছিল সেরা, ইসলামেও তোমরা হবে শ্রেষ্ঠ, যতদিন তোমরা ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে। এ কারণেই মরুভূমির মুক্ত স্বাধীন ও সাহসী আরবরা ইসলাম গ্রহণের পর এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বেশি কিছু অর্জন করতে পেরেছিল।

বর্তমান মুসলিম প্রজন্মের ভূমিকা হবে প্রথমে বর্তমান পরিবেশের প্রকৃতি বা মেজাজকে বোঝা, সম্ভাব্য কর্মকান্ড, প্রাপ্তি, সাধ্য ও কর্মদক্ষতার সীমা নিরূপণ করা এবং কার্যকর ও সময়োপযোগী চিন্তাধারার প্রস্তাব করা। এটি করার জন্য প্রথমে ছোটদের জন্য আদর্শ স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যাতে তারা এসব স্কুলে শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে দৃঢ় চরিত্র গঠন করতে পারে এবং ইসলামের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ইসলামের অনুশাসন সম্পর্কে অবিচল বিশ্বাস অর্জন করতে পারে। উম্মাহর ভবিষ্যতের জন্য বর্তমানে আমরা কি কাজ করলাম (Investment for future) এবং সামগ্রিকভাবে সভ্যতার জন্য দায়িত্ব পালনে যুব সমাজ আবেগ ও মননের দিক থেকে কোন ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে তার উপর উম্মাহর

www.pathagar.com

মধ্যে পরিবর্তন সৃষ্টির যে কোন আশা নির্ভর করবে। আজকের প্রজন্ম তার কর্তব্য পালন করলে পরবর্তী প্রজন্মকে ভবিষ্যতের জন্য তৈরি করলে, তার দায়িত্ব সাফল্যের সঙ্গে পালন করা হয়েছে বলা যাবে। অপরদিকে সে যদি ধারণা করে যে এ কাজ স্বীয় চেষ্টায় করতে পারবে, তাহলে সে আসল বিষয় হারিয়ে ফেলবে এবং তার শক্তি ক্ষয় করবে।

বর্তমান প্রজন্ম যে ভূমিকা পালন করবে তার গুরুত্ব হচ্ছে ভবিষ্যত প্রজন্মের সঠিক প্রস্তুতির জন্য সুষ্ঠু দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করা এবং পর্যাপ্ত উপায় বা মাধ্যম তৈরি করা। একবার এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারলে তখন তিনটি প্রধান কাজের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়াবে।

১. গঠনমূলক কাজের জন্য শক্তি ও সম্পদ প্রদান করা এবং তা যাতে নিঃশেষ না হয়ে যায় সে দিকে লক্ষ্য রাখা।

২. ইসলামী পরিপ্রেক্ষিত থেকে সুষ্ঠু ভাবধারা সৃষ্টি করা।

৩. ইসলামী স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদানের জন্য সম্পদ নিয়োজিত করা যাতে তা যুবকদের বেড়ে ওঠার জন্য ব্যবহার করা যায়।

মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও নেতাদের জন্য এটার মানে হবে সুষ্ঠু ও নিখাদ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি প্রণয়নের মাধ্যমে ইসলামী চিন্তাধারার নবায়ন এবং তা হবে বর্তমান প্রজন্মের প্রথম অগ্রাধিকার বিষয়।

এ প্রারম্ভিক পর্যায়ে উম্মাহর ভবিষ্যৎ নির্মাণের কাজ শিক্ষা ও মননের ক্ষেত্রে শুরু করতে হবে। কারণ এ দু'টি ক্ষেত্র থেকেই সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সৃষ্টি হবে। সুতরাং বর্তমান পরিস্থিতিতে উম্মাহর উচিত হবে রাজনৈতিক ও সামরিক সংগঠনের জন্য ব্যয় করা। তাকে ততটুকুই ব্যয় করা উচিত যতটুকু তার নির্মাণ ও সংস্কারের অগ্রগতি নিশ্চিত করতে পারে। বর্তমান সময়ে উম্মাহর নেতৃত্বের দায়িত্ব হচ্ছে অভিভাবক ও শিক্ষকদের কাছে মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের অর্থ, উম্মাহর কাছে এর গুরুত্ব এবং মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা। এটি করা হলে ভবিষ্যৎ বংশধরেরা কখনো অতীতের মতো পশ্চাৎপদতা ও ধ্বংসের শিকার হবে না। আগামী প্রজন্মের মনস্তাত্ত্বিক ও মননের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন আসছে, সুস্পষ্টভাবে তারই উপর উম্মাহর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। আমাদের যুব সমাজকে তাদের দায়িত্ব বহনের উপযোগী করে তোলার জন্য আমরা যত বেশি প্রচেষ্টা চালাবো ততো বেশি আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জনের কাছাকাছি পৌঁছতে পারবো। উম্মাহর চিন্তাবিদ ও পণ্ডিতদের দায়িত্ব হচ্ছে উম্মাহর চিন্তাধারার সংস্কারে, তার দৃষ্টিকে স্বচ্ছকরণে তাদের শক্তি ব্যয় করা এবং এসব কিছুকে এমনভাবে উম্মাহর কাছে উপস্থাপন করা, যাতে তার প্রতিষ্ঠানগুলো এর থেকে উপকৃত হতে পারে।

www.pathagar.com

উম্মাহর চিন্তাবিদ ও পণ্ডিতদের দায়িত্ব হচ্ছে অভিভাবক ও শিক্ষকদের নিকট উম্মাহর মানসিক বিকাশের (Psychological development) জন্য এর গুরুত্ব এবং কি কি উপাদানের (elements) মাধ্যমে তা অর্জিত হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করা। একমাত্র তখনই উম্মাহ নতুন পথে অভিযাত্রা শুরু করতে পারবে এবং সে ধরনের চিন্তাধারা সৃষ্টিতে সক্ষম হবে যা তাকে উন্নততর ভবিষ্যত পানে পরিচালিত করবে।

উম্মাহর চিন্তাবিদ ও পণ্ডিতদের দায়িত্ব হচ্ছে ইসলামী চিন্তাধারার ভিত্তি পর্যালোচনা করা, এর অপরিহার্য বা মৌলিক উপাদানগুলোর মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় সম্পর্ক এবং সমাজের জন্য নতুন ভাবধারা সৃষ্টিতে এসব কী ভূমিকা পালন করবে তাও পর্যালোচনা করা।

উম্মাহর চিন্তাবিদ ও পণ্ডিতদের দায়িত্ব হচ্ছে ইসলামী চিন্তাধারার কাছে তার মৌলিকতা, অখন্ডত্ব ও ব্যাপকতা ফিরিয়ে দেয়া। একমাত্র এ পথেই অতীতের বিচ্যুতি এড়িয়ে যাওয়া যাবে। শুধুমাত্র এটি করা গেলেই উম্মাহর চিন্তাধারা মরীচিকা থেকে বেশি কিছু হবে। উম্মাহর চিন্তাবিদ ও পণ্ডিতদের দায়িত্ব হচ্ছে ইসলামী চিন্তাধারার উসূল ও পদ্ধতিবিজ্ঞান অধ্যয়ন করা, যাতে শুধু ওহীর মূল পাঠের সেবায় নয় বরং জীবন ও সমাজের বিজ্ঞানের সেবায় অনন্য ইসলামী শৃঙ্খলা গড়ে তোলা যায়। ইসলামী চিন্তাধারা সুনিশ্চিতভাবেই শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসন, যোগাযোগ এবং বিজ্ঞান ও তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের দর্শনের ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রাখার যোগ্যতা রাখে। উম্মাহর চিন্তাবিদ ও পণ্ডিতদের এটিও মেনে নেয়া প্রয়োজন যে, উম্মাহকে অগ্রগতির পথে ফিরে আনার দায়িত্ব শুধু তাদেরই। অন্যেরা শুধু তাদের দৃষ্টি ও পরামর্শ অনুসরণ করে চলবে। এভাবে চিন্তাধারা উপস্থাপনে তাদের সাফল্য অন্যদের চিন্তাধারাকে ফলপ্রসূ করে তুলবে।

উম্মাহর জীবনের বর্তমান সংকটময় সময়ে তাদের আর একটি দায়িত্ব হচ্ছে যারা ইসলামের অনুগত বলে দাবি করে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা। এটি তখনই ঘটবে যখন শিক্ষা প্রক্রিয়ার প্রাথমিক স্তর থেকে চরিত্র গঠন পদ্ধতিকে ব্যবহার করা হবে। বাস্তবিকই যুবকরা আমাদের ভবিষ্যৎ, আমাদের শক্তি। আগামীকালের জন্য উম্মাহর যে মানুষ প্রয়োজন এখন তা তৈরি শুরু করতে হবে। এ কাজ করতে গিয়ে শিশুদের লালন পালনে পিতামাতার ভূমিকা কি হবে তা উম্মাহর শিক্ষকদের বিবেচনা করা প্রয়োজন। বাস্তবিকই শিশুদের কীভাবে বা কী উপায়ে বড় করে তুলতে হবে এ ব্যাপারে পিতামাতার যে প্রত্যয় রয়েছে তার সাথে কোন কিছুই তুলনীয় নয়। মূল্যবোধের বিকাশ ও চরিত্র গঠন বহুল পরিমাণে শিশুর সঙ্গে মাতাপিতার সম্পর্কের উপর নির্ভর করে। স্কুল বা সমাজের যে প্রচেষ্টায় মাতাপিতার অনুমোদন নেই তা নিশ্চিতভাবে ব্যর্থ হতে বাধ্য।

শিশুদের শিক্ষা ও তাদের লালন পালনের বিষয়টি মাতাপিতার দৃষ্টিতে নিয়ে আসার যোগ্যতার ওপর চিন্তাবিদ ও শিক্ষকদের সাফল্যের যে কোনো সম্ভাবনা নির্ভর করবে। যখন তা ঘটবে তখন মাতাপিতা ও আপন ঘর উভয়ই কাঙ্ক্ষিত ফল লাভে তাদের ভূমিকা

www.pathagar.com

পালন করবে। তারপর এ মৌলিক পথ ধরেই উম্মাহ তার সংস্কার ও উন্নয়নের পথে কোন প্রতিষ্ঠান বা সমাজ ব্যবস্থার পক্ষ থেকে যে সব বাধা বিঘ্ন আসবে তা অতিক্রম করতে সক্ষম হবে।

ইসলামিকরণ ও একাডেমিক প্রতিষ্ঠানসমূহ

ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের আলোচনা পূর্ণাঙ্গ হবে না, যদি আমরা ইসলামিকরণের লক্ষ্য অর্জনে এবং একটি তথ্যসমৃদ্ধ ইসলামী প্রেক্ষাপট প্রণয়নে ইসলামী একাডেমিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকার কথা উল্লেখ না করি। এটি সুস্পষ্ট যে, উম্মাহর সংকট হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত ও পরিপূর্ণ সামাজিক কাঠামোর অভ্যন্তরে ইসলামী মূল্যবোধ ও মতবাদকে সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা। এটি স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, উম্মাহ যে অর্থেই পানিতে পড়ে গেছে, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে উম্মাহর প্রচেষ্টা ও ত্যাগ তাকে সেখান থেকে টেনে তোলার ব্যাপারে কোনো সাহায্য করতে পারবে না। বরং মুসলিমদের সাথে উন্নত দেশগুলোর ব্যবধান অব্যাহতভাবে বেড়েই চলেছে। জ্ঞানের সূত্র-এর অসাধারণ পদ্ধতিবিজ্ঞান উম্মাহর দেহের অংশে পরিণত না হলে এবং বিশেষভাবে তা সব মুসলমানের শিক্ষায় বদ্ধমূল করা না হলে ইসলামের উন্নত সভ্যতার ভাবধারা এবং তার অগ্রসর সামাজিক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন কখনো সম্ভব হবে না। এভাবে পরিবার ও গৃহের পরিবেশ ছাড়াও উম্মাহর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো হবে পরিবর্তনের প্রধান এলাকা। এটি সত্য যে, সমাজে পরিবর্তনের হাতিয়ার বা সহায়ক হবার মিশনে এসব প্রতিষ্ঠানকে সফল হতে হলে তাদের পশ্চিমা প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্ধ অনুকরণ অবশ্যই ছাড়তে হবে। ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এমন হবে না যে, তাদের সেরা ছাত্রদের যোগ্যতা অর্জন, প্রশিক্ষণ গ্রহণ অথবা দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সব সময় পাঠাতেই হবে। এর পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই একটি মননশীল পরিবেশ সৃষ্টির ওপর তাদের কাজকর্ম কেন্দ্রীভূত করতে হবে, যে পরিবেশ সত্যিকারের অনুসন্ধিৎসু মন, মৌলিক চিন্তাধারা এবং সৃজনশীলতার বিকাশকে উৎসাহিত ও নিশ্চিত করবে।

সুতরাং এটি অবশ্যই প্রয়োজনীয় যে, ইসলামী বিশ্বের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের গুরুত্ব অনুধাবন করবে এবং নিজেদেরকে উম্মাহ, তার সম্পদ, ধর্ম, চিন্তাধারা এবং লক্ষ্যের উৎস বিবেচনা করে তাদের মানসিকতা পাল্টাবে। এরপর তাদের এমন কর্মসূচি দিতে হবে যা উম্মাহর সম্পদকে সবচেয়ে কল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত করবে। এ পথেই তারা তাদের সামনের বাস্তব চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে এবং ইসলামী উম্মাহর সত্যিকার প্রয়োজন পূরণ করতে পারবে।

আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কেবল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আক্ষরিক অনুবাদের চেয়ে আর বেশি কিছু পেশ করতে পারবে না, এটা আর মেনে নেয়া যায় না। মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা অপরের চিন্তাধারা ও প্রচেষ্টাকে পুনরায় অবিকল পেশ করবে বা

www.pathagar.com

তাদের মত করে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপন করবে এবং এতে সন্তুষ্ট থাকবে, তাও আর গ্রহণযোগ্য নয়। মুসলিম বিশ্বের শিক্ষায়তনগুলোকে ইসলামের অপরিহার্য বিষয়গুলো, তার বিশ্বজনীন সত্য, প্রত্যয় ও উদ্দেশ্যকে সূচনা বিন্দু হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এটি অর্জন করার জন্য এমন সব একাডেমিক কেন্দ্র, ইউনিট ও সমিতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে যেগুলো জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় ইসলামী প্রতিষ্ঠানিক পদ্ধতিবিজ্ঞান প্রণয়ন ও গড়ে তোলার জন্য প্রচেষ্টা চালাবে। জ্ঞানের ইসলামীকরণের কাজে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় লাগসই পদ্ধতিবিজ্ঞান সৃষ্টি এবং প্রত্যেকটির জন্য সাধারণ নির্দেশনা তৈরি করা প্রয়োজন। এসব বুনিয়াদ ইসলামের অনুকূল গবেষণা ও ইজতিহাদের কাঠামো হয়ে দাঁড়াতে পারে। এ গবেষণা ও ইজতিহাদের লক্ষ্য হচ্ছে মুসলমানদের নতুন প্রজন্মের লালন পালন ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেয়া। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ইসলামীকরণ প্রচেষ্টার সাফল্য সুনিশ্চিত করতে হলে গবেষক, পণ্ডিত, শিক্ষক ও ছাত্রদের কর্মশক্তিকে নতুন ইসলামী বুদ্ধিবৃত্তিক রূপরেখা প্রণীত করে তা স্পষ্ট ও বোধগম্য করতে হবে এবং একটি নতুন মানসিকতা সৃষ্টি করতে হবে। তারপরই ইসলাম ও অন্যান্য জাতির একাডেমিক উত্তরাধিকারের শ্রেণী বিভাজন সম্ভব হবে। এ ধরনের প্রচেষ্টাই হচ্ছে প্রয়োজনীয় একাডেমিক যোগ্যতা ও পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য একমাত্র পথ।

ইসলামী বিশ্বের অভ্যন্তরে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী সমাজবিদ্যার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত একাডেমিক বিভাগ খোলা। যেমন, ইসলামী অর্থনীতি বিভাগ, ইসলামী সভ্যতা এবং গবেষণা কেন্দ্র, ইসলামী চিন্তাধারা ও ইসলামী অর্থনীতি কেন্দ্র এবং ইসলামী সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষাদান, ইসলামী আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, ইসলামী রাজনৈতিক চিন্তাধারা, ইসলামী রাজনৈতিক পদ্ধতি, ইসলামী বিশ্বের রাজনৈতিক উন্নয়ন ইত্যাদির জন্য সঠিক ও ইতিবাচক পদক্ষেপ এবং সম্ভাব্য সকল উপায়ে এসব কিছুকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

নতুন ইসলামী সমাজ বিদ্যা বিষয়ে যেসব জরুরি সমস্যা দেখা দিয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে কঠিন সমস্যা হলো সম্পদের স্বল্পতা। কোনো কেন্দ্র, ইউনিট অথবা বিভাগের দিকে তাকালে বুঝা যায় যে, তার সম্পদ সীমিত এবং যোগ্যতা সম্পন্ন জনশক্তির অভাব প্রকট।

এ পর্যায়ে যোগ্য বিশেষজ্ঞবৃন্দ এবং তাদের মিশন পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা বা আর্থিক সমর্থনের ব্যবস্থা না করে শুধু একটি কেন্দ্র খোলা অথবা একটি শিক্ষা দান প্রতিষ্ঠান চালু করা বা একটি নতুন বিষয় শিক্ষা দেয়া মোটেই যথেষ্ট নয়। যোগ্য ব্যক্তিদের ইসলামী বিষয় বা সমাজবিদ্যা শিক্ষা দানের দায়িত্ব প্রদান করে আবার একই সাথে প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর যোগান না দিয়ে তাদের উপর প্রশাসনিক দায়িত্বের বোঝা চাপানোর রীতি বা অভ্যাস কোনোভাবেই অব্যাহত রাখা যাবে

www.pathagar.com

না। বিশেষ করে ইসলামিকরণ প্রক্রিয়ার বর্তমান নাজুক পর্যায়ে এ ধরনের পণ্ডিতদের এখন সময় দেয়া প্রয়োজন যাতে তারা তাদের নির্দিষ্ট বাছাইকৃত বিষয়সমূহে গবেষণা চালাতে পারে। কাজেই তাদের উপর এ ধরনের ভার চাপানোর ফলে তারা উৎসাহিত হওয়ার পরিবর্তে তাদের অগ্রগতি থমকে দাঁড়াবে। জ্ঞান ও শিক্ষার ইসলামিকরণের আন্দোলনের সাফল্য লাভের পথ হলো অব্যাহত অধ্যবসায়ী প্রচেষ্টা। সংবাদ ও প্রচার মাধ্যমে ঘোষণা দেয়ার তুলনায় বিষয়টি অনেক বেশি জটিল।

জ্ঞানের ইসলামিকরণের উদ্দেশ্যে ইসলামী শিক্ষা ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো হাতে নিতে হবে ঃ

১. ওহীর মূল পাঠ কুরআন ও সুন্নাহর শ্রেণীবিভাজন ও সূচিভুক্তকরণ, কুরআন ও সুন্নাহর উপলব্ধি ও উদ্দেশ্যগুলোকে গবেষক ও ছাত্রদের জন্য সহজ করে তোলা, মূল পাঠ সহজেই উপলব্ধি করার ক্ষমতা অর্জন এবং এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাকে সহজ করে দেয়া।

২. বুদ্ধিবৃত্তিক উত্তরাধিকারের বিশেষ জ্ঞানকোষ সম্পর্কীয় মূল বিষয়গুলোর সম্পাদনা। এগুলোর শ্রেণী বিভাজন ও সূচিভুক্তকরণ যাতে গবেষকদের জন্য মূল বিষয়গুলোর উপলব্ধি সহজতর করে তোলা যায়। মুসলিম ছাত্রদের ইসলামের সুসংহত ও সংযত উত্তরাধিকারের সাথে পরিচিত করার প্রক্রিয়া এবং তাদের মধ্যে অভিন্নতা ও সাংস্কৃতিক অখন্ড তাবোধ ধীরে ধীরে সঞ্চারিত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি সম্পন্ন করা না হলে ইসলামী চিন্তাধারার সংশোধনের প্রতিটি প্রচেষ্টা শুধু সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছু হবে না।

৩. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে এমন যোগ্য লোক নিয়োগ করা প্রয়োজন যারা সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার সাথে সাথে ইসলামী বুদ্ধিবৃত্তিক উত্তরাধিকার সম্বন্ধেও সুষ্ঠু জ্ঞানে সমৃদ্ধ হবে। অধ্যয়ন ও গবেষণার সাহায্যে তাদের উচিত কাঙ্ক্ষিত দর্শন ও পদ্ধতি-বিজ্ঞানকে সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরা। শুরুতে বিশেষ গবেষণা কেন্দ্র এবং গ্রাজুয়েট বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। তারপর গ্রাজুয়েট ছাত্রবৃন্দ এবং গবেষকগণ ক্রমান্বয়ে পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যবই তৈরির জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে পারবে। তাদের তৈরি পাঠ্যবই বর্তমানে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি স্তরে স্থলাভিষিক্ত হবে। অযোগ্যতা ও ব্যর্থতার কারণেই অনুপযোগী পাঠ্যবই ছাপানো এবং ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হচ্ছে। এর দ্বারা বোঝা যায় দায়িত্ব এড়ানোর জন্য চেষ্টা চলছে। অথচ দায়িত্ব পালন করলে তা সাফল্যের পথে নিয়ে যেত। এভাবে চলতে থাকলে আরো হতাশা পড়বে।

৪. ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য প্রয়োজনী নেতৃবৃন্দ, শিক্ষিত মুসলমান ও প্রতিষ্ঠানের জন্য ইসলামিকরণ বিষয়ে সেমিনার, সম্মেলন ও বক্তৃতামালার আয়োজন।

www.pathagar.com

এছাড়া নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণভাবে শিক্ষিত মুসলমানদের জন্য প্রতিষ্ঠানের দ্বার উন্মুক্ত করে দিতে হবে। এসব প্রতিষ্ঠানের জন্য আরো প্রয়োজন একাডেমিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামিকরণ বিষয়ে একাডেমির পক্ষ থেকে পত্রপত্রিকা প্রকাশ করে বিষয়টিকে উৎসাহিত করা। এখন সময় এসেছে ইসলামকিরণকে অন্তঃসারশূন্য সাময়িক প্রচলিত প্রথা থেকে একটি সুসংগঠিত এবং বিশ্বব্যাপী আন্দোলনে রূপ দেয়।

৫. ইসলামী একাডেমিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে এখন অবশ্যই গ্রাজুয়েশন পর্যায়ে গবেষণা ও কর্মসূচিকে ইসলামিকরণের কাজ করতে হবে। এ পথেই তারা আগামী প্রজন্মের জন্য প্রয়োজনীয় একাডেমিক জনশক্তি সৃষ্টিতে সক্ষম হবে।যে সব লোকের মন ও দৃষ্টিভঙ্গি সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে তাদের প্রত্যাবর্তনের জন্য আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আর মোটেই অপেক্ষা করা উচিত নয়।

এভাবে আমাদেরকে সংগঠিত পরিকল্পনা ও অধ্যবসায়ী কর্মের মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন যে, উম্মাহর প্রতি আমরা আমাদের দায়িত্ব পূরণ করছি। এ পথেই আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর পক্ষ থেকে তওফীক লাভের যোগ্য হবো।

মানবজাতির ভবিষ্যৎ পথ

ইসলামী উম্মাহর ভবিষ্যৎ যদি তার পদ্ধতিবিজ্ঞান, চিন্তাধারা ও শিক্ষা সংগঠনে এবং নতুন ইসলামী সমাজবিজ্ঞান বিষয়সমূহের বুনিয়াদ রচনার ক্ষেত্রে সংস্কার প্রচেষ্টায় অর্জিত সাফল্যের মাত্রার উপর নির্ভরশীল হয় তাহলে বিভ্রান্ত ও হুমকিপ্রাপ্ত মানবজাতির ভবিষ্যৎ ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের জীবন্ত উদাহরণ পেশ করার ক্ষেত্রে মুসলমানদের যথার্থ তা নিরূপিত হতে পারে। ইসলাম মানবজাতিকে বেঁচে থাকার জন্য যুক্তি ও কারণ উপহার দিয়েছে এবং মানবজাতি কীভাবে জীবনযাপন করবে সে জন্য নৈতিক নিয়মাবলী দিয়েছে। ইসলাম মানবজাতিকে তার ফিতরাত সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছে এবং দৃশ্য ও অদৃশ্যের সঙ্গে ব্যক্তি, সমাজ এবং সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে বিশ্বজনীন সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি মাত্রা দিয়েছে। ইসলাম মানবজাতিকে একটি স্থিতিশীল সমাজ, অগ্রগতি, নিরাপত্তা এবং বিশ্ব শান্তির জন্য ভিত্তি দিয়েছে।

ইসলাম পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করে। ইনসাফ, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দায়িত্ব, বিশ্বাস ও চিন্তার স্বাধীনতা, শূরা এবং উৎপত্তির দিক থেকে সমগ্র মানবজাতির ঐক্য, স্বার্থ ও ভাগ্যের নীতিসমূহ সমুন্নত রাখে। এ পূর্ণাঙ্গ ইসলামী দৃষ্টিই আধুনিক বস্তুবাদী সমাজের অকল্যাণ এবং এদের থেকে উদ্ভূত হুমকি দূর করতে সক্ষম আধুনিক সমাজের নৈতিক দেউলিয়াপনা এখন কারো কাছে গোপন নয়। বস্তুবাদের ছায়ায় বিশ্ব এখন উত্তর-দক্ষিণ, সাদা-কালো, ধনী-দরিদ্র, মাত্রাতিরিক্ত ভোজনকারী ও কম ভোজনকারী, উপনিবেশ স্থাপনকারী এবং ঔপনিবেশিক শাসনে শাসিত, প্রভু ও ভৃত্যে বিভক্ত। আজকের মানুষের কাছে শান্তির অর্থ আধিপত্য বিস্তারের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত একজাতি বা অন্যজাতি,

www.pathagar.com

একশ্রেণী বা অপর শ্রেণী, এক শিবির বা অপর শিবিরের পক্ষ থেকে গণবিধ্বংসী বাহিনীকে হামলার জন্য ছেড়ে দেয়ার আতঙ্ককে দমন করা ছাড়া কিছু নয়। উন্নত দেশগুলোর সমাজে বিরাজিত মারাত্মক ত্রুটির কারণে তাদের কাছে বর্তমান সময়ে ইসলামের প্রয়োজন আগের যে কোন সময়ের চেয়ে অনেক বেশি। কারণ ইসলামে এমন সব নীতি ও ধারণা রয়েছে যা উন্নত দেশের ত্রুটিগুলো সংশোধন করতে সক্ষম। এসব নীতি ও ধারণা সংক্ষেপে দু'টি ভাগে প্রকাশ করা যায়।

ইসলামী ঐক্যের সমাজ

ইসলামী সমাজ ঐক্যের ভিত্তি ও ভ্রাতৃত্বের ধারণার উপর দাঁড়িয়ে আছে। এ কারণে এ সমাজের তৎপরতা ব্যক্তির মৌলিক প্রয়োজন পূরণের উপর কেন্দ্রীভূত থাকে এবং পরিবার, প্রতিবেশী, জাতি এবং সাধারণভাবে মানবজাতির সঙ্গে ব্যক্তির যে অভিন্ন স্বার্থ থাকে তা পূরণের উপরও ইসলামী সমাজের কর্মসূচি ব্যস্ত থাকে। সমসাময়িক বিশ্বের বস্তুবাদী শক্তিগুলোর সংঘর্ষের দর্শন হলো আগামী কালের দর্শন।

আল্লাহ এরশাদ করেন ঃ

হে মানুষ, তোমাদের রবকে ভয় করো যিনি তোমাদের একটি জীবন থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তার থেকে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন এবং তারপর তাদের থেকে অসংখ্য পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করেছেন। (৪ : ১)

হে মানুষ, আমরাই তোমাদেরকে পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও ভ্রাতৃগোষ্ঠী বানিয়েছি যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পারো। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত সে যে আল্লাহকে বেশি ভয় করে। (৪:১৩)

তার নিদর্শনসমূহের মর্মে রয়েছে আকাশসমূহ ও জমিনের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের ভিন্নতা ও পার্থক্য। (৩০ : ২২)

প্রথমে মানব সমাজ একই উম্মতভুক্ত ছিল, পরে তারা বিভিন্ন ধরনের মত ও পথ রচনা করে নিল। (১০ : ১৯)

পিতামাতার সাথে ভাল ব্যবহার কর, নিকটাত্মীয় ইয়াতীম ও মিসকিন, আত্মীয় প্রতিবেশী ও অনাত্মীয় প্রতিবেশী পাশাপাশি চলার সাথী ও পথিকের প্রতি। (৪ : ৩৬)

এ কারণে আমরা বনি ইসরাইলের প্রতি ও ফরমান লিখে দিয়েছিলাম, যদি কেহ কোনো খুনের পরিবর্তে কিংবা জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া অন্য কোনো কারণে কাউকে হত্যা করে সে যেন সব মানুষকে হত্যা করল। (৫ : ৩২)

পারস্পরিক কাজকর্মে সহানুভূতি দেখাতে কখনো ভুল করো না। (২ : ২৩৭)

লোকদের সাথে সদালাপ করবে। (২ : ৮৩)

www.pathagar.com

আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না সেসব লোকদের সাথে কল্যাণময় ও সুবিচারপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেয়নি। (৬০ : ৮)

আর তোমরা যদি প্রতিশোধ গ্রহণ কর তাহলে শুধু ততটুকু প্রতিশোধ নেবে যতখানি তোমার উপর অত্যাচার করা হয়েছে। কিন্তু তোমরা যদি ধৈর্যধারণ করো, তাহলে নিঃসন্দেহে ধৈর্যধারণকারীদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। (১৬ : ১২৬)

তোমরা আল্লাহর পথে তাদের সাথে লড়াই কর যারা তোমাদের সাথে লড়াই করে। কিন্তু সে ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন করো না। (২ : ১৯০)

তারপর তারা বিরত হয়, তবে এ কথা জেনে রাখো কেবল যালেমদের ছাড়া কারো উপর হস্ত প্রসারিত করা সংগত নয়। (২ : ১৯৩)

কোনো বিশেষ দলের শত্রুতা তোমাদের যেন এতদূর উত্তেজিত না করে দেয় যে, তার ফলে ইনসাফ ত্যাগ করে বসবে। ন্যায়বিচার কর, বস্তুত, তাকওয়ার সাথে এর গভীর সামঞ্জস্য রয়েছে। (৫ : ৮)

আর যখন কথা বল, ইনসাফের কথা বল, ব্যাপারটি নিজের আত্মীয়েরই হোক না কেন। (৬ : ১৫২)

আর লোকদের মধ্যে যখন (কোন বিষয়ে) ফয়সালা করবে তখন তা ইনসাফের সাথে করো। (৪ : ৫৮)

যেসব কাজ পূর্ণ ও আল্লাহ তাকওয়ামূলক তাতে সকলের সাথে সহযোগিতা কর আর যা গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনের কাজ তাতে একবিন্দু সাহায্য ও সহযোগিতা করো না। (৫ : ২)

আর যদি ঈমানদার লোকদের মধ্য থেকে দু'টি দল পরস্পরের লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে তা হলে তাদের মধ্যে সন্ধি করে দাও, পরে যদি তাদের মধ্য হতে একটি দল অন্য দলের প্রতি বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘনমূলক আচরণ করে তা হলে সীমা লঙ্ঘনকারী দলটির সাথে লড়াই কর, যতক্ষণ না সে দলটি আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসবে, অতঃপর সে যদি ফিরে আসে তা হলে তাদের মাঝে সুবিচার সহকারে সন্ধি করে দাও। আর ইনসাফ কর। আল্লাহ তো ইনসাফকারী লোকদের পছন্দ করেন। নিশ্চয়ই মুমিনরা তো পরস্পরের ভাই। অতএব, তোমাদের, ভাইদের পারস্পরিক সম্পর্ক যথাযথভাবে পুনর্গঠিত করে দাও। আর আল্লাহকে ভয় করো। খুবই আশা করা যায় তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হবে। (৪৯ : ৯-১০)

ইসলামে জ্ঞান চর্চা

এ বিষয়টি জ্ঞানের এবং যে উপায়ে একাডেমিক গবেষণা চালানো হয় তার সাথে সম্পর্কিত। বস্তুবাদী চিন্তাধারা মৌলিকভাবে যুক্তিভিত্তিক, পরীক্ষামূলক এবং আরোহী

www.pathagar.com

পদ্ধতির ভিত্তিতে রচিত যা বাস্তব জগতের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান থেকে উদ্ভূত এবং এ থেকেই জীবন ও জগতকে নিয়ন্ত্রণকারী আইনসমূহের তত্ত্ব (Theory) বের করা হয়। এ চিন্তাধারার সাথে ওহীর কোনো সম্পর্ক নেই। এর প্রধান কারণ হচ্ছে যে, কোনো একটা প্রধান ধর্ম সম্পর্কে পশ্চিমা জগতের আস্থার অভাব। এ অবস্থা তখনই সৃষ্টি হলো যখন এটা সাধারণভাবে জানাজানি হয়ে গেল যে খ্রিস্ট ধর্মের মূল গ্রন্থ (Text) বিকৃত হয়ে গেছে এবং এতে রয়েছে অনেক অযৌক্তিক, পরস্পরবিরোধী ও অবিশ্বাস্য বিষয়।

মানুষের সামাজিক স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য বিস্ময়কর এক জটিলতা। কোনো এক সময়ে যেসব উপাদান সমষ্টিগতভাবে মানুষের আচরণকে প্রভাবান্বিত করে আর তা যখন আমরা বুঝতে পারি, তখন স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারি কীভাবে সমাজ বিজ্ঞানের বিষয়গুলো এবং মতবাদের অব্যাহত অগ্রগতি সুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

যেহেতু এসব ক্ষেত্রে যেসব ভুল করা হয়েছে তার পরিণতি স্বল্প মেয়াদে নির্ণয় করা সম্ভব নয় এবং একবার চালু হবার পর সংশোধন করা প্রায়ই অসম্ভব, সে ক্ষেত্রে আমরা ইসলামী জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য সূচক উপাদানগুলো আরো ভালোভাবে অনুধাবন করতে কালক্ষেপণ করবো না। ইসলামী জ্ঞান ফিতরাহ এবং বিশ্বের প্রাকৃতিক আইন সম্পর্কে যুক্তিবাদী ও বস্তুবাদী জ্ঞান ঐকমত্য পোষণ করে। শুধু জ্ঞান অর্জনের কাজে থেমে না থেকে ইসলামী জ্ঞান অর্জিত জ্ঞানকে সংস্কৃতি ও পরিমার্জিত করার পথে এগিয়ে চলে এবং অর্জিত জ্ঞানের ত্রুটি বিচ্যুতির ফলে যাতে সমাজে কোনো নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি না হয় সেদিকে প্রচেষ্টা চালায়। এভাবে মুসলমানেরা খোদায়ী ওহীর মাধ্যমে প্রকাশিত সব দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রত্যয় এবং সামাজিক আচরণের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে নিজেদের করণীয় কি হবে তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। এ কারণে কোনো মুসলমান যদি এ বিষয়ে কোনো ভুল ধারণা পোষণ করতে শুরু করে তখন ওহী তার ভুল ধরিয়ে দিয়ে তার ধারণা পাল্টে দেবে। সুতরাং ইসলামী জ্ঞান একই সাথে অভিজ্ঞতালব্ধ ও আরোহী পদ্ধতিতে অর্জিত জ্ঞানকে ওহীর উৎসের সঙ্গে উপস্থাপন করে যাতে মুসলমানরা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী কাজকর্ম ও লেনদেন চালাতে পারে, অবশ্য যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের কাজকর্ম, লেনদেন সমাজের ওপর কোনো প্রভাব না ফেলে। এভাবে মুসলমানরা বিশেষ পরিস্থিতি অনুযায়ী জীবিকা অর্জন করতে পারে এবং তাদের পারিবারিক বিষয়াদি সুসম্পন্ন করতে পারে। সুতরাং ইসলামের শিক্ষাকে জিঞ্জির বা শৃঙ্খল হিসেবে নয় বরং জীবনের যাত্রাপথে আলোক সংকেত ও পথ নির্দেশনা হিসাবে বিবেচনা করতে হবে।

ঐক্যের সমাজ এবং এর জ্ঞানের উন্নয়ন– এ দু'টি বিষয় মুসলমানরা উত্তমরূপে বুঝতে পারলে তা আগামীকালের বিশ্বের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে। ভবিষ্যতে মানব সমাজ আজ যা ভুল করেছে আগামীকাল তার জন্য আর ক্ষতিপূরণ করতে পারবে না। ইসলামের ইতিহাসের সিদ্ধান্তকারী (Decisive) যুদ্ধগুলোতে নিহতের সংখ্যা কয়েকশ'র

www.pathagar.com

বেশি হয়েছে এমনটি কমই দেখা গেছে এবং যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি জাতি বা দেশগুলো, প্রতিপক্ষের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের ফলে অপেক্ষাকৃত কমই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মানবজাতি যখন নিজেকে এবং যে গ্রহে সে বাস করছে তাকে ধ্বংস করার ক্ষমতা তার কাছে আছে এটা উপলব্ধি করতে পারবে তখন সে কুরআন ও সুন্নাহর বিধৃত ওহীভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ বিধিবিধানের প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। কেবল এটা উপলব্ধি করেই মানবজাতি নিজেকে ধ্বংসের অতলগহ্বরে নিক্ষিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারবে। ঐক্য এবং অভিন্ন স্বার্থের অন্বেষা ছাড়া তার সামনে আর কোনো পথ থাকবে না। মুসলমানরা যে মিশন নিয়ে এসেছে, নিজেদের লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে তা তাদের বোঝা প্রয়োজন।

এভাবে আমরা তোমাদের মধ্যপন্থি জাতি বানিয়েছি যাতে তোমরা মানবজাতির প্রতি সাক্ষী হতে পারো (২: ১৪৩)।

সুতরাং যে কেহ অণু পরিমাণ ভাল কাজ করবে সে তো দেখবে এবং যে কেহ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে সে তা দেখবে (৯৯ : ৭-৮)।

মুসলিম পণ্ডিত ও চিন্তাবিদদের দায়িত্ব অনেক বেশি। কারণ তারা অন্যদের কাছে বাস্তবে ইসলামী মতবাদ কতখানি সুযুক্তিপূর্ণ তা সুস্পষ্ট করে তুলে ধরতে পারলে অথবা একটি আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারলে শুধু নিজেদেরকে এবং আপন সমাজকেই রক্ষা করতে পারবে না, বরং বৃহত্তর পরিসরে মানবজাতি ও সমাজকেও বাঁচাতে পারবে। এরপর তারা একটি শান্তি ও নিরাপত্তার সমাজ কায়েম করতে পারবে, বিজ্ঞান ও বৈষয়িক অগ্রগতির কর্মকান্ড পরিচালনা করতে পারবে এবং আল্লাহর নির্দেশানুসারে দুনিয়াতে খিলাফত সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

ইসলামিকরণ ঃ উম্মাহর বিচার্য বিষয়

এ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হলো উম্মাহর সার্বিক অবস্থা বর্ণনা করা এবং তারপর সেটা মুসলমানদের সামনে পেশ করা যাতে তারা সমাজের সমস্যাবলী আলোচনা করতে পারে এবং ব্যক্তি, উম্মাহ ও সমগ্র মানবজাতির জন্য স্বস্তির উপায় খুঁজে বের করতে পারে। এসব উচ্চতর লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টা থেকে সব চাইতে বেশি যা আশা করা যায়, তা হচ্ছে এর ফলে মুসলিম চিন্তাধারা সম্পর্কে গবেষণাকে এগিয়ে নিয়ে এবং মুসলিম মনকে উম্মাহর পশ্চাৎপদতার কারণ সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ বিবেচনায় অনুপ্রাণিত করা।

এটি স্পষ্ট যে, উম্মাহর সম্পদ, সুযোগ-সুবিধা অথবা মূল্যবোধের প্রয়োজন বাস্তবে নেই। বরং তার অভাব হলো সুষ্ঠু চিন্তাধারার জন্য পদ্ধতিবিজ্ঞান। বাস্তবিকই উম্মাহর সমস্যাগুলো বিভ্রান্ত চিন্তাধারা, অস্পষ্ট সামাজিক দর্শন, সামষ্টিক ও অপর্যাপ্ত শিক্ষা এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের বিলুপ্তির সাথে স্পষ্টভাবে সংযুক্ত। ফল দাঁড়িয়েছে এ যে, উম্মাহ এখন

www.pathagar.com

বিভক্ত এবং দুর্বল ও মাথানত করে থাকা গোলাম সদৃশ হতে শুরু করেছে। আশা করা যায়, ইসলামিকরণ এবং বিশেষভাবে জ্ঞানের ইসলামিকরণ আগামী দশকগুলোতে উম্মাহর সামনে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠবে। এটাও আশা করা যেতে পারে যে, সমসাময়িক যুগের ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব ইসলামিকরণকে তাদের কর্মকান্ডের অবমূল্যায়ন হিসেবে মনে করবে না বা এতে তাদের খ্যাতি হ্রাস পাবে বলেও মনে করা হবে না। বরং সুষ্ঠু চিন্তাধারা বা ধারণা ব্যতিরেকে এবং সেগুলো মানুষের কাছ পৌঁছিয়ে দেয়ার যোগ্য লোক ছাড়া রাজনৈতিক কর্মকান্ড ও সংগঠন নিশ্চিতভাবে বিনষ্ট হয়।

এ সমস্যাকে উম্মাহর সমস্যা হিসেবে বোঝা অত্যাবশ্যক এবং এটাকে বিশ্বসভ্যতার নেতার যোগ্য আসনে সমাসীন হওয়ার আগে প্রস্তুতির স্তর হিসেবেই গণ্য করতে হবে। এভাবে বিষয়টি ক্ষমতায় আরোহণের বা একটি এলাকার উপর শাসন পরিচালনার বা একটি রাজনৈতিক দল গঠনের নয়। চিন্তাধারা এমন একটি অপরিহার্য বিষয় যা আরও বুনিয়াদী স্তরে কাজ করে এবং যে কোনো কর্মসূচিকে বাস্তব ফলাফল প্রদানের উপযোগী করে তোলে।

এটিও খুবই প্রয়োজন যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে, যাতে তারা পরস্পরের পরিপূরক হয় এবং অন্যকে সহায়তা দান করতে পারে। মনে রাখতে হবে যে, এক বিষয়ের উপর অন্য বিষয়কে অগ্রাধিকার দেয়া মানে এ নয় যে, তাদের কোনো একটি বিষয়কে অবহেলা করা হবে বা ভুলে যেতে হবে। সুতরাং বর্তমান সময়ে রাজনৈতিক উদ্যোগের সাথে সাথে একাডেমিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যায়েও কাজ করতে হবে। বাস্তবে রাজনৈতিক কর্মকান্ডকে প্রকৃতিগতভাবে আত্মরক্ষামূলক এবং মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য উম্মাহ নিজেকে উন্নত করতে পারে এবং তার সম্পদ বৃদ্ধির জন্য গৃহীত বলে মনে করতে পারে।

আরো একটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া উচিত। একাডেমিক কাজের নিজস্ব বাস্তব কর্মপরিধি রয়েছে। এগুলো পদ্ধতিবিজ্ঞান, জ্ঞানতত্ত্ব, দর্শন ইত্যাদি মৌলিক বিষয়গুলোর সাথে সম্পর্কিত। এগুলোর মধ্যে ব্যবহারিক, প্রায়োগিক গতিবিজ্ঞান বা রণকৌশল সম্বন্ধীয় বিষয়ও রয়েছে। এর মধ্যে অধিকতর মৌলিক ও জটিল বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলোর উপর উম্মাহকে জোর দিতে হবে। ব্যবহারিক ও প্রয়োগিক স্তরের সাফল্য মৌলিক স্তরে পদ্ধতিবিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়সমূহের সুষ্ঠুতা ও গভীরতার উপরে নির্ভর করে। এর দ্বারা আমরা প্রায় ১০০ বছর আগে আবদুর রহমান আল কাওয়াকিবি প্রণীত 'উম্মুল কোরা' পুস্তকের গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাধারা বুঝতে পারি এবং ইসলামী পুনর্জাগরণ কিভাবে হবে তা স্পষ্টভাবে এবং বিস্তারিতভাবে জানতে পারি। এ আন্দোলন দ্বারা স্থানীয়ভাবে কিছু সাফল্য অর্জন ছাড়া উম্মাহর জন্য গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু করা সম্ভব হয়নি।

www.pathagar.com

তবে আশার কথা যে, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চ্যালেঞ্জ হিসেবে ইসলামী সংস্কারমুখী কাজ চালিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা জোরদার করা হবে।

উম্মাহর মনীষী ও চিন্তাবিদদের কাছে বিষয়টি এতটা স্পষ্ট হলে এবং তারা উম্মাহর কাছে বিশদভাবে বাণী পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য আন্তরিকভাবে দৃঢ় সংকল্প হলে বিষয়টি সম্পূর্ণ হতো এবং সবার মধ্যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়ত। এ সম্পর্কে ইতিহাসের শিক্ষা একেবারে পরিষ্কার। সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুযুক্তিপূর্ণ ধ্যান ধারণা এবং স্বচ্ছ চিন্তাধারার অধিকারী জাতি তারাই যারা নতুন ও বৃহত্তর সাফল্য নিয়ে বসন্তকালীন বন্যার ন্যায় অকস্মাত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তবে আশার কথা, অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ের ব্যবধানেও পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটতে পারে।

উম্মাহর চিন্তাবিদ ও মনীষীদের অবশ্যই তাদের দৃঢ় সঙ্কল্প ও মনোযোগ সর্বপ্রথম মুসলিম চিন্তাধারার সংস্কারের উপর দিতে হবে এবং উম্মাহ ও তার নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা সাধনের ওপর কেন্দ্রীভূত করতে হবে। এরপর ইনশাআল্লাহ উম্মাহ ভবিষ্যৎ নির্মাণ এবং নয়া দিগন্ত অভিমুখে অগ্রসর হতে শুরু করবে।

পরিশেষ

আল্লাহর কাছে আমাদের মোনাজাত তিনি যেন আমাদের প্রজ্ঞা ও পথনির্দেশনা দান করেন। তিনি যেন আমাদেরকে পাথরকুঁচি থেকে মুক্তি দেন যার নিচে রয়েছে উম্মাহ ও সমগ্র মানবজাতির ধ্বংস এবং আমাদেরকে পরিণত করেন এমন পূণ্যবান কর্মীবাহিনীতে, যারা আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয় এবং তাঁর নাযিলকৃত সর্বোৎকৃষ্ট বিধানের অনুসরণ করে।

নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা।

www.pathagar.com

বিআইআইটি'র বাংলা বইসমূহ

♦ আত-তাওহীদ : চিন্তাক্ষেত্রে ও জীবনে এর অর্থ ও তাৎপর্য	*ইসমাইল রাজী আল ফারুকী*	১৭৫/-
♦ ইসলামের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক সংঘাত ও সহিংসতা নিয়ন্ত্রণ	*ড. আব্দুলহামীদ আহমাদ আবুসুলায়মান*	৩০০/-
♦ ইসলাম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক	*ড. আব্দুলহামীদ আহমাদ আবুসুলায়মান*	২৫০/-
♦ মুসলিম মানসে সংকট	*ড. আব্দুলহামিদ আহমেদ আবুসুলায়মান*	১৫০/-
♦ জ্ঞানের ইসলামায়ন	*ড. আব্দুলহামিদ আহমেদ আবুসুলায়মান*	৩০/-
♦ ইসলামের দন্ডবিধি	*ড. আব্দুলহামিদ আহমেদ আবুসুলায়মান*	২০/-
♦ ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ	*ড. এম উমর চাপরা*	২০০/-
♦ ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন	*ড. এম উপর চাপরা*	২০০/-
♦ রাসূলের (স:) যুগে মদীনার সমাজ (১ম খণ্ড)	*ড. আকরাম জিয়া আল আমরী*	৫০/-
♦ রাসূলের (স:) যুগে মদীনার সমাজ (২য় খণ্ড)	*ড. আকরাম জিয়া আল আমরী*	১৭০/-
♦ রাসূলের (স:) যুগে নারী স্বাধীনতা (২য় খণ্ড)	*আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ*	৩০০/-
♦ রাসূলের (স:) যুগে নারী স্বাধীনতা (৪র্থ খণ্ড)	*আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ*	৩০০/-
♦ কোরআন ও সুন্নাহ: স্থান-কাল প্রেক্ষিত	*তাহা জাবির আল আলওয়ানী ও ইমাদ আল দীন খলিল*	৫০/-
♦ ইসলামে উসুলে ফিকাহ	*ড. তাহা জাবির আল আলওয়ানী*	৭০/-
♦ ইসলামী শিক্ষা সিরিজ (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড একত্রে)	*ড. জামাল আল বাদাবী*	৩০০/-
♦ মুসলিম নারী-পুরুষের পোশাক	*ড. জামাল আল বাদাবি*	২০০/-
♦ রাষ্ট্রবিজ্ঞান : ইসলামী প্রেক্ষিত	*অধ্যাপক আবদুর রশিদ মতিন*	১৭৫/-
♦ প্রশাসনিক উন্নয়ন : ইসলামী প্রেক্ষিত	*ড. মুহাম্মদ আল বুরে*	৩০০/-
♦ শিক্ষক প্রশিক্ষণ : ইসলামী প্রেক্ষিত	*ড. এম. জাফর ইকবাল*	১৫০/-
♦ উন্নয়ন ও ইসলাম	*প্রফেসর খুরশিদ আহমেদ*	৩৫/-
♦ তাফসীর সাহিত্য ও সাহিত্যিক	*প্রফেসর ড. রশীদ আহমদ কালঙ্করী*	১০০/-
♦ ইসলামের দৃষ্টিতে নারী	*বি.আইশা লেমু ও ফাতিমা হীরেন*	৫০/-
♦ ইসলামী অর্থনীতিতে পণ্য বিনিময় ও স্টক এক্সচেঞ্জ	*এম আকরাম খান, এম রকিবুজ জামান*	৭০/-
♦ লোক-প্রশাসন : সংগঠন, প্রক্রিয়া ও অনুচিন্তা	*প্রফেসর আবদুন নূর*	২০০/-
♦ ইসলামী দাওয়াতের পদ্ধতি ও আধুনিক প্রেক্ষাপট	*প্রফেসর ড. আবদুর রহমান আনওয়ারী*	২০০/-
♦ ইসলামী জীবনবীমা : বর্তমান প্রেক্ষিত	*কাজী মো: মোরতুজা আলী*	১৭৫/-
♦ ইসলাম ও নয়া আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা-সামাজিক প্রেক্ষাপট	*এম রুহুল আমিন অনূদিত*	১৩০/-
♦ আমাদের সংস্কৃতি	*প্রফেসর মো: জয়নুল আবেদীন মজুমদার সম্পাদিত*	৬০/-
♦ গণতন্ত্র ও ইসলাম	*এম. আবদুল আযিয সম্পাদিত*	১২০/-
♦ সন্ত্রাসবাদ ও ইসলাম	*এম. আবদুল আযিয সম্পাদিত*	১০০/-

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

ড. আব্দুলহামিদ আহমদ আবুসুলায়মান ১৯৩৬ সালে পবিত্র মক্কা নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৫৯ সালে বাণিজ্যে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি এবং ১৯৬৩ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মাষ্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তীতে ১৯৭৩ সালে তিনি প্যানসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ের উপর ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন।

তিনি কর্ম জীবনের প্রথমে সৌদী আরবের স্টেট প্লানিং কমিটির সেক্রেটারী হিসেবে দুবছর দায়িত্ব পালন করেন, এরপর তিনি রিয়াদস্থ বাদশাহ সউদ বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৮৮ সালে তিনি মালয়েশিয়ায় আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর প্রথম রেক্টর হিসেবে যোগদান করেন।

ড. আব্দুলহামিদ আহমদ আবুসুলায়মান ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, সাবেক সভাপতি এবং বর্তমানে এর ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এ ছাড়া তিনি ওয়ার্ল্ড এসেম্বলী অব মুসলিম ইয়ুথ এর সেক্রেটারী জেনারেল হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

তিনি অসংখ্য আন্তর্জাতিক একাডেমিক কনফারেন্স ও সেমিনারের আয়োজনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া মুসলিম উম্মাহর সংস্কার ও জাগরনের লক্ষ্যে তিনি বেশকিছু মূল্যবান পুস্তক ও প্রবন্ধ রচনা করেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ক'টি হলো -

- The Islamic Theory of International Relations : New Directions for Islamic Methodology and Thought.
- Azmat al-Iradah Wa-al-Wijdan-Al-Muslim (Crisis in the Muslim Will & Sentiment)
- Theory of Economics : Philosophy and Contemporary Means.
- Azmat Al Aql -Al- Muslim (Crisis in the Muslim Mind)
- Islamization of Knowledge : IIUM as a Model.

ISBN: 984-8203-40-7

মুসলিম বিশ্বে আজ যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা হলো অবিলম্বে সংস্কার কার্যক্রম শুরু করা। এ ব্যাপারে সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আটলান্টিক উপকূল থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত সকল মুসলিম দেশেই দারিদ্র, পরিবেশ দূষণ, দুর্নীতি, ন্যায়বিচারের অভাব ইত্যাদি স্বাভাবিক চিত্র -যা মুসলিমদের মূল সত্তাকে মুছে ফেলতে চাইছে। এসব দেশের রাজনীতি হলো বৈষম্যের রাজনীতি, অর্থনীতি হলো বঞ্চনার অর্থনীতি, আর সংস্কৃতি হলো হতাশার সংস্কৃতি। অথচ এ মুসলিমদেরই ছিলো এক গৌরবময় অতীত। সেই অবস্থা থেকে পশ্চাতপদতার বুদ্ধিবৃত্তিক ও ঐতিহাসিক মৌল কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে এ বইতে। শিক্ষিত ও চিন্তাশীল মুসলিমদেরকে তাদের সংকট সম্পর্কে পরিচিত করে তোলা এবং সংকট মোকাবেলায় অবশ্য করণীয় সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দেয়াই বইটির উদ্দেশ্য।

www.pathagar.com